পিএইচ. ডি- গবেষণার শিরোনাম

"বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে মসনদ-ই-আলা ঈসা খান-এর অবদান" (১৫৬৪ খ্রী-১৫৯৯ খ্রী)

(MASNAD-I-ALA ISA KHAN (1564-1599 C.E) : HIS CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC CULTURE AND THE INDEPENDENCE STRUGGLE OF BENGAL)

এম. আবু হানিফা
পিএইচ. ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

পিএইচ. ডি- গবেষণার শিরোনাম

"বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে মসনদ-ই-আলা ঈসা খান-এর অবদান" (১৫৬৪খ্রী-১৫৯৯খ্রী.)

(MASNAD-I-ALA ISA KHAN (1564-1599 C.E) : HIS CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC CULTURE AND THE INDEPENDENCE STRUGGLE OF BENGAL)

এম. আবু হানিফা
পিএইচ. ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

DIGITIZED

Dhaka University Library
465925

465925

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ. ডি ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে মসনদ-ই-আলা ঈসা খান-এর অবদান"** (১৫৬৪-১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড.আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

465325

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

এম. আবু হানিফা
পিএইচ. ডি গবেষক
ইসলমিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এম. আবু হানিফা, পিএইচ. ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়, পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে **"বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে মসনদ-ই-আলা ঈসা খান-এর অবদান" (১৫৬৪-১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কাজ আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যায় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতারাং পিএইচ. ডি ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

465325

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

(ড.আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন)
অধ্যাপক
ইসলমিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কীতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে **"বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে মসনদ-ই-আলা ঈসা খান-এর অবদান" (১৫৬৪-১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দ)**। শীর্ষক শিরোনামে আমার রচিত পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। যথাসময়ে বিধি মোতাবেক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে পেরে আমি আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন এর নামে শুকরিয়া আদায় করছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দূত, মহামানব, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর।

গবেষণা কর্মেও আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক, ড.আ.ন.ম রইছ উদ্দিন। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার এই গবেষণা কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। তাঁর নিরন্তর, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মান সম্পন্ন হয়েছে। আমার গবেষণাপত্র প্রস্তুতির কাজ দেখা ও সময়োচিত উপদেশ প্রদানের জন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই এবং গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি বিভাগীয় শিক্ষকদের প্রতি। সেই সাথে আমি তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আমার গবেষণার কাজে আমাকে অনেকেই নানাভাবে সহযোগীতা করেছেন, উৎসাহিতও করেছেন এবং অনেকের দ্বারাই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী অন্যতম। তাদের সক্রিয় সহযোগিতা, উৎসাহ ও আগ্রহ আমার গবেষণা কাজের গতি বৃদ্ধি করেছে। তাই আমি তাঁদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমি গভীর চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মা আলহাজ মাওলানা মোঃ ছফির উদ্দিন ও খুর্শেদা খাতুন এবং আমার সকল শিক্ষক, আমার ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন, যাদের স্নেহে-যত্নে আমি লালিত পালিত, আমার শিক্ষার দ্বার উম্মোচিত হয়েছে। তাঁদের দু'আ ও অকৃত্রিম স্নেহ-মমতার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি যিনি আমার এ গবেষণা কর্মে টাইপ কম্পোজ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন আমি তার কাছে আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

এম. আবু হানিফা
পিএইচ. ডি গবেষক
ইসলমিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

(আ.)	-	আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(রঃ)	-	রহমাতুল্লাহ আলাইহি
(রা.)	-	রাযিআল্লাহু আনহু
(ড.)	-	ডক্টর (পিএইচ. ডি)
(পৃ.)	-	পৃষ্ঠা
(সঃ)	-	সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম

Dhaka University Institutional Repository

বিন্যাসপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় ০৯-৪০

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ভূমিকা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) দেওয়ান কালীদাস গজদানীর পরিচয় ও বংগে আগমন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ) সোলায়মান খান জায়গীর লাভ ভাটিরাজ্য প্রতিষ্টা এবং আফগানদের সাথে সংঘাত

দ্বিতীত অধ্যায় ৪১-৭২

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ঈসা খানের নাম, জন্ম, বাল্যকাল
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) ঈসা খানের উথানকালীন সময় বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ) মোগলদের সাথে ঈসা খানের প্রথম যুদ্ধ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঘ) ঈসা খানের চট্রগ্রামে অজ্ঞাতবাস

তৃতীয় অধ্যায় ৭৩-১৩১

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ঈসা খানের তরফ অভিযান
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) ঈসা খানের জঙ্গলবাড়ি অধিকার
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ) ঈসা খানের বাইশ পরগনার অধিপতি
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঘ) মোঘলদের সাথে ঈসা খানের পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ

চতুর্থ অধ্যায় ১৩২-১৫৩

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ঈসা খান ও রায়নন্দিনী
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) ঈসা খান ও মানসিংহ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ) সম্রাট সমীপে ঈসা খান
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঘ) জীবন সন্ধ্যা

৫ম অধ্যায় ১৫৪-১৯৯

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ঈসা খান ও বার ভুঁইয়াগণের পরিচয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) ভাটিরাজ্যের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ) ঈসা খানের সময় বাংলাভাষা সাহিত্য
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঘ) ঈসা খান ও রসায়ন শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায় ২০০-২৪৮

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ঈসা খানের প্রতিরক্ষা কৌশল
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) ঈসা খানের দূর্গসমূহ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ) ঈসা খানের মসজিদ স্থাপত্যসমূহ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঘ) দেওয়ানবাগে প্রাপ্ত ঈসা খানের সাতটি কামান

সপ্তম অধ্যায় ২৪৯-২৬১

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ঈসা খানের বংশধরগণ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) দেওয়ান বংশের প্রভাব

উপসংহার ২৬২-২৬৩

ঈসা খানের বংশ লতিকা ২৬৪-২৭৯

জঙ্গলবাড়ির বংশ লতিকা, হয়বতনগরের বংশ লতিকা
দেওয়ানবাগের বংশ লতিকা, সিলেট বংশ লতিকা
ভাগলপুরের বংশ লতিকা ও গাজী বংশের লতিকা।

পরিশিষ্ট ২৮০-২৯৮

ঈসা খানের ছাবি, গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার
ঈসা খানের বিভিন্ন মসজিদ ও দূর্গ
সোনারগাঁও ও ঈসা খানের রাজত্ত্বের মানচিত্র
ঈসা খানের ব্যবহারিত কামানের ছবি
ঈসা খান ও মানসিংহের ছবি
জঙ্গলবাড়ির মানচিত্র ও অন্যন্যা মানচিত্র

গ্রন্থপঞ্জী ২৯৯-৩০৪

সমাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পৃ. ০৯-৪০

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ভূমিকা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) দেওয়ান কালীদাস গজদানীর পরিচয় ও বংগে আগমন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ) সোলায়মান খান জায়গীর লাভ ভাটিরাজ্য প্রতিষ্টা এবং আফগানদের সাথে সংঘাত

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলার ইতিহাসে বাংলার পূর্বাঞ্চল ভাটি এলাকা নামে পরিচিত। ভাটি এলাকা অসংখ্য নদী বিধৌত। সুলতানী আমলের ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এ পূর্বাঞ্চল সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে শাসিত হয়েছে। এ ভাটি এলাকায় সংগ্রামী পুরুষ ঈসা খান মসনদ-ই-আলা মোঘল আগ্রাসন প্রতিহত করার লক্ষে ভাটির জমিদারগণকে একত্রিত করেছিলেন। কিন্তু কোন মুদ্রা বা শিলালিপির অভাবে তাঁর শাসনামল সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। কিছু কিছু স্থাপত্য তাঁর নামে আরোপিত হয় মাত্র।[১]

সম্রাট জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর যখন ভারত সাম্রাজ্য জয় করার মনস্থ করেন, তখন সমগ্র ভারত পাঁচজন মুসলমান সুলতান এবং দু'জন হিন্দুরাজার অধীনে ছিল। মুসলমান সুলতানদের মধ্যে দিল্লীতে ইব্রাহীম লোদী, গোজরাটে মোজাফফর শাহ, দাক্ষিণাত্যে বাহমনি, মালবে মোহাম্মদ খলজী, বাংলায় নাসির উদ্দিন নূসরত শাহ এবং দু'জন হিন্দু রাজা বিজয়নগর ও চিতোরে রাজত্ব করতেন। মূলতঃ তুঘলক রাজত্বের শেষভাগে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনকার্যে সার্বভৌম ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। আর এই সুযোগে বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাধীন রাজত্বগুলো স্থাপিত হয়েছিল।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ দিল্লীর লোদীবংশের ক্ষমতা খন্ড-বিখন্ড হয়ে মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করার পর আফগানরা দলে দলে দিল্লী ও আগ্রা ছেড়ে পলায়ন করে পার্শ্ববর্তী স্বাধীন রাজ্যসমূহে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীন সুলতান হুসেনশাহী বংশের সিংহপুরুষ নাসির উদ্দিন নূসরত শাহের নিকট আশ্রয় নিয়েছিল। সুলতান নূসরত শাহ আফগানদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে মর্যাদা ও অবস্থা অনুযায়ী এবং রাজ্যের সম্পদের সাথে সঙ্গতি রেখে তাদেরকে পরগনা, গ্রাম ইত্যাদি বরাদ্দ করেন।[২]

অনেকের মতে, সুলতান নাসির উদ্দিন নূসরত শাহ সম্রাট বাবর কর্তৃক বিতাড়িত আফগানদের অনেককে আশ্রয় দিলেও প্রকাশ্যে বাবরের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে খানুয়া যুদ্ধের পর সম্রাট বাবর মুল্লা মজহর[৩] নামে একজন দূতকে নূসরত শাহের কাছে পাঠান যে, নাসির উদ্দিন নূসরত শাহ সম্রাটের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কিনা তা জানার জন্য। মুল্লা মজহর দীর্ঘদিন

---

১ অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান "ঈসা খাঁ: সমকালীন ইতিহাস" ২০০০ কাটাবন, ঢাকা-১০০০, পৃ. ৫

২ গোলাম হুসেন সলিম "রিয়াজু-উস-সালাতীন" বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১০৭

৩ মুল্লা মজহর যিনি সম্রাট বাবর-এর একজন দূত ছিলেন। সম্রাট বাবর মুল্লা মজহরকে বাংলার শাসনকর্তা নাসির উদ্দিন নূসরত শাহ-এর অবস্থা জানার জন্য বাংলা পাঠান।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় অবস্থান করে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে বাবরকে জানালেন যে, নূসরত শাহ সম্রাটের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং তিনি অতিসত্বর দূত পাঠাচ্ছেন। এরই প্রেক্ষিতে বাবর স্থির করলেন যে, বাংলায় আক্রমণ করা তার পক্ষে উচিত হবে না।

শেষ পর্যন্ত নাসির উদ্দিন নূসরত শাহের সংঙ্গে বাবরের সংঘর্ষ বাঁধল। কিন্তু নাসির উদ্দিন নূসরত শাহের দূরদর্শিতার জন্য বাবরের সংগে তার সংঘর্ষ বেশী দূর গড়াতে পারেনি। কারণ নাসির উদ্দিন নূসরত শাহ ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বিজ্ঞ দূতদের দ্বারা বহু মূল্যবান উপহার প্রেরণ করেন এবং সন্ধি স্থাপন করেন।

৯৩৭ হিজরীর (১৫৩১খ্রিস্টাব্দ) জমাদিউল আওয়াল মাসের ৫ তারিখ সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে আফগান ও লোদীগণ তাদের বঞ্চিতরাজ্য ফিরে পাবার জন্য নতুন করে চেষ্টা করতে থাকেন। বার বার মোঘলদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়েও আফগানরা ক্ষমতাশালী ও তাদের সংখ্যাধিক্য ছিল। তারা বিদ্রোহের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকত। এ সময় গুজব রটে যে, সম্রাট হুমায়ূন বাংলা জয়ের পরিকল্পনা করেছেন। সুলতান নূসরত শাহ মোঘল সম্রাটের প্রতি তার আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব প্রমাণ করার জন্য সুলতান বাহাদুর গুজরাটীর মধ্যস্থতায় হুমায়ূনের সাথে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন চুক্তি সম্পাদিত হবার পূর্বেই বাংলার সুলতান নাসির উদ্দিন নূসরত শাহ পরলোক গমন করেন।

৯৩৯ হিজরীতে (১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) নূসরত শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রিয়াজের মতে, তিনি তিন বছর রাজত্ব করেন। ষ্টুয়ার্ড বলেন, ফিরোজ শাহ রাজত্ব করেন ৩ মাস। তবে সুলতান ফিরোজ শাহের যে সমস্ত মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে তাতে বুকাননের ধারণা ফিরুজ শাহ নয় মাস রাজত্ব করেছিলেন।[৪]

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের পর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন হোসেনশাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ। কথিত আছে স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেছিল। তার সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই সালতানাতের অমাত্যদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং অন্তবিরূধের সৃষ্টি হয়।[৫] তবে গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ সিংহাসন আরোহণের সময় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন

---

[৪] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান "ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা" ইতিহাস ঐতিহ্য গবেষনা পরিষদ, কিশোরগন্জ, ৩৪/২বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৪, পৃ. ৩

[৫] ড. আব্দুল করিম "বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল " বাংলা একাডেমী-ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৪২১

Dhaka University Institutional Repository

শাহের প্রতিষ্ঠিত এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হন। তার পিতা হোসেনশাহ এবং ভাই নাসির উদ্দিন নূসরত শাহের অধিকৃত সমুদয় এলাকাই তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। তার রাজ্যের পশ্চিম সীমা বিহারের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তার রাজত্ব চট্টগ্রামের মাতা মহুরী নদী[৬] পর্যন্ত ছিল। গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের পাঁচটি শিলালিপি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১টি দিনাজপুর ধোরাইল থেকে, ১টি গৌড়ের সাদুল্লাপুর থেকে, ১টি কিশোরগঞ্জের জাওয়ার (তাড়াইল) থেকে, ১টি ভারতের মালদহ জেলার শাহপুর থেকে এবং অন্যটি চট্টগ্রামের কুমিরা থেকে।[৭]

সালতানাতের অমাত্যবর্গের মধ্য থেকে অনেকের ষড়যন্ত্র এবং শেরশাহ সূর ও সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক বাংলার ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টা ইত্যাদি কারণে দুর্গম ও জঙ্গলাকীর্ণ এবং নদীবেষ্টিত এলাকায় তার রাজত্বের বিস্তৃতি ঘটাতে চেষ্টা করেন। এরই ফলশ্রুতিতে গারো পাহাড়ের[৮] দক্ষিণাঞ্চল, ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বভাগসহ পূবর্তন কামরূপ রাজ্যের এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ বাংলার অন্যান্য সুলতানদের মত গিয়াস উদ্দিন মাহমুদশাহ তার রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তার কর্তৃত্ব বহাল রাখেন।[৯]

বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের সূচনা হয়েছিল দিল্লীর সালতানাতের অধীন একটি প্রদেশ হিসেবে। হুসেনশাহী বংশের সুলতানগণ প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাই অনুসরণ করেছিলেন। বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী প্রতিভাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করা হত এবং উৎসাহ দেয়া হত। অমুসলমানদের উপর কোন রকম জিজিয়াকর আরোপ করা হত না। এ সুবিধা দানের ফলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অমুসলিম বিজ্ঞপন্ডিত ব্যক্তিগণ গৌড়ের সালতানাতে আগমন করে বাংলার সুলতানের অধীনে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল।[১০]

---

[৬] মাতা মহুরী একটি নদী যা চট্রগ্রামের ভিতর দিয়ে চলে গেছে

[৭] শ্রী-সুখময় মৃখোপধ্যায়" "বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর" ভারতীয় বুকস্টল কলিকাতা, ৬ষ্ট সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৭৪

[৮] ময়মনসিংহ জেলায় বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় একটি পাহাড়ের নাম।

[৯] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান "ঈসা খাঁ, মসনদ-ই-আলা" প্রাগুক্ত, পৃ.৩-৪

[১০] এম, এ, রহিম "বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতির ইতিহাস" মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

শুধু তাই নয় সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহই সর্বপ্রথম এদেশে পর্তুগীজদের বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন। ইতোপূর্বে সুলতান হোসেন শাহ ও নূসরত শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা এ বিষয়ে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের উদার নীতির ফলে রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হত তাদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকায় শাসন ক্ষমতা প্রদান করা হত, এ সমস্ত কর্মচারীদের একটি তালিকা শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় "বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শিলালিপি, তাওয়ারিখ-ই-শেরশাহী প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থের এবং পর্তুগীজ বিবরণীগুলো থেকে তিনি মূলতঃ এই নামগুলো বের করে এনেছেন। তাদের মধ্যে ফরাসখান, নূর খান, মাখদু-ই-আলম, কুতুব খান, ঈব্রাহিম খান, খোদাবখশ খান, হামজা খান এবং কালিদাস গজদানী (সালায়মান খান)[১১] হোসেনশাহী বংশের শাসকগণ উদার নীতির উপর প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন[১২]। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিভাবান এবং যোগ্য ব্যক্তিগণ তাদের শাসনামলে বিশেষ করে বাংলার রাজধানী গৌড়ের দরবারে যথাপোযুক্ত মর্যাদা ও স্বীকৃতি পেতেন। এরই ফলে কালিদাস সিংহ গজদানী ও রামদাস সিংহ নামে দুই রাজপুত্র যুবক ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চল থেকে হোসেন শাহী[১৩] শাসনামলে বাংলায় এসেছিলেন। ঐ বংশের শেষ সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে এই ভাগ্যান্বেষী যুবকের একজন কালিদাস সিংহ গজদানী রাজস্ব উজির পদে সুলতানের দরবারে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। জানা যায়, সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের জ্যৈষ্ঠ কন্যার জামাতা এবং বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের তরফ রাজ্যের শাসনকর্তা সৈয়দ ইব্রাহিম মালেকুল উলামা (র.) কালিদাস সিংহ গজদানীর প্রতিভা ও যোগ্যতা অবলোকন করে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি সুলতানের সমীপে কালিদাস গজদানীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তির জন্য সুপারিশ করেছিলেন। অপরদিকে কালিদাস গজদানী সৈয়দ ইব্রাহিম মালেকুল উলামার (র.) সান্নিধ্যে থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে

---

[১১] সোনারগাঁও অঞ্চলের শাসনকর্তা হিসেবে যার নাম পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন, সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহিমুদ শাহের কন্যার জামাতা কালিদাস গাজদানী নামান্তর সোলাইমান খান।

[১২] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান "ঈসা খা; মসনদ-ই-আলা" প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[১৩] ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পযন্তর্থ বাংলার দু'শ বছরের স্বাধীন সুলতানী আমল। ঐ সময় যে সকল রাজবংশ বাংলা শাসন করেছেন, তাদের মধ্যে হোসেনশাহী বংশ অন্যতম। ঐ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ আল হোসাইনী। পিতা আশরাফ আলী আল হোসাইনী। তিনি ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ রাজধানী গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ হোসেন শাহের মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসনে বসেন তার পুত্র নাসির উদ্দিন নূসরত শাহ। তারপর ১৫৩২ বা ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ হোসেন শাহের অপর পুত্র গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ গৌরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অবগত হয়ে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সোলায়মান খান[১৪] নাম ধারণ করেন। সৈয়দ ইব্রাহিম মালেকুল উলামার (র.) পরামর্শে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ তার এক কন্যাকে সোলায়মান খানের সঙ্গে বিবাহ দেন এবং তৎকালীন বঙ্গের পূর্বাঞ্চলের ভাটিরাজ্যের প্রশাসক নিয়োগ করেন।

সোলায়মান খানের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিও ঐতিহাসিক দিক থেকে কম চমকপ্রদ নয়। তিনি শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তৎকালে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের নিমজ্জিত বঙ্গের পূর্বাঞ্চলীয় নিম্নভূমি এলাকায় ইসলামী শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও তাহজিব তামাদ্দুন অনুযায়ী একটি বংশধারারও সূচনা করেছিলেন। দু'টি রাজকীয় রক্তধারা এই বংশটিকে এমনভাবে মহিমান্বিত করেছে, যে রক্তধারা মিলিত হয়েছে সিলেট বিজয়ী হযরত শাহাজালাল (র.)-এর সিপাহসালার হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন (র.)-এর পবিত্র রক্তধারার সাথে। বৃহত্তর মোমেনশাহীর কিশোরগঞ্জ, বৃহত্তর সিলেট, বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বংশপরম্পরায় আগত এই বংশধারার পুরুষগণ অদ্যাবধি বর্তমান। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন স্থাপত্যকীর্তি যেমন হাভেলী, মসজিদ, দূর্গ, পরিখা, খানকা, আখড়া, বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো ইত্যাদির মাধ্যমেও অদ্যাবধি জাগরুক রয়েছে। এই বংশধারারই প্রধান পুরুষ ঈসা খান 'মসনদ-ই-আলা' যিনি স্বকীয় কৃতিত্বে কেবলমাত্র বাংলার ইতিহাসেই নয় অখন্ড ভারতের মধ্যযুগীয় মোঘল ইতিহাসের একটি অধ্যায়েও স্থান লাভ করেছেন।

প্রায় প্রতিটি আক্রমণ অসাধারণ রণকৌশলে প্রতিহত করে ঈসা খান অপরাজেয় অবস্থানকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সর্বগ্রাসী মোঘল শক্তিরকাছে যখন গোটা ভারতবর্ষের সুবিশাল

[১৪] সোলায়মান খান ও পুত্র ঈসা খানের নামে খাঁ বা খান ব্যবহারে আমরা খান ব্যাহার করব কারণ, আমরা দেখতে পাই শিলালিপি, তাওয়ারিখ-ই-শেরশাহী প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থে এবং পূর্তগীজ বিবরণগুলো থেকে মূলতঃ যে নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ফরাসখান, নূরখান, কুতুবখান, ইব্রাহীম খান, খোদাবখশ খান, হামজা খান,এবং সোলায়মান খান, প্রমুখ। সম্ভবতঃ সবগুলো নামের সাথে সোলায়মান খানের নামও শিলালিপিতে খান উল্লেখ ছিল, খান এর ন অক্ষর কোন কারণে মুছে গিয়েছিল বা নামটি সবার শেষে হওয়ায় ন অক্ষর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, অন্য কয়েকজনের সাথে তাঁর নামেও খান ছিল, এছাড়া বর্তমানে তাদের অধঃস্তন পুরুষগণ জঙ্গলবাড়ির পূর্বপুরুষগণের অনুসরণ করে দেওয়ান ছোবহান দাদখান ও দেওয়ান আজিমদাদ খানের নামে খান ব্যবহার করেন। যেহেতু অন্য ধর্মালম্বী কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে নতুন নামের সাথে খাঁ বা খান ব্যাবহার করতেন। ঈসা খান-এর অন্যতম গবেষক মোহাম্মদ মোশাররফ মোশররফ হোসেন শাহাজাহান ঈসা খানকে নিয়ে দুইটি বই লিখেছেন। প্রথম বইটির ভূল সংশোধন করে তার শেষ বইটিতে খান লিখেন। সুতরাং পিতা সোলায়মান খান-এর নামে খান অনুসারে ঈসা খান ও বর্তমানে তার অধঃস্তনগণও খান ব্যবহার করে আসছে যা ব্যবহার আমাদের জন্য যুক্তিসংগত।

Dhaka University Institutional Repository

ভুখন্ড একের পর এক পদানত হচ্ছিল, তখন সুদূর বাংলার প্রত্যন্ত ভাটি অঞ্চলে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে ঈসা খান যে গৌরবদীপ্ত কৃতিত্ব প্রদশর্ন করেছিলেন ইতিহাসে তার মূল্য অপরিসীম।

আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলদেশের ঠিক হৃদপিন্ডে ভৌগোলিকভাবে অবস্থিত প্রাচীন ভাটিরাজ্যের সার্বভৌব নৃ-পতি ঈসা খানের পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তব স্বপ্ন স্বাধীন বাংলাদেশ। বিশেষ করে শাশ্বত বাংলায় ইসলামী সস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ঈসা খান-এর একটি অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার।[১৫]

সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ যখন বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন দিল্লী এবং বাংলার রাজনীতিতে চলেছিল নানা টানাপোড়েন। এই সময় বিহারের শাসারাম অঞ্চলের শাসনকর্তা শেরশাহ সূরী নিজের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়ে উঠেন এবং এক সময় বাংলা মসনদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকেন। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ শেরশাহ গৌড় আক্রমণের উদ্দেশ্যে এক সেনাবাহিনী নিয়ে আগমন করেন। কিন্তু সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ নিজের শক্তি দিয়ে পেরে উঠবেন না ভেবে শেরশাহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন। শেরশাহ সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণের বিনিময়ে তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা লাভ করেছিলেন। এতে করে যদিও সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ স্বস্তি পেলেন কিন্তু শেরশাহ সূরীকে বাংলা অধিকারের অভিলাষ নিবৃত্ত করতে পারেনি। এক বছর পর ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে শেরশাহ সুলতান মাহমুদ শাহের নিকট স্বার্বভৌম সুলতানের বার্ষিক নজরানা প্রাপ্য হিসেবে এক বিশাল অংকের অর্থ দাবী করেন। সুলতান অর্থ দিতে রাজী না হওয়ায় শেরশাহ আবার গৌড় আক্রমণ করেন।[১৬]

---

[১৫] বাংলায় ইসলামী কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতির উন্নয়নের যে স্রোতধারা নিয়ে এসেছিল সিলেট বিজয়ী হযরত শাহাজালাল (র.) ও-এর সিপাহসালার হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন (র.) এবং এর রক্তধারার সাথে মিলিত হয়েছিল সোলায়মান খান ও পুত্র ঈসা খান, পূর্বপুরুষগণের তেজস্কীয় জাগরিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি তাহজিব তামুদ্দিন, বাংলাতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ পযর্ন্ত সময়ে। বাংলার মুসলমানগণ যুগে যুগে ঈসা খানের সেই গৌরবোজ্জ্বল প্রেরণাকে কাজে লাগিয়ে (১৭৫৭সালে পলাশী জাগরণ, ১৮৩১সালে তিতুমীর-এর আন্দোলন, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ, ১৯৪৭ সালে বৃটিশ বিরোধী আন্দেলন, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দেলনসহ অসংখ্য আন্দেলন মাধ্যমে) বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন সমুন্নত রেখে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকারীরা জন্ম দেয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

[১৬] শ্রী-সুখময় মূখোপধ্যায় "বাংলার ইতিহাসে দু'শ বছর" ভারতীয় বুকস্টল কলিকাতা, ৬ষ্ট সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ৪৬৭

Dhaka University Institutional Repository

যদুনাথ সরকারের মতে, ঐ বিপদসংকুল রিস্থিতিতে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনের কাছ থেকে সাময়িক সাহায্যের আশায় এবং হুমায়ুনের সাথে সাক্ষাতের জন্য বিহারের দিকে রওয়ানা হন। ইতোমধ্যে দিল্লীর কর্তৃত্ব নিয়ে হুমায়ুন এবং শেরশাহের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শেরশাহকে বাংলায় অধিপত্য স্থাপনের সুযোগ না দেওয়ার জন্য হুমায়ুনকে অনুরোধ করেন। এরপর তারা উভয়েই শেরশাহকে মোকাবিলা করার জন্য গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু বিহারের কহলগাঁও নামক স্থানে এসে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ জানতে পারেন যে, তার দুই পুত্র আফগানদের হাতে নিহত হয়েছেন। গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ এই সংবাদে শোকাহত হন এবং কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।[১৭]

বুকানন[১৮] লিখেছেন যে, গৌড় দুর্গের পতনের পর সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ তার দুই পুত্রের নিহত হবার খবর পেয়ে রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[১৯] এ প্রসঙ্গে রিয়াজুস-সালাতীনে বলা হয়েছে যে, শেরশাহের সাথে যুদ্ধে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ পরাজিত হয়ে ভাটি অভিমুখে পলায়ন করেন। অন্যদিকে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদের পুত্রদের বন্দী করা হয়।[২০]

সার্বিক বিচারে রিয়াজুস সালাতীনের বর্ণনাই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ পরাজিত হয়ে ভাটির অভিমুখে চলে আসার যুক্তিসংগত কারণ ছিল এই যে, ভাটি রাজ্যে তখন বাংলার সালতানাতের অধীনে শাসক হিসেবে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদের জামাতা সোলায়মান খান অধিষ্ঠিত ছিলেন। অন্যদিকে ভাটিরাজ্যের পার্শ্বেই তরফ রাজ্যেও সুলতান মাহমুদের বড় জামাতা সৈয়দ ইব্রাহিম মালেকুল উলামা (র.) ক্ষমতাশীন ছিলেন। ফলে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদের সংকটময় অবস্থায় তার পরিবার পরিজনসহ নিরাপদ স্থানে জামাতা সোলায়মান খানের অবস্থান ভাটি অভিমুখে চলে আসাটাই স্বাভাবিক হতে পারে।[২১]

---

[১৭] যদুনাত সরকার হিস্টী অব বেঙ্গল, ভল্যুম-২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় মুদ্রন, ১৯৭৬, পৃ. ১৬৪

[১৮] বুকানন তিনি ছিলেন একজন ইতিহাসবিদ ও গবেষক তাঁর কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস কৃতজ্ঞ।

[১৯] শ্রী-সুখময় মৃখোপধ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯

[২০] গোলাম হুসেন সলিম রচিত আকবর উদ্দিন অনূদিত “রিয়াজু-উস-সালাতীন” প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

[২১] ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী সুলতান মাহমুদ কলহগাঁও নামক স্থানে মৃত্যু বরন করেছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা সুলতান মাহমুদ যখন ভাটি অভিমুখে চলে এসেছিলেন তখন তিনি বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার দেলদোয়ার থানার আতিয়া নামক স্থানে এসে পুত্রদের মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্ত হন। এর কয়েক দিনের মধ্যে এ স্থানে তিনি মৃত্যু বরন করেন। সুলতান মাহমুদ শাহের কবর হযরত আদম শাহ কাসেমী (র.)-এর মাযারের পূর্ব-দক্ষিণ

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর শুধুমাত্র হোসেন শাহী রাজত্বের অবসান ঘটেনি। পরিসমাপ্তি ঘটেছিল বাংলার দু'শ বছরের স্বাধীন সুলতানী আমল। সেই সাথে বাংলার পূর্বাঞ্চল ব্যতীত প্রায় সমস্ত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হল সূরবংশের শাসন।

ঐ সময় পূর্ব বাংলার তথা ভাটি অঞ্চলে আঞ্চলিক শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। আঞ্চলিক শক্তির অধিকারী নৃ-পতিগণ যে নতুন রাজনীতি ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল তাতে ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এক ধরণের আঞ্চলিক আনুগত্য গড়ে উঠেছিল।[২২] তাদের এ আঞ্চলিক আন্তরিকতা পরবর্তী সময়ে ইসলামী সংস্কৃতির পাঠপরিক্রমায় জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করে সে চেতনায় অবশেষে বাংলা স্বাধীনতা লাভ করে।

কোণে অবস্থিত। সুলতান মাহমুদ শাহের কবরের পার্শ্বেই সুলতানী আমলের ১টি মসজিদ ছিল যা বর্তমানে ধবংশপ্রাপ্ত হয়েছে।

[২২] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান "ঈসা খান" প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খান-এর পূর্ব পরিচয় ও বঙ্গে আগমন

বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ঈসা খান মসনদ-ই-আলার অবদান আলোচনা ধারাবাহিকতার প্রয়োজনে ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খানের পূর্ব পরিচয় ও বঙ্গে আগমন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সোলায়মান খানের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবুল ফজল তাঁর, "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে ঈসা খানকে 'ঈসা আফগান' বলে অবিহিত করেছেন।[২৩] তাই অনেকে আইন-ই-আকবরী অনুসরণে ঈসা খান-এর পূর্ব পুরুষদের আফগান বংশোদ্ভুত বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, আবুল ফজলের পরবর্তী গ্রন্থ 'আকবনামায়' ঈসা খানকে রাজপুত বংশোদ্ভূত বলেছেন। ভাটির অধিশ্বরের পিতা বাইস রাজপুত বংশোদ্ভুত ছিলেন। তিনি অবিরাম বিদ্রোহ ও সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। সময়টি ছিল সেলিম খানের রাজত্বকাল। আবুল ফজলের বর্ণনায় অবশ্য ঈসা খানের পিতার নামটি উল্লেখ করা হয়নি। বৃটিশ যুগে রচিত ঈসা খান ও তার পূর্বপুরুষ সম্পর্কে ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় কিছুটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে জেমস ওয়াইজ[২৪] এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের একটি প্রবন্ধে বলেন-Isa's father was a Bais Rajput, Whose name was Kalidas Gojdani and that when he became a Mohamadan he received the title of Sulaiman Khan.[২৫] "ঈসা খানের পিতা বাইস (বৈশ্য) রাজপুত বংশোদ্ভুত ছিলেন তার নাম ছিল কালিদাস গজদানী।[২৬] তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সোলায়মান খান নাম ধারণ করেন।

জেমস ওয়াইজের বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায় ঢাকা থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মুন্সী রাজচন্দ্র ও পন্ডিত কালিকুমার চক্রবর্তী রচিত মসনদ আলী ইতিহাস নামক প্রুস্তকে। এতে কালিদাস

[২৩] আবুল ফজল "আইন-ই-আকবরী" ভল্যুম-২, জেরেট কতৃর্ক ফার্সী ভাষা থেকে অনূদিত নতুন দিল্লী, পৃ. ১১৭

[২৪] জেমস ওয়াইজ, ড. ওয়াইজ নামে প্ররিচিত। তিনি ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন। তৎকালীন সময় জঙ্গলবাড়ীতে অবস্থানরত ঈসা খান অধঃস্তন দেওয়ান আজিমদাদ খানের কাছ থেকে ঈসা খান ও তার পূর্বপুরুষদের অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন

[২৫] ঔ.অ.ঝ.ই. াড়ষ. ঢষ১১১.ঢ়ধৎঃ-১.১৮৭৪

[২৬] কালিদাস গজদানী ব্রাহ্মণদের খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি স্বর্ণ দ্বারা ছোট ছোট হাতি নির্মাণ করে ব্রাহ্মণদেরকে দান করতেন। ফলে গৌড় নগরীতে স্বর্ণের হস্তীমূর্তী দানকারী হিসেবে গজদানী উপাধি প্রাপ্ত হন

Dhaka University Institutional Repository

গজদানী ঈসা খানের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কালিদাস গজদানী থেকে দেওয়ান বংশ তথা বাংলায় ঈসা খানের বংশের সূচনা হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন।[২৭]

তিনি ছিলেন অযোধ্যার বাইসওয়ারা রাজ্যের দিল্লীর মিত্ররাজা বাইস (বৈশ্য) রাজপুত বংশের রাজা ধনপূত সিংহের অধঃস্তন পুরুষ। তদানিন্তন সময়ে ভারতের যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন জায়গাকে বাইসওয়ারা বলা হত। বায় বেরলী জেলার পশ্চিমাংশ এবং লখণৌর দক্ষিণাংশ সব মিলে ২২টি পরগনার দু'হাজার বর্গমাইল এলাকা নিয়ে বাইসওয়ারা রাজ্যটির অবস্থান ছিল। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, বাইসওয়ারার বাইস রাজপুতরা ত্রয়োদশ শতাব্দিতে প্রাধান্য লাভ করেন। অনেকে অনুমান করেন যে, প্রথমদিকে তারা "মুঙ্গী পঠন" থেকে বাইসওয়ারা রাজ্যে আগমন করে এই বিস্তীর্ণ জনপদটির আবাদ করেন। মি. কোর্ক তার 'নর্থওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্স অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে বলেন, বাইস রাজপুতরা রাজপুতদেরই অংশ বিশেষ।[২৮] এই বাইস রাজপুত বংশের রাজা ধনপূত সিংহ ছিল দিল্লীর সম্রাটের মিত্ররাজা। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে রাজা ধনপূত সিংহের অধঃস্তন পুরুষ রাজা ভগীরথ সিংহের সাথে ঐ বংশের কালিদাস সিংহ তদানিন্তন বাংলার রাজধানী গৌড়ের সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের দরবারে আগমন করেন। অনেকে বলেন, রাজা ভগীরথ সিংহ এবং কালিদাস সিংহ তীর্থ পর্যটনে বাংলায় আগমন করার পর ভাগ্যান্বেষণে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের দরবারে উপস্থিত হন। সম সাময়িক কালের কিছু পরে রচিত বিভিন্ন কাব্যগাথাঁর এবং বিগত শতাব্দির শেষ ভাগে ও বর্তমান শতাব্দির প্রথম দিকে বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় ঈসা খানের পিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তবে যে সমস্ত বর্ণনা এ পর্যন্ত উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো ঈসা খানের পরিবার অধঃস্তন পুরুষদের বক্তব্য অনুযায়ী, বিভিন্ন কাব্যগাথাঁ ও লোক কাহিনীকে অনুসরণ করে এবং সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিকদের প্রদত্ত বিবরণ থেকে। এ প্রসংগে বেশ কিছু গবেষণা ধর্মী প্রবন্ধ গবেষকরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে।[২৯]

১৩২৪ বাংলা সনের আশ্বিন কার্তিক সংখ্যায় ঢাকা সাহিত্য পরিষদের 'প্রতিভা' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকায় বাবু সুধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায় একটি কবিতা সংকলন বের করেছিলেন। কবিতাগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল নারায়ণগঞ্জের সোনাকান্দা থেকে। পরবর্তী সময়ে ড. দ্বীনেশ চন্দ্র সেন কাব্য গাঁথাগুলো পূর্ববঙ্গ গীতিকা নাম দিয়ে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। এই গীতিকাগুলোর

---

[২৭] দীনেশচন্দ্র সেন 'পুর্ববঙ্গ গীতিকা', ২য় খন্ড, ২য় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৩, পৃ. ৪৪

[২৮] মি. কোর্ক, তার নর্থওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্স অব ইন্ডিয়া" পৃ. ৮৬

[২৯] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান "ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা" প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

একটি হচ্ছে "দেওয়ান ঈসাখাঁ মসনদালি"। তার পুস্তকে মূল্যবান যে অংশটি সংযোজন করেন তা হচ্ছে ঈসা খান সম্পর্কে একটি গবেষণাধর্মী ঐতিহাসিক ভূমিকা। এ প্রসংগে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টাশালী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেন, ঐ গীতিকার মধ্যে ঈসা খানের বংশের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কিংবদন্তির রূপ, ইতিহাসের রূপ নয়। তিনি বলেন, ইতিহাস রচনা করা ও ইতিহাস পাঠ করা যদিও মুসলিম কৃষ্টির একটি প্রধান অংশ তা সত্ত্বেও বাংলায় মুসলমানরা আগমন করে শাসন করেছে শত শত বছর। উল্লেখযোগ্য খ্যাতিমান স্বাধীন সুলতানরা দিল্লীর সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আত্মপ্রকাশও ঘটেছে। তারপরও তাদের বিস্তারিত ইতিহাস লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভব করেনি।[৩০] ফলে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী বারভূঞাগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার জন্য সম্রাট আকবরের দরবারে বিখ্যাত ইতিহাসিক আবুল ফজলের বর্ণনার উপর অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই ঈসা খান ও তার পরিবারের সঠিক ইতিহাস রচনার জন্য আবুল ফজলের বিবরণই হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাস লেখার মূলভিত্তি। আল্লামা আবুল ফজল ছিলেন সম্রাট আকবরের দরবারে একজন মন্ত্রী ও বন্ধু। "আকবরনামা" আবুল ফজলের এক অমর কীর্তি। যেহেতু আকবরের রাজত্বকালেই ঈসা খান মসনদ-ই-আলার অবির্ভাব সেহেতু ভারত সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলার এই অঞ্চলের বিবরণ অংশ বিশেষ হিসেবেই আকবরনামায় স্থান লাভ করেছে। ফলে বিস্তারিত অনেক কিছুই আকবরনামাই আসেনি। এই বর্ণনার সূত্র ধরে লোককাহিনী, কাব্যগাথাঁ জনশ্রুতি এবং তার পরিবারের রাজ্যশাসন ব্যবস্থার বিবরণ ও বংশ পরম্পরায় বয়ে আনা ঘটনাপঞ্জির বিবরণগুলোর আলোচনার সন্ধি সেই ঈসা খানের পিতার প্রকৃত বিবরণ বের করতে হবে। আল্লামা আবুল ফজল আকবরনামায় বলেন (ঈসা খানের পিতা) পলি মাটির দ্বারা গঠিত ভাটি এলাকার মালিক বাইস রাজপুত বংশোদ্ভুত ছিলেন। তিনি অবিরাম বিদ্রোহ ও সংগ্রামেও লিপ্ত ছিলেন। সে সময় ছিল ইসলাম শাহের রাজত্বকাল।[৩১]

জেমস ওয়াইজের বর্ণনার সমর্থন পাওয়ার যায় ঢাকা থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মুন্সী রাজচন্দ্র ও পন্ডিত কালিকুমার চক্রবর্তী রচিত 'মসনদ আলী ইতিহাস' নামক গ্রন্থে। এ গ্রন্থে কালিদাস গজদানীকে ঈসা খানের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কালিদাস গজদানী থেকে দেওয়ানবংশ তথা বাংলার ঈসা খানের বংশের সূচনা হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন।[৩২] উল্লেখিত বর্ণনার আলোকে দেখা যায় ঈসা খানের পিতা ভাটিরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন এবং শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহের

[৩০] ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টাশালী, বেঙ্গল: পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট, ভল্যুম-৩৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৩১] আবুল ফজল আকবরনামা, ভল্যুম-৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৭

[৩২] দ্বীনেশচন্দ্র সেন "পূর্ব বঙ্গগীতিকা" ২য়,খন্ড, ২য় সংখ্যা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৩, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

রাজত্বকালীন সময় ভারত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যের অধিপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, ষোড়শ শতাব্দিতে বাংলা প্রদেশ বিশেষ করে এর পূর্বাঞ্চল দু:সাহসী এবং রোমান্টিক কার্য্যকলাপের আবাসস্থল ছিল। এলাকাটিতে আফগান, মগ, পর্তুগীজগণ অবাধে বিচরণ করতে পারত। ইসলাম শাহের রাজত্বকালে (১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ)-এ রকম একজন দুঃসাহসী সংগ্রামী বীর যিনি বাংলায় আগমন করেছিলেন এবং তার নাম ছিল "কালিদাস গজদানী" তিনি বাইস (বৈশ্য) রাজপুত বংশোদ্ভুত ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হন এবং তার নাম হয় সোলায়মান খান। তিনি ঢাকা ও ময়মনসিংহের উত্তর পূর্ব অংশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৩]

স্যার যদুনাথ সরকারের বর্ণনায় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সন্ধান পাওয়া যায় তা'হল ঈসা খানের পিতার নাম "কালিদাস গজদানী" ধর্মান্তরিত হবার পর তার নাম হয় "সোলায়মান খান"। অপর যে বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন তা'হল, কালিদাস গজদানীকে তিনি বাংলায় আগমনকারী একজন সংগ্রামী বীর হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, তিনি বাইস (বৈশ্য) রাজপুত বংশোদ্ভুত ছিলেন। তা'হলে কথা দাঁড়ায় যে, কালিদাস গজদানী বাংলায় আগমন করার পর ভাটিরাজ্যের অধীশ্বর হন। এখন প্রশ্ন হতে পারে, অযোধ্যা থেকে একজন লোক বাংলায় আগমন করে পূর্ববাংলার ভাটিরাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে নিজেকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন?

এ প্রসংগে ড. এম. এ. রহিম তার বাংলার সমাজিক ও সংস্কৃতি ইতিহাস গ্রন্থে যে বর্ণনাটি দিয়েছেন তা'হল, ভাগ্যান্বেষণে কালিদাস গৌড়ে আগমন করেন এবং সৈয়দ সুলতানের রাজস্ব বিভাগে চাকুরী লাভ করেন। প্রতিতা বলে তিনি রাজস্ব উজিরের পদে অধিষ্ঠিত হন। কথিত আছে যে, কালিদাস ব্রাহ্মণদেরকে স্বর্ণহস্তি দান করেন এবং "গজদানী" উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার নাম সোলায়মান খান। সোলায়মান খান বাংলার সৈয়দ বংশের শেষ শাসক সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে বিয়ে করেন। শেরশাহের নিকট এই বংশের পতনের পর সোলায়মান খান পূর্ব ময়মনসিংহ ঢাকা জেলা ও পশ্চিম সিলেট এবং ত্রিপুরা জেলার অংশ নিয়ে গঠিত ভাটি অঞ্চলে আশ্রয় নেন এবং সিংহাসনচ্যুত রাজ পরিবারের অভিজাত ব্যক্তিদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত আফগান শাসনের বিরুদ্ধে সেখান থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।[৩৪]

---

[৩৩] যদুনাথ সরকার সম্পাদিত, হিস্টী অব বেঙ্গল ভল্যুম-২, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৭

[৩৪] ড. এম. এ. রহিম "বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতি ইতিহাস" ২য় খন্ড, পৃ. ২০৭

উল্লেখিত তিনটি বক্তব্যের আলোকে এ বিষয়টিকে তথ্যভিত্তিক বলে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষে ঈসা খানের অধিনস্ত পুরুষদের বংশ পরম্পরায় লালিত বিবরণ সমূহ উপস্থাপন করা যায়। এ প্রসংগে ননিলীকান্ত ভট্টাশালী কালীদাস গজদানীর এক ভাই রামদাস গজদানীর অধঃস্তন পুরুষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটন করে এশিয়াটিক সোসাইটির একটি জার্নালে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন, পূর্ব ময়মনসিংহে অবস্থানকারী জয়চন্দ্র মহলানবীশ[৩৫] নামে একজন বিখ্যাত চিত্রকর আমার নিকট প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করেন যে, "আমি আমার পিতা এবং পিতামহের নিকট থেকে যা শুনেছি তা আপনার নিকট ব্যক্ত করছি। রামদাস গজদানী ও কালীদাস গজদানী তারা দুই ভাই ছিলেন। বড় ভাই রামদাস বাদশাহের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কিছুকাল তারা অন্য একজন বাদশাহের বিরাগভাজন হন এবং তাদের পরিবারসহ পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।[৩৬] পরবর্তী সময়ে তাদের পুরোহিতকে বীরভূমে রেখে তারা ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগনার "কাটাবারে" চলে আসেন। অতঃপর রামদাস পূর্ব ময়মনসিংহের নাসিরুজ্জিয়াল পরগনার 'খাগারিয়াতে' বাসস্থান নির্মাণ করেন।[৩৭] আমি রামদাস পরিবারের ১৬তম অধঃস্তন পুরুষ। এরূপ বলা হয়ে থাকে যে, কালিদাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বাদশাহের মেয়েকে বিয়ে করেন। তার পুত্র ঈসা খান।[৩৮]

উল্লেখিত আলোচনায় বিষয়টি অন্যভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কালিদাস গজদানী বঙ্গে আগমন করার সময় সাথে ছিলেন ভগীরথ সিংহ। কিন্তু চিত্রকর জয়চন্দ্র মহলানবীশের বর্ণনাতে কালিদাসের অন্য ভাই রাম দাস সিংহের নাম পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে হয়ত বা সুলতান মাহমুদ শাহের দরবারে রামদাস সিংহ পূর্ব থেকেই চাকুরীরত ছিলেন। এ সূত্র ধরে পরবর্তী সময়ে ভগীরথ সিংহ এবং কালিদাস সিংহ সুলতানের দরবারে উপস্থিত হন। বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করলে জয়চন্দ্র মহলানবীশের বর্ণনায় সামঞ্জস্য প্রতীয়মান হয়।

---

[৩৫] মহনবীশ যিনি রামদাস সিংহের ১৬ তম অধস্তন পুরুষ। তিনি বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন এবং পূর্ব ময়ংমনসিংহে অবস্থান করেন।

[৩৬] রামদাস ও কালীদাস গজদানী তাদের বংশের পুরহিতসহ বীরভূম জেলার হরিপুরে পালিয়ে যান

[৩৭] খাগারিয়া বর্তমান নেত্রকোনা জেলার মদন থানার অর্ন্তগত কাইটালে ইউনিযনের একটি প্রাচীন গ্রাম। পাশ্বের গ্রামটির নাম বাররী। খাগারিয়াতে অনেক অনুসন্ধানের পর মহলানবীশ পরিবারটির কোন সন্ধান পাইনি। বাররী প্রাচীন প্রত্রনবিশ পরিবারের বর্তমান অধঃস্তন এডভোকেট দুর্গেশ পত্রনবিশ বলেছেন, প্রাচীন এই নামকরা পরিবার সম্পর্কে আমাদের পূর্ব পূরুষরা বলেছেন এবং তারা খুবই জাকজমকের সাথে খাগারিয়াতে বসবাস করতেন। বর্তমানে খাগারিয়াতে কোন হিন্দু বসতি নেই সম্ভবত ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের পরেই এই পরিবারটি অন্যত্র চলে গেছে

[৩৮] ডঃ নলিনীকান্ড ভট্টাশালী বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেমেন্ট ভল্যুম-৩৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে ঈসা খান বর্তমান ১৬তম অধঃস্তন (হয়বতনগর দেওয়ান) জানতে চাওয়া হলে, তারা বলেন, রামদাস সিংহের বংশধরদের সাথে তাদের একটি সুসম্পর্ক ছিল। তাদের মধ্যে পারস্পরিক নিমন্ত্রণ ও আমন্ত্রন জানানোর রেওয়াজ ছিল।

বিষয়টি আরোও আলোচনা করলে, ঈসা খানের বংশধরদের মধ্যে যারা জঙ্গলবাড়ী বসবাস করতেন তাদের মধ্য থেকে অনেকেই বিভিন্ন সময় ঈসা খানের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান শুভনদাদ খান এবং আজীম দাদ খান নিয়োগে লিখিত 'মসনদালী' পুস্তকে মুসী রাজচন্দ্র ও পন্ডিত কালিকুমার চক্রবর্তী কালিদাস গজদানীকে ঈসা খানের পিতা বলে নির্দেশ করে এই গজদানী থেকেই দেওয়ান বংশের ইতিহাসের সূচনা নির্দেশ করেছেন। উক্ত পন্ডিতদ্বয় জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান পরিবারের রক্ষিত রাজ্যশাসন সংক্রান্ত পুরাতন কাগজ পত্র দেখবার সুযোগ হয়েছিল। ঐ সমস্ত কাগজপত্র এবং ইউরোপীয় ও দেশীয় ঐতিহাসিকদের গবেষণামূলক বিবরণ তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে লেখকদ্বয় "মসনদ আলী" ইতিহাস রচনা করেছিলেন।[৩৯]

পালাগানের অংশটি বর্ণনার বেলায় জৈনউদ্দিনের নাম কিভাবে আনলেন তা বোধগম্য হচ্ছে না। কারণ ১৫৩৩ হতে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই নামে বাংলার কোন শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায় না। সমসাময়িককালে ইতিহাসে পর্তুগীজ বর্ণনায় এবং গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের মন্ত্রী বা অমত্যের নাম জৈনউদ্দিন বলে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা'হল, বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের দরবারে রাজা ভগীরথ সিংহ কালিদাস সিংহকে সাথে নিয়ে আগমন করেছিলেন এবং সুলতানের রাজস্ব বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ঈসা খান অধঃস্তন পুরুষদের নিকট সংরক্ষিত বংশ তালিকাতেও রাজা ধনপৎ সিংহ রাজা রামদাস সিংহ রাজা ভগীরথ সিংহ এবং কালিদাস সিংহের নাম সংরক্ষিত রয়েছে। নিরেট সত্য কথাটি পাচ্ছি তাহল ঈসা খানের পিতা নাম ছিল কালিদাস গজদানী।

একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়ার দরকার, কালিদাস বঙ্গে আগমন এবং সুলতানের দরবারে চাকুরী গ্রহণ ও তা কন্যাকে বিবাহকরণ বিষয়টি ঐতিহাসিক ভাবে সত্য, তবে কথা হল, হোসেন শাহী বংশের কোন সুলতানের সময় আগমন করেন? এই গুরত্বপূর্ণ তথ্য বের করে আনতে হলে আরও বিবরণ উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

---

[৩৯] দীনেশচন্দ্র সেন "পূর্ব বঙ্গগীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

ড. ওয়াইজ কালিদাস গজদানীর সঙ্গে আগমনের সময়কাল নির্ণয় করেছেন। বাংলার হোসেন শাহী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় তার এক কন্যাকে (মুসলমান হওয়ার পর সোলায়মান খান) বিয়ে করেন।

অন্যদিকে মুন্সী রাজচন্দ্র ও পন্ডিত কালিকুমায় চক্রবর্তী দ্বয় "মসনদালী" পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ১৫৬০ থেকে ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গিয়াস উদ্দিন শাসক ছিলেন। তারই এক কন্যাকে কালিদাস গজদানী বিয়ে করেন। এমতাবস্থায় ঈসা খানের পিতা বঙ্গে আগমনকালীন সময়ের প্রকৃত তথ্য বের করতে হলে সমসাময়িককালে একটি ঐতিহাসিক পঞ্জি উপস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে।

ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি নিয়ে আলোচনা করার পূর্বেই একটি ঐতিহাসিক সূত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। ঐ সূত্রটি হচ্ছে আল্লামা আবুল ফজলের আকবরনামায় সোলায়মান খান সম্পর্কে বিবরণটির অংশ যেখানে বলা হয়েছে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ দিকে সোলায়মান খান শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ফলে তাকে ইসলাম শাহের দু'জন সেনাপতি তাজ খান ও দরিয়া খান যুদ্ধকালীন অবস্থায় সন্ধির জন্য আলোচনার কথা বলে কৌশলে ধরে ফেলেন এবং তাকে হত্যা করেন।[৪০]

শেরশাহের মৃত্যু হয়েছিল ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ। শেরশাহের মৃত্যুর পরই তার পুত্র ইসলাম শাহ (১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাজ খান ও দরিয়া খান সম্ভবত ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ দিকে বাংলায় অভিযানে রওয়ানা হয়েছিলেন। আর সোলায়মান খান তাদের হাতে নিহত হন ঐ বছরই কোন এক সময়। যা হোকে ঐতিহাসিক সমরপঞ্জি থেকে আমরা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারব।[৪১]

ঐতিহাসিক সমরপঞ্জি

১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের গৌড়ের সিংহাসনারোহন।

১৪১৫ খ্রিস্টাব্দ সুলতান-নাসির উদ্দিন নূসরত শাহের সিংহাসনারোহন।

১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহের সিংহাসনারোহন ।

১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ সিংহাসনারোহন।

১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ শেরশার ভারত সম্রাট হন।

---

[৪০] আবুল ফজল আকবরনামা"৩য় খন্ড,পৃ. ৬৪৭

[৪১] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান "ঈসা খান" প্রাগুক্ত, ঢাকা, পৃ. ২২

১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ ইসলাম শাহ (সেলিম খান) ভারতের সম্রাট হন। মোহাম্মদ খান সূরকে বাংলায় শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।

১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দ তাজ খান ও দরিয়া খান কর্তৃক সোলায়মান খান নিহত হন।

১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ ইসলাম শাহের মৃত্যু সুবারিজ খানের সিংহাসনারোহন।

১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ সুলতান শামসুউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ গাজী কর্তৃক বাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা।

১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ আদিল শাহ কর্তৃক মোহাম্মদ শাহ গাজী নিহত, শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ। মোহাম্মদ শাহ গাজীর পুত্র খিজির খান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ উপাদি গ্রহণ পূর্বক শাহবাজ খানকে পরাজিত করে বহু অধিকার।

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ আদিল শাহ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত।

১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ বাহাদুর শাহের মৃত্যু, গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহের সিংহাসনারোন।

১৫৬৩-১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ সুলতান গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহকে হত্যা করে। বিহারের শাসনকর্তা তাজ খান কবরানীর বাংলার সিংহাসন অধিকার। সরাইলে ঈসা খানের পৈত্রিক জমিদারী লাভ।

১৫৬৪-১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ তাজ খান কবরানীর মৃত্যু এবং তার ভাই সোলায়মান খান কররানীর সিংহাসন লাভ।

১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ সোলায়মান খান কররানীর মৃত্যু।

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ ভাটিরাজ্যের অধিপতি হিসাবে ঈসা খানের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ।

ঐতিহাসিক তারিখগুলোতে আমরা দেখেছি ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ ইসলাম শাহ সিংহাসনারোহন করেন এবং ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ঐ সময়ে ভাটিরাজ্যের অধীশ্বর সোলায়মান খান বিদ্রোহ করেন এবং নিহত হন।

অন্যদিকে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসনে বসেন ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ দিকে এবং ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুলতান ছিলেন। ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ বাংলার সিংহাসনে বসেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ। সুলতান গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন ১৫৬০-১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অপর দিকে সোলায়মান খান নিহত হবার সময়কাল ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের পর ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দ পূর্বে, অতএব সুলতান গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহের রাজতের বহু পূর্বে সোলায়মান খান বাংলায় এসেছিলেন এবং তার রাজত্বকালের বহু পূর্বেই তিনি নিহত হন।

সোলায়মান খান ইসলাম শাহের রাজত্বকালে নিহত হন। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ সম্রাট শেরশাহের মৃত্যু হলে তৎপুত্র ইসলাম শাহ রাজ্যলাভ করেন। তার শাসনকালে রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহ বহিঃ

Dhaka University Institutional Repository

প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। রাজধানী দিল্লীর দূরত্ব ও কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে প্রধান রাজস্ব সচিব দেওয়ান সোলায়মান খান সম্রাটের বিরুদ্ধাচারণ করতে প্রয়াস পেলেন। কিন্তু অচিরেই বিহারের শাসনকর্তা তাজ খা ও শাহী সেনানায়ক দরিয়া খাঁ তাকে দমন করতে বঙ্গদেশে আগমন করলেন। যুদ্ধে সুলায়মান খান নিহত হলেন ও তার দুই পুত্র ঈসা খান ও ইসমাইল খান বন্দী হয়ে বণিকদের নিকট দামরূপে বিক্রয় হলেন।[৪২]

আল্লাহমা আবুল ফজলের বর্ণনায় দেখা যায় সোলায়মান খান ইসলাম শাহের রাজত্বকালীন সময় নিহত হন। ঐ সময় তার দুই পুত্র ঈসা খান ও ইসমাইল খান আফগানদের হাতে বন্দি হন। ড. আব্দুল করিমের মতে, সোলায়মান খান নিহত হয়েছিলেন ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দ বা ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দ । এই সমস্ত ঘটনার পর অর্থাৎ ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহের রাজত্বের সূচনা হয়। কালিদাস (সোলায়মান খান) সুলতান গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহের সময় বঙ্গে এসে সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এটা সম্পুর্ণ অবান্তর বক্তব্য। অতএব "মসনদ আলী" ইতিহাসের ঐ বিবরণটুকু গ্রহণ যোগ্য নয়। অপরদিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তা'হলে দেখব সোলায়মান খান সম্রাট ইসলাম শাহের রাজত্বকালীন সময়ই বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন। প্রশ্ন তিনি ঐ সময় কেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এ প্রসংগে ডঃ ননিলীকান্ত ভট্টাশালী বলেন, সোলায়মান খানের পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ থেকে অনুমিত হয় যে, ঐ সময় বাংলায় যে বংশ (শেরশাহ শূরী) শাসন করত সেই বংশের বিরুদ্ধে তার বিদ্বেষ ছিল। আর সেই বংশের সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট শেরশাহ সূরী সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহকে পরাজিত করেন ১৫৩৮ থেকে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। বাংলার সুবেদার হিসেবে খিজির খান বাইরাক ক্ষমতা গ্রহণের পর সোলায়মান খান খিজির খানের সাথে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের কণিষ্ঠ কন্যাকে বিয়ে দিয়ে বাংলার সুলতান হিসেবে শপথ করান। সম্রাট শেরশাহ এই খবর পেয়ে খিজির খান বাইরাককে গ্রেপ্তার করেন। এরপর সোলায়মান খান শেরশাহের রাজত্বকালীন সময়ে কোন বিবাদে না জড়িয়ে ভাটি অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শেরশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অথবা ভাটি অঞ্চলের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা উচিৎ হবে না। তাই পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ইসলাম শাহের রাজত্বকালে সোলায়মান খান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

---

[৪২] মোহাম্মদ মতিউর রহমান "দেওয়ান ঈসা খাঁ" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মে ১৯৮০, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, বিদ্রোহের ঘোষণা আরও একটি বিষয় আবিস্কার হচ্ছে। যেহেতু সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে সোলায়মান খান বিয়ে করেছিলেন। এ সুলতানের কন্যার জামাতা হেতু বাংলার সালতানাতে আইন সংগত উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে মনে করতেন।[৪৩]

১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দ বঙ্গে স্বাধীন হাবশীবংশীয় সুলতান মুজাফফর শাহকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত[৪৪] করে প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ রাজপথে অভিষিক্ত হন এবং অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন ভাবেরাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালে একটা রাজদরবারে সেনাপতি কালাপাহাড়ের[৪৫] সঙ্গে ধর্ম সম্পর্কীয় তর্ক যুদ্ধে পরাভূত হয়ে দেওয়ান কালিদাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্বক সোলায়মান খান নাম ধারণ করেন। সুলতান হুসেন শাহের দুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। শ্রীহট্ট বিজয়ী সৈয়দ নাসিরউদ্দিন সিপাহসালাহের পৌত্র সৈয়দ ইব্রাহিম মালিকুল উলামা (র.) সেনাপতি কালাপাহাড় ও দেওয়ান সোলায়মান খান যথাক্রমে এই তিন কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪৬]

এ প্রসংগে ডঃ ননিলীকান্ত ভট্টাশালী বলেন, ইসলাম শাহের রাজত্বের পূর্বে একমাত্র গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ রাজত্ব করতেন এবং তিনি কালিদাস গজদানীর (সোলায়মান খান) শ্বশুর ছিলেন। শেরশাহ কর্তৃক গৌড় অধিকারের পুর্ব ইসলাম শাহ যখন সুলতানের পুত্রকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তখন কালিদাস গজদানী (সোলায়মান খান) গৌড়ের বৈধ উত্তরাধিকারী মনে করেন। আর এজন্যই পরবর্তী সময়ে অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ন্যায় সংগত কারণ ছিল।[৪৭]

আলোচনায় সিদ্ধান্তটি এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, সোলায়মান খান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কন্যাকে বিয়ে করেননি, বরং তার পুত্র সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে

---

[৪৩] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান "ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা" প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

[৪৪] এই যুদ্ধে ১২০০০০ হিন্দু মুসলিম সৈনিক প্রাণ বিসর্জন করেন। রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত "রিয়াজ-উস-সালতীন" পৃ. ১২১

[৪৫] কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রাজেন্দ্র। তিনি জাতিতে ব্রাক্ষণ ছিলেন। তার সুগঠিত বিরাট রূপ দর্শনে সাধারণ কালাপাহাড় আখ্যা প্রদান করে। তিনি হুসেনশাহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুলতালের দ্বিতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। হুসেনশাহের রাজত্বকালে তিনি আসামের কামরূপ অধিকার পূর্বক তথাকার কামাখা দেবীর মন্দির ও মুর্তি এবং পরবর্তী স্বাধীন নওয়াব সোলেমান কররাণীর রাজত্বকালে উড়িষ্যা অধিকার পূবর্ক পুবীর জগন্নাথ দেবের মন্দির বিনষ্ট করেন। তিনি ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ দাউদ খানের অধীনে রোটাসগড় রক্ষার্থ যুদ্ধে মোঘল সেনাপতি মাসুম খার হাতে নিহত হন

[৪৬] মোহাম্মদ মতিউর রহমান "দেওয়ান ঈসা খাঁ" প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[৪৭] ড. নলিনীকান্ত, ভট্টাশালী বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেমেন্ট ভল্যুম-৩৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে করেছিলেন এবং সেই সুবাদে তার শ্বশুরের পক্ষ থেকে ভাটিরাজ্যের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এ প্রসংগে ডঃ এম, এ, রহিমের বিবরণটি ছিল সোলায়মান খান বাংলার সৈয়দবংশের শেষ সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদশাহের কন্যাকে বিয়ে করেন। শেরশাহের নিকট এ বংশের পতনের পর তিনি ভাটিঅঞ্চলে আশ্রয় নেন এবং সিংহাসনচ্যুৎ রাজপরিবারের অভিজাত ব্যক্তিদের সহযোগিতার নব প্রতিষ্ঠিত আফগান শাসনের বিরুদ্ধে সেখানে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।[৪৮]

এটা স্পষ্ট যে, সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়ই সোলায়মান খান বঙ্গে আগমন করেছিলেন এবং আরও একটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারলাম যে, তিনি গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন।

তবে এই বিষয়টির উপর এইভাবে আলোচনা করার দরকার যে, তিনি গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের কোন কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন?

পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে, সুলতান হুসেন শাহের দুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। শ্রীহট বিজয়ী সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালাদের পৌত্র সৈয়দ ইবাহিম মালেকুল ওলামা (র.)। সেনাপতি কালাপাহাড় ও দেওয়ান সোলায়মান খান যথাক্রমে এই তিন কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন।[৪৯]

এ প্রসংগে আব্বাস খান শেরওানী তারিখ-ই-শেরশাহীতে বলেন, ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল যে, বাংলার সুবাদার খিজির খান বাইরাক বাংলার পরলোকগত রাজা সুলতান মাহমুদের কন্যাকে বিয়ে করে সে দেশের রাজাদের প্রথা অনুযায়ী চৌকিতে উপবেশন করেছেন। এই সংবাদে শেরখান উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বিপদ ঘনিয়ে উঠার পূর্বেই তার মূলোচ্ছেদের জন্য হযরত খান নিয়াজী হাবীব খান, বাই হোসেন হালওয়ায়ীকে রোহতাম দূর্গে রেখে শেরশাহ স্বয়ং বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। শেরখানের বাংলায় আগমনের পর খিজির খান সংবধনা জ্ঞাপনের জন্য এলে শেরখান বললেন-আমার বিনা অনুমতিতে আপনি কেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদের কন্যাকে বিয়ে করলেন এবং বাংলার রাজকীয় প্রথানুযায়ী চৌকিতে উপবেশন করেছেন? রাজার অনুমতি ব্যতীত

---

[৪৮] এম. এ রহিম, এ বেঙ্গল ওযারিয়ার প্রবন্ধ বেঙ্গল লিটারেরী রিভিউ পত্রিকা, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় খন্ড, পৃ. ২৭

[৪৯] মোহাম্মদ মতিউর রহমান "দেওয়ান ঈসা খাঁ" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মে ১৯৮০, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

আমীরদের কোন কাজ করার অধিকার নেই। অতঃপর শেরখান খিজির খানকে বন্দী করার নির্দেশ দেন।[৫০]

খিজির খান সুরুজের সাথে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যার এই বিয়ে সম্পর্কে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন সোলায়মান খান। কেননা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শের শাহের হাতে পরাজিত হয়ে ভাটিরাজ্য সোলায়মান খানের নিকট আশ্রয় নেন। আর যেহেতু সোলায়মান খান গিয়াস উদ্দিন মাহমাদ এর এক কন্যাক বিয়ে করেন। অন্যদিকে ভাটিরাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থেই সোলায়মান খান সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে বাংলার গভর্নর খিজির খান সুরুরের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।

বিবরণগুলোর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের তিন কন্যা ছিল ১ম কন্যাকে বিবাহ করেন সিলেট বিজয়ী হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার (র.)-এর ৩য় অধঃস্তন পুরুষ হযরত সৈয়দ ইব্রাহিম মালেকুউল উলামা (র.), ২য় কন্যা সৈয়দা সেলিনা খাতুনকে বিয়ে করেন সোলায়মান খান। ৩য় কন্যাকে বিবাহ করেন শেরশাহ কর্তৃক নিয়োগকৃত বাংলার প্রশাসক খিজির খান।

মসনদ আলীর ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে সোলায়মান খান সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের ৩য় কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এইমত গ্রহণ করা যায় না। কারণ খিজির খান বাংলার প্রশাসক নিযুক্ত হন ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দ দিকে সুলতানের মৃত্যুর পর। অন্যদিকে সুলতানের জীবিত অবস্থায় সোলায়মান খান বঙ্গে আগমন করেন ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দ দিকে। এমতাবস্থায় সোলায়মান খান সুলতানের ২য় কন্যাকেই বিয়ে করেছিলেন এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সবশেষে, ঈসা খানের পিতার নাম কালিদাস গজদানী বাংলার হোসেন শাহীরবংশের শেষ সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের দরবারে প্রথম রাজস্ব উজির পদে চাকুরি গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নাম রাখেন সোলায়মান খান এবং পরবর্তী সময়ে তিনি মাহমুদ শাহের ২য় কন্যাকে বিবাহ করেন। গিয়াস উদ্দিন মাহমুদের পতনের পর তিনি রাজ্যে ক্ষমতাসীন হন।[৫১]

---

৩৬ আব্বাস খান শেরওয়ানী, তারিখ-ই-শেরশাহী-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯

[৫১] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান "ঈসা খান" প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যাদের ভূমিকা অবিস্মরনীয় হযরত শাহজাজালাল (র.) ও সেনাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালাহ তাদের উত্তরসূরীরা বাংলার ক্ষমতাশীল হয়ে বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও ইসলামী কৃষ্টি কালচার রক্ষায় ভূমিকা রেখে অমর হয়ে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। যার ফলাফল ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম লাভ করে। যার বদৌলতে ৯০% মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সোলায়মান খানের জায়গীর লাভ, ভাটিরাজ্য ও আফগানদের সাথে সংঘাত

বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে মসনদ-ই-আলা ঈসা খানের অবদান প্রমাণ করতে হলে ঈসা খানের পিতার সোলায়মান খানের উত্থানসহ বভিন্ন দিক পর্যারোচনা করা প্রয়োজন। তাই এ অধ্যায়ে সোলায়মান খান কিভাবে নিজেকে ভাটিরাজ্যে শক্তিশালী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। ভাটিঅঞ্চলের কোন স্থানে তার কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় ভাটিরাজ্যের অবস্থানগত সীমা অথবা ভাটিরাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র কোথায় ছিল, এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈততা পর্যালোচনা করা হল।

আল্লামা আবুল ফজলের বর্ণনা অনুযায়ী সোলায়মান খান ভাটিরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই ভাটিরাজ্যটির স্থান নির্দেশনা দিয়ে করেছেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন, সোলায়মান খান ঢাকা এবং ময়মনসিংহের উত্তর-পূর্ব দিকে ভাটি অঞ্চলের একটি অংশে তার স্বাধীন রাজত্বটি প্রতিষ্ঠা করেন।[৫২]

ভাটি অঞ্চলের কোন কোন স্থানে সোলায়মান খানের স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল যদুনাথ সরকার প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। ভৌগৌলিক দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণ করলে স্যার যদুনাথ সরকারে উল্লেখিত বিবরণটি নিয়ে যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হয়। কেননা, ঢাকার উত্তরে ময়মনসিংহ অঞ্চলের অবস্থান থাকায় ঢাকা এবং ময়মনসিংহের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্থান বের করা জটিল বিষয়। খুলে বললে, ঢাকার উত্তরে-পূর্বকোণে বৃহত্তর ময়মনসিংহের পূর্ব-দক্ষিণ কোণ আর ময়মনসিংহের উত্তর-পূর্ব কোণ বের করলে দেখা যায় এ এলাকাটি হবে আসামের গারোপাহাড়। স্যার যদুনাথ সরকার উল্লেখিত স্থান নির্দেশনায় হয়ত ভ্রমে পতিত হয়েছিলেন। তিনি যদি সোলায়মান খান রাজ্যটিকে ঢাকার উত্তর-পূর্বকোণ বলতেন তা'হলে আমরা সহজেই ধরে নিতাম যে, বৃহত্তম সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, কুমিল্লা জেলার পশ্চিম উত্তরাঞ্চল, ঢাকা জেলার উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল নিয়েই ভাটিরাজ্যের অবস্থান ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্থান নির্ধারণ একটি জটিল ব্যাপার বটে। এর সমাধানে আমাদের অবশ্যই ঐতিহাসিক বিবরণের সূত্র ধরেই সিদ্ধান্ত উপনীত হতে হবে যে, প্রথমত সোলায়মান খানের জায়গীর ও পরবর্তী সময়ে তাঁর স্বাধীন রাজত্বটি কোন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

---

[৫২] স্যার যদুনাথ সরকার- হিজরী অব বেঙ্গল ভল্যুম-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

ড. নলিনীকান্ত ভট্টাশালী অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বিবরণ পর্যালোচনা পূর্বক বলেছেন যে, ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ ঈসা খান সর্বপ্রথম সুলতান তাজ খান কররানীর অনুগ্রহে সরাইলে[৫৩] তার পিতার জমিদারী প্রাপ্ত হন। নলিনীকান্ত ভট্টাশালী ঈসা খানের সাথে মোঘলদের প্রথম যুদ্ধটির স্থান "কাস্তলের" আলোচনা করতে গিয়ে ঈসা খানের অবস্থানের উপর বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, ঈসা খানের প্রথম উত্থান সরাইল থেকে ঘটে।[৫৪] আবদুল করিম ও ননিলীকান্ত ভট্টাশালীর মতের সমর্থক। তিনি বলেছেন ঈসা খানের পিতার পরিত্যক্ত জমিদারী সরাইলে পরগনার মালিক হন।[৫৫]

নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও আবদুল করিম এবং অন্যান্য বক্তব্য থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে, সুলায়মান খানের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজত্বের প্রশাসনিক কেন্দ্র দিল সরাইল। যা বর্তমানে মেঘনা ও তিতাস নদীর[৫৬] মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কিন্তু সমস্যার বিষয় হল, সোলায়মান খানের স্বাধীন রাজ্যটির ভৌগৌলিক অবস্থান কি ছিল এ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

সরাইল থানা সদর দপ্তরের সামান্য কিছু অংশ পশ্চিমে বিখ্যাত আরেফাইন মসজিদটি যেখানে অবস্থিত সেখানেই ছিল সোয়মান খানের প্রাসাদবাটি। যদিও অনেকে আরেফাইন মসজিদটিকে সম্রাট শাহজাহানের সময়কার মসজিদ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এ মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন মাজারের স্থাপত্য কৌশল অনুধাবন করলে অনুমিত হয় যে, ঐ মসজিদ ও মাজার সুলতানী আমলে শেষ দিকে অথবা মোঘল আমলের প্রথম দিকের স্থাপত্য নিদর্শন। তাছাড়া উক্ত মসজিদ ও মাজার যেখানে অবস্থিত তার পার্শ্বেই বেশ কয়েকটি প্রাচীন পুকুর এবং ঐ জায়গায় চতুর্দিকে একটি পরিখা ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। মসজিদ ও মাজারের শিলালিপি অপসারিত হওয়ায় এ বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি হলেও জনশ্রুতি বিবিধ বর্ণনা অনুযায়ী সোলায়মান খানের প্রাসাদ বাটি হিসেবে এই স্থানটিকে নির্দিষ্ট করা যায়।

---

[৫৩] সরাইল বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একটি থানা এবং প্রাচীন স্থান সরাইলের পূর্ব নাম ছিল সাতার খান্দাল।

[৫৪] ডঃ নলিনীকান্ড ভট্টাশালী বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট ভল্যুম-৩৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[৫৫] আব্দুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৪৪৮

[৫৬] ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল থেকে এই নদীর উৎপত্তি। পরে আগরতলার পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে আখউড়ার কাছে বাংলাদেশের প্রবেশ করেছে এবং প্রথমে উত্তরে পরে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে মেঘনায় মিলিত হয়েছে। বর্তমানে কুমিল্লা জেলার একটি থানা।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী আমলে বাংলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতর বিভাগ ছিল পরগনা[৫৭]। পঞ্চদশ শতকের কয়েকটি শিলালিপিতে পরগনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার মুসলমান শাসকগণ সাধারণত যেই সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন যা দিল্লী সুলতানগণ তাদের রাজ্যের প্রবর্তন করতেন। সম্রাট আকবরের আমলে বাংলাদেশে ৬৮৮টি মহাল/পরগনার এক তালিকা আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যদিও সেই সময় সমগ্র বাংলাদেশ আকবরের অধীনে ছিল। অধিকাংশ এলাকাই বার ভূঞাদের দখলে ছিল। তথাপি আবুল ফজল সমগ্র বাংলার পরগনার নাম উল্লেখ করেছেন। যতদুর সম্ভব মনে করা যায় তিনি ঐ পরগনার নাম পরবর্তী শাসকদের তথ্যাদি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে হোসেন শাহী সালতানাত এবং আফগান শাসনের সময় পরগনা বিভাগের প্রচলন ছিল।[৫৮]

রাজস্ব সংক্রান্ত আইন ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে, সরকার ও রায়তের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য পরগনা কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালন করতেন। সমসাময়িক কালের দলিল দস্তাবেজ থেকে জানা যায় পরগনাসমূহে বেশ কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ পদবীধারী কর্মচারী দায়িত্ব পালন করতেন। আর এজন্য প্রয়োজন ছিল বাংলার সুলতানের একান্ত আপনজনদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করা আর ঐ প্রেক্ষিতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ সোলায়মান খানকে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে জায়গীর প্রদান করেছিলেন।[৫৯]

মধ্যযুগের প্রজন্ম থেকেই ভাটি অঞ্চলের যে সকল এলাকা কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিল তন্মধ্যে মদন, বোকাই নগর, খালিয়াজুরী, হজরানী, লাউড় প্রভৃতি স্থানগুলোতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের রাজারা রাজত্ব করতেন।

ভাটি নামক রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়েছিল এ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায়, একাদশ শতাব্দিতে আসামের কাছাড় রাজ্যের নাগান্ধ নামে একজন রাজার অধঃস্তন 'জোঙ্গাল বোলাহুর' কাছাড় রাজ্য থেকে কোন কারণে বিতাড়িত হয়ে এই অঞ্চলে আসেন এবং ভাটিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।[৬০] ধারণা করা হয়ে থাকে যে, ভাটির রাজধানী জঙ্গলবাড়ী জোঙ্গাল

[৫৭] পরগনা আরবী শব্দ, প্রতিশব্দ, মহাল।

[৫৮] ড. এম এ রহিম, বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ২য় খন্ড, পৃ. ৭০

[৫৯] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহাজাহান, মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭

[৬০] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান-রচিত, প্রাচীন ভাটিরাজ্যের রাজধানী জঙ্গলবাড়ী, কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী-নববর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৯৯২ পৃ. ৪১-৪৭

বোলাহরের নামে নাম করা হয়েছিল। ঐ সময় বর্তমান সিলেট, হবিগঞ্জ, সোনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জেলার হাওড় এলাকা সমন্বয়ে ভাটি অঞ্চল গঠিত হয়ে ছিল বলে ধারণা করা যায়। দ্বাদশ শতাব্দিতে জিতারী নামে কামরূপের একজন ক্ষত্রিয় রাজা কামরূপের রাজধানী গৌহাটি থেকে ভাটিতে স্থানান্তরিত করেন।[৬১] এরপর ভাটি অঞ্চলটি আবারও বেশ কয়েকটি সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে বনিয়াচং, লাউড়, খালিয়াজুরী, তরফ, মদনপুর জঙ্গলবাড়ি ছিল অনত্যম। এছাড়াও তরফ ও জঙ্গলবাড়ির কিছু অংশ নিয়ে একটি সালতানাতের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বাধীন সালতানাতি কায়েম হয়েছিল সম্রাট শেরশাহের রাজত্বকালীন সময়েই। এ স্বাধীন রাজ্যের সুলতান বারবাক শাহের উৎকীর্ণ মুদ্রা থেকে প্রমাণ হয় যে, এই অঞ্চলটিতে সম্রাট শেরশাহের নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

লাউড় অঞ্চলের সামন্ত রাজা কেশব মিশ্রের অধঃস্তনগণ ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নাউড়, জগন্নথপুর এবং বানিয়াচং শাসন করতেন বলে সিলেট ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬২] অন্যদিকে নাম্বোধর নামে একজন রাজা খালিয়াজুরীতে রাজত্ব করতেন বলে ময়মনসিংহের ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে।[৬৩] পঞ্চদশ শতাব্দির প্রথম দিকে তরফ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন সিলেট বিজয়ী হযরত শাহজালাল (র.)-এর সিপাহসালা হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন সুলায়মান খনের সময় সিপাহসালা সৈয়দ নাসির উদ্দিন (র.)-এর তৃতীয় অধঃস্থন হযরত ইব্রাহিম মালেকুল উলামা তরফ রাজ্যের অধিকর্তা ছিলেন।

ভাটি অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। এলাকাটিতে যে শেরশাহের নিয়ন্ত্রণ ছিল না তার আরো প্রমাণ বিদ্যমান। পূর্বে উল্লেখিত মহাল বাড়ির কিছু অংশ এবং তরফের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত সালতানাতের শাসক ছিলেন বারবাক শাহ নামে একজন স্বাধীন সুলতান।[৬৪]

ননিলীকান্ত ভট্টাশালীর মতে তিনি ১৫৪২ থেকে ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার দু'টি মুদ্রার মধ্যে একটি কিশোরগঞ্জ শহরের নিকট যশোদল গ্রামে, অন্যটি সিলেটের সোনাখিয়া গ্রামে আবিস্কৃত হয়েছে। মুদ্রার পাঠ নিম্নরূপ;

---

[৬১] শ্রী কেদার নাথ মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৬২] বাংলাদেশ ডিটিষ্ট গেজেটিয়ার সিলেট এম এন রিজভী সম্পাদিত, ১৯৭৪, পৃ. ৬০

[৬৩] শ্রী কেদার নাথ মজুমদার রচিত ময়মনসিংহের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[৬৪] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

বারবাক উদ্দুনিয়া ওয়ালদীন আবুল মোজাফফর বারবাক শাহ বিন হুমায়ুন শাহ খল্লদুল্লাহ মুলকাহু ওয়াসুলতানুহু ৯৪৯ হিজরী।[৬৫] মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, শেরশাহের রাজত্বকালের মধ্যভাগে তিনি বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুদ্রায় টাকশালের নাম না থাকায় ঠিক কোন অঞ্চলে তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন এ বিষয়ে বলা যায় না। তবে মুদ্রা প্রাপ্তিস্থান লক্ষ্য করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কিশোরগঞ্জ, সিলেট অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, খিজির খান বন্দি হবার পর বাংলার সালতানাতের সপক্ষের ব্যক্তিগণ ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তারা শেরশাহের আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে বাংলার ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন।

যেহেতু ঐতিহাসিকদের তুলনামূলক বিবরণীতে প্রমাণিত হয়েছে সোলয়মান খানের স্বাধীন রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল সরাইল। সেহেতু সরাইলের আশপাশের অঞ্চল সমূহের মধ্যে বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম, ভৈরব, কুলিয়ারচর, নিকলী, ব্রাহ্মণবড়িয়া জেলার নাসিরনগর, সরাইল, আশুগঞ্জ, নবীনগর এবং কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর প্রভৃতি অঞ্চলসমূহ সোলায়মান খানের স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে সাব্যস্ত করা যায়।[৬৬]

এরপর সোলায়মান খান সম্পর্কে জানা যায় ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ দিকে সম্রাট ইসলাম শাহ (সেলিম খান) রাজত্বের সময় এ প্রসংগে আবুল ফজল, "আকবর নামায়" বলেছেন, ভাটি রাজ্যের অধিকর্তা সোলায়মান খান ঐ সময় অবিরাম বিদ্রোহ এবং সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। এরপর তাজ খান ও দরিয়া খান বিরাট সৈন্য বাহিনী সহ সোলায়মান খানের রাজত্বে গিয়েছিলেন এবং অনেক সংগ্রামের পর তিনি আত্মসমর্পন করেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি আবার বিদ্রোহ করেন। আবার সোলায়মান খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাঁজ খান ও দরিয়া খান ভাটিরাজ্যে আগমন করেন। অতঃপর সন্ধির কথা বলে তারা সোলায়মান খানকে কৌশলে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে।[৬৭]

---

[৬৫] নলিনীকান্ত ভট্টাকালী, বেঙ্গল-ভল্যুম-৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬, এবং ৯৪৯ হিজরীতে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ ছিল।

[৬৬] মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান-প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[৬৭] বাংলার সুলতান মুহাম্মদ খান সূরের বংশধর সুলতান জালাল শাহকে সরিয়ে সুলতান গিয়াস উদ্দিন নামে একজন বংলার সিংহানে আরোহন করেন। এর পর ১৫৬৩/১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ তাজ খান বাংলার অভিজাত শ্রেণীর সহায়তায় বিহার থেকে ক্রমে সুলতান গিয়াস উদ্দিনকে পরাজিত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার কনের। উল্লেখযোগ্য যে, এই তাজ খান সম্রাট ইসলাম শাহের নির্দেশে ১৫৪৬/১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দ দিকে ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খানকে হত্যা করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফজলের উল্লেখিত আলোচনায় বুঝা যায় সোলায়মান খান শেরশাহের পুত্র সেলিম শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পূর্ব থেকেই তার রাজত্বের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। সোলায়মান খান কি কারণে বারবার সম্রাট সেলিম শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এর কারণ পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা'হল ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ বাংলা অধিকার করার পর হোসেন শাহী সালতানাতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার একটি পরিকল্পনা সোলায়মান খান গ্রহণ করেছিলেন।

ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুযায়ী আফগানদের সাথে সোলায়মান খানের প্রথম যুদ্ধটি সংঘঠিত হয়েছিল ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সোলায়মান খান স্বাধীন ভাবে ভাটি অঞ্চলের রাজত্ব করেছেন এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ আফগানদের দ্বারা গৌড় পদানত হবার পর হোসেনশাহী সালতানাতের সকল অমাত্য, জায়গীরদার ও কর্মচারীগণ পুর্বাঞ্চলে ভাটিরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে বিভিন্ন এলাকায় তাদের আধিপত্য বিস্তার ঘটে। তারা নিজ নামে মুদ্রা চালুসহ স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করতে থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শেরশাহ বাংলাকে কয়েকটি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করলেও প্রশাসনিক ঐক্যের খাতিরে কাজী ফজিলতকে সারাবাংলার আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি একজন বিদ্বান ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। তবে তার কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিলনা। বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের মধ্যে নীতির ক্ষেত্রে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। সম্রাটের ফরমান যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা এবং এ বিষয়ে প্রশাসকদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা থাকলে তিনি সে বিষয়ে শুধু মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন। ফলে সমগ্র বাংলাদেশ শেরশাহের আধিপত্য ঘটাতে ব্যর্থ হয়। সমগ্র পূর্ব বাংলায় শেরশাহের এমন কোন প্রতিনিধি বা প্রশাসক ছিল না যার মাধ্যমে নির্বিঘ্নে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

সমসাময়িক কালে বাংলাদেশে উৎকীর্ণ শেরশাহের বেশ কয়েকটি মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। এই মুদ্রাগুলো ৯৪৬ হিজরী (১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ৯৫১ হিজরী (১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত সময়ে পান্ডুয়া, সাওগাঁও শরীফাবাদ এবং ফতেহাবাদ টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়।[৬৮] এই টাকশালগুলোর সবকটি উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে অবস্থিত ছিল। উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এলাকার তার কোন টাকশাল না থাকায় প্রতীয়মান হয় এই এলাকাগুলো শেরশাহের অধিকারভূক্ত ছিল না। এমতাবস্থায়

---

[৬৮] জার্নাল অবদি ন্যু মেজমেটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া ভল্যুম-২, ১ম খন্ড-১৯৫৬, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সোলায়মান খান আবুল মোজাফফর বরবাক শাহ এবং আরও অন্যান্য জায়গীরদার ও জমিদার স্বাধীন ভাবেই তাদের রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন।[৬৯]

শেরশাহ ভাটি অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ শেরশাহের মৃত্যুর পর পুত্র জালাল খান ইসলাম শাহ নাম ধারণ করে পিতার প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাতিল করেন। সামসউদ্দিন মোহাম্মদ সুর নামে তার আত্মীয়কে সমগ্র বাংলার গভর্ণর নিয়োগ দান করেন। সমগ্র বাংলাকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এই কারণেই তিনি সোলায়মান খানের ভাটিরাজ্যের প্রতি দৃষ্টি দেন। ফলে সোলায়মান খানের ভাটি রাজ্যের অস্থিত্ব বিপন্ন হবার আশংকা দেখা যায়। এই সূত্রে সর্ব প্রথম সোলায়মান খানের সাথে আফগানদের সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে।

১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে সোনারগাঁও থেকে সুজাত খানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য সোলায়মান খানকে ইসলাম শাহের প্রতি অনুগত্য স্বীকার করানোর জন্য এক ফরমানসহ প্রেরণ করা হয়। সোলায়মান খান এই সংবাদ প্রাপ্তির পর প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু আফগান সেনানায়ক সুজাত খান সোলায়মান খানকে নিঃশর্তভাবে ইসলাম শাহের অনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার নির্দেশ দেন। সোলায়মান খান একজন বিশেষ দূত মারফত এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, যেহেতু সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তিনি বাংলার সালতানাতের আইনসংঘত উত্তরাধিকারী বাংলার সালতানাতের বিস্তীর্ণ জনপদ এখনও তার আওতাধীনে আছে সেহেতু তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে যে, কোন শর্ত আরোপ করা হবে তা তিনি মেনে নেবেন না। শেরশাহের রাজত্বের সময় যে নিয়মে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেছেন সেই নিয়মে ভাটিরাজ্য শাসন করার জন্য তাকে যেন সুযোগ দেওয়া হয় এবং পত্রে সুজাত খানকে অনুরোধ করেন এই পত্রটি যেন সম্রাটের নিকট পেশ করা হয় উত্তর না আসা পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখা হয়। সুজাত খান পত্রটি সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন এবং সরাইলের পাঁচ মাইল পূর্ব পানিশ্বর (পানিরশ্বর) নামক স্থানে রাজকীয় ফরমানের অপেক্ষা করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে সোলায়মান খানকে অনুগত আদায়ের আদেশ দেন সোলায়মান খান অনুগত স্বীকার না করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। অবশেষে পানিশ্বরেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথমে সোলায়মান খাঁর মারাত্মক যুদ্ধের মুখে আফগান বাহিনী পিছু হাটে। পরের বছর ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ মোহাম্মদ খান আবার সোলায়মান খানকে আক্রমণ করে এবং ভৈরবের নিকট পঞ্চবটি নামক স্থানে কিছুদিন যুদ্ধের পর আফগানরা পরাজয় এড়াতে সন্ধি করে। এর কিছুদিন পর সোলায়মান খান শক্তি বৃদ্ধি করে এবং

---

[৬৯] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁ; মসনদ ই আলা' প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

একে একে সন্ধি ভংগ করতে থাকে। ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দ আফগান সেনাপতি তাজ খান ও দরিয়া খানের বিশাল বাহিনী আশুগঞ্জের শিবির স্থাপন করেন। সোলায়মান খান বিচ্ছিনভাবে আফগানদের আস্তানাতে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। এতে তেমন ক্ষতি না করতে পেরে অবশেষে আফগান শিবির থেকে সন্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়। এতে সম্রাট আত্মসমর্পন করে সন্ধি স্বাক্ষর করেন।

আবুল ফজলের আকবরনামায় বিবরণ অনুযায়ী ধারণা করা যায় যে মোহাম্মদ খান সূর সোলায়মান খানকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আকবরনামায় বলা হয়েছে যে সেই নদীমাতৃক এলাকায় তিনি সৈন্যবাহিনী সহ সেই দেশে যান এবং অনেক যুদ্ধের পর তিনি (সোলায়মান খান) আত্মসমর্পন করেন। অল্প কিছুদিন পর তিনি আবার বিদ্রোহ করেন।[৭০]

উল্লেখিত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, বাংলার গভর্ণর সামসউদ্দিন মোহাম্মদ সুর সোলায়মান খানকে বশ্যতা স্বীকার করাতে ব্যর্থ হয়েছিল। সম্রাট ইসলাম শাহ সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বাংলার গভর্ণরের পক্ষে সোলায়মান খানকে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি তার দুই সেনাপতি তাজ খান ও দরিয়া খানকে সোলায়মান খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

যদুনাথ সরকারের মন্তব্য ছিল এরকম, সোলায়মান খানের রাজকীয় ঔদ্ধত্যের কারণে ইসলাম শাহ ক্রুদ্ধ হন। ফলে তাঁজখান ও দরিয়া খানকে সোলায়মান খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এ দু'জন সেনানায়ক সোলায়মান খানকে নদীমাতৃক এই ভূমিতে অনুসরণ করেন এবং কঠিন যুদ্ধের পর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু সোলায়মান খান বেশীদিন শান্ত থাকতে পারেননি। বাংলার প্রাচুর্য ও ইসলামী সংস্কৃতির উচ্চ আঙ্খার জন্ম দেয়। পরবর্তীতে তাজ খান ও দরিয়া খান বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলায় আসেন।[৭১]

এই ব্যাপারে আকবরনামায় বলা হয়েছে তাজখান ও দরিয়া খান সোলায়মান খানের বিরুদ্ধে একটি বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে এসেছিলেন। এতে বুঝা যায় সোলায়মান খান বাংলার পূর্বাঞ্চলে ভাটিররাজ্যে স্বাধীন শক্তিশালী জমিদার ছিলেন। হয়ত তারা অনুমান করেছিল সোলায়মান খানকে পরাজিত করলে তাদের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে। আর এজন্যই সোলায়মান খানের সমর্থনে একটি বিরাট বাহিনী সংগঠিত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে ঈসা খানের অধঃস্তন আমিনদাদ খান বলেছেন, সোলায়মান খান যখন শক্তি অর্জনে মনোনিবেশ করেন তখন তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন সৈয়দ ইবরাহিম মালেকুল উলামা

---

[৭০] যদুনাথ সরকার, হিস্টি অব আমল আনুমানিক-২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

[৭১] আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৬৬৭-৬৬৮

Dhaka University Institutional Repository

(র.)। কারণ তিনি তরফের অধিকর্তা ছিলেন। ঐ সময় তাদের সৈয়দ এই অঞ্চলের রাজা ও প্রশাসকগণ খুবই শ্রদ্ধার সাথে দেখতেন। ফলে সোলায়মান খানের সাহায্যের জন্য সকলেই এগিয়ে এসেছিলেন।[৭২]

একটি বিষয় আরো পরিস্কার করার প্রয়োজন। সোলায়মান খানের বিরুদ্ধে আফগানদের এই যুদ্ধগুলো কোথায় সংগঠিত হয়েছিল এ সম্পর্কে কোন নির্ভযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। জনশ্রুতি আছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ থানার পানিরশহর[৭৩] নামক স্থানে যেখানে মেঘনা নদীতে আফগান বাহিনীর বিশাল সমাবেশ হয়েছিল সোলায়মান খানের সাথে আফগানদের যুদ্ধ এর আশপাশ অঞ্চলেই সংগঠিত হয়েছিল।[৭৪]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আফগানদের সাথে সোলায়মান খানের সাথে সন্ধি করা হয়েছিল। এরিমধ্যে তাজখান ও দরিয়া খান এই মর্মে পরামর্শ করলেন যে বাংলার এই পূর্বাঞ্চলে একমাত্র সোলায়মান খানের জন্য তাদের রাজত্বের একচ্ছত্র অধিকার বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় সোলায়মান খান আফগান শিবিরে পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করে ফেলা হবে। এই মর্মে কিছু সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করা হল।[৭৫]

এখন আলোচনা প্রয়োজন সোলায়ামান খানের সাথে আফগানদের যুদ্ধে কি পরিণতি হয়। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেন, সোলায়মান খান বশ্যতা স্বীকার করে আবার বিদ্রোহ করেন। এরপর তাজ খান ও দরিয়া খান তাকে কৌশলে ডেকে এনে হত্যা করেন।[৭৬]

---

[৭২] নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ভল্যুম-৩৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

[৭৩] ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ থানায় পানির শহর নামক স্থানে মেঘনা নদীতে আফগান বাহিনী যে বিশাল সমাবেশ ঘটেছিল তাতে করেই স্থানটির নাম পানির শহর বিবতর্ন পানিশ্বর হয়েছে। সরাইল থেকে পানিশ্বরের দূরত্ব প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে।

[৭৪] সরাইলে সোলায়মান খানের অবস্থান কোথায় ২য় তার সঠিক কাব্য পাওয়া যায়নি। সরাইল উপজেলার পরিষদ অফিসের পশ্চিমে মোঘল যুগের একটি মসজিদ ও সমাধি সৌধের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এর পাশে আছে একটি পুকুর তার সংলগ্ন একটি বিশাল আয়তন উচ্চ ভূমিটি চতুর্দিকে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত যা আজও কালের স্বাক্ষি হয়ে অবস্থান করেছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী সোলায়মান খানের দূর্গনগরী ও প্রাসাদ ওই স্থানে ছিল বলে অনেকের ধারণা।

[৭৫] মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খা; মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[৭৬] আবুল ফজল, আকবরনামা, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৭

Dhaka University Institutional Repository

যদুনাথ সরকার বলেন, তাঁজখান ও দরিয়া খান বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবার বাংলায় আসেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে সাক্ষাৎকারের কথা বলে ডেকে এনে সোলায়মান খানকে হত্যা করেন।[৭৭]

প্রশ্ন যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম কানুন বিসর্জন দিয়ে সোলায়মান খানকে হত্যা করার তখন কী প্রয়োজন হয়েছিল? সম্ভবত সোলায়মান খান এমনি শক্তি সঞ্চয় করেছিল যার কারণে আফগানরা সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। তাদের জন্য বাংলায় আফগানদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যার কারণেই মনে হয় তারা বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নিয়েছিল এবং সোলায়মান খানকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে হোসেন শাহী সালতানাতের সর্বশেষ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

অবশেষে ঈসা খান-এর পিতা সোলায়মান খান (যিনি প্রথমে কালিদাস গজদানী ব্রাহ্মণ ছিলেন) সৈয়দবংশের শেষ শসক সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদের কন্যাকে বিবাহ করেন। বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ঈসা খানের অবদান তখনই আলোচনা করা যায় যখন পিতা সোলায়মান খান সৈয়দবংশের শেষ শাসক সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদের কন্যাকে বিয়ে করেছেন। নানা সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন মাহমুদের রক্তধারায় জাগরূক শক্তিতে বারবার অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন বাংলার স্বাধীনতা ও ইসলামী সংস্কৃতির রক্ষায় মসনদ-ই-আলা ঈসা খান। পরবর্তীতে প্রবাহিত হতে হতে শক্তিধারা রূপ নেয় জাতীয় চেতনার। অবশেষে বাংলাদেশী জাতীয় চেতনা, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন হওয়া ছিল অবধারিত।

---

[৭৭] যদুনাথ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীত অধ্যায়

পৃ. ৪১-৭২

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ঈসা খানের নাম, জন্ম, বাল্যকাল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) ঈসা খানের উত্থানকালীন সময় বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ) মোগলদের সাথে ঈসা খানের প্রথম যুদ্ধ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঘ) ঈসা খানের চট্টগ্রামে অজ্ঞাতবাস

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের নাম, জন্ম, বাল্যকাল ও উত্থান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঈসা খান একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম। বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঈসা খান নামটির সাথে আজও বীরত্বের পতাকা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে। ষোলশতকে দিল্লীর আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি বাংলাদেশে যে দূর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তা আমাদেরকে বিদেশী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে নিরাপোষ সংগ্রামের প্রেরণা যোগিয়ে এসেছে। মোঘল আগ্রাসন প্রতিহত করার লক্ষে ভাটির জমিদারগণকে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন তা আমাদের আজও অনুপ্রাণিত করে। জীবন চলার পথে শক্তি ও সাহস যোগায়।

বাংলার ইতিহাসে ষোড়শ শতকে আবির্ভূত বার ভূঞা নেতা ঈসা খান ভাটি এলাকার এক দু:সাহসী স্বাধীন ব্যক্তি ছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের পরে মোঘলদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি সম্মিলিত শক্তির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৭৮] এ অকুতোভয় বীরসেনানী মোঘল সম্রাট আকবরের ক্রমঅগ্রসরমান সামরিক অভিযানকে প্রতিহত করে বাংলার স্বাধীনসত্তা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হন।

ঈসা খানের জীবন এবং তাঁর সংগ্রামের ইতিহাস আজও বাংলার মানুষের মুখে মুখে ফেরে। আজীবন আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পাশাপাশি তিনি অভজ্ঞা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত বঙ্গের পূর্বাঞ্চলীয় নিম্নভূমি এলাকায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন, শিল্প, সাহিত্য ও তাহাযিব তথা মুসলিম ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে যত্নবান ছিলেন। তাঁর স্বীয় কৃতিত্ব শুধু বাংলার নয়, অখন্ড ভারতে মোঘল ইতিহাসের একটি অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ঈসা খানের উত্থান, রাজ্য বিস্তার, শাসন প্রণালী, যুদ্ধকৌশল, বিশেষ করে আকবরের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী সংগ্রামের ইতিহাস আকবরনামা, ময়মনসিংহের লোকসাহিত্য, পালাগান ও কাব্যগাঁথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।[৭৯]

ঈসা খানের জীবন ও অবদান সম্পর্কে লেখার আগে, একটি বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন তা'হলো তাঁর নাম লেখার বানান কি হবে। সঠিক বানান রীতি কোনটি হবে। নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

কামানে উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁর নাম "ইছা খাঁ"। পাশ্চাত্য পন্ডিতদের লেখা থেকে তাঁর নাম লেখা হয় ঈসা খাঁ। যীশুখ্রীষ্টের অন্য নাম ঈশা। ঈশা শব্দের অর্থ রাজা, ঈশ্বর, প্রভু। শ্রীবাচক ঈশা

---

[৭৮] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান "ইসা খাঁ : সমকালীন ইতিহাস" প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[৭৯] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, "ঈসা খান" প্রাগুক্ত, দ্র. মহা-পরিচালকের কথা

Dhaka University Institutional Repository

শব্দের এক অর্থ লাইলে দন্ড। ভাটি এলাকার ভূমি কর্ষণের মালিক বা লাঙ্গল দন্ডের রাজা ঈশা খাঁ সে অর্থে ভূঞা বা রাজা বা ভূমির মালিক বা জমিদার। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে তাঁকে ভাটির রাজা বলা হয়েছে।[৮০] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হতে তার জীবনী মূলক গ্রন্থে নামের বানান লিখেছেন ঈসা খান। ষোড়শ শতকের বাংলার বার ভূঞাদের নেতা ঈছা খাঁর নামের বানান এ পুস্তকে আধুনিক বাংলা বানানের অনুসরণে ঈসা খান লেখা হবে।

[৮০] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান, "ইসা খাঁঃ সমকালীন ইতিহাস", প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের জন্ম

ঈসা খানের প্রকৃত জন্ম তারিখের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। কেননা, সপ্তদশ শতাব্দিতে রচিত লোককাহিনী ভিত্তিক কাব্যগাঁথায় অথবা পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় ও দেশীয় ঐতিহাসিকদের বিবরণে ঈসা খানের জন্মস্থান, জন্ম ও বাল্য ইতিহাস প্রদত্ত হয়নি। ঈসা খানের জীবনের এই অজ্ঞাত অধ্যায়কে সুকৌশলে বাদ দিয়ে তাঁকে প্রথম থেকেই প্রথিতনামাভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঈসা খান সম্পর্কে বিভিন্ন লেখায় এমন সব কাল্পনিক বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হেয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্রপ্রহরী, মহাবীর মসনদ-ই-আলা ঈসা খানের গৌরব ঘোষণার জন্য বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ উপস্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করেছে মাত্র।[৮১]

উল্লেখ করার মত আরো একটি কারণ আলোচনা করা প্রয়োজন। আকবরনামায় বলা হয়েছে ঈসা খানের পিতা হত্যার পর ঈসা খান ও তার ভাই ইসমাইল খানকে আফগানরা তুরস্কের একদল বণিকের নিকট দাসরূপে বিক্রি করে দেয়।

আকবরনামার বিবরণটুকু ঈসা খানের অধঃস্তন পুরুষগণ যতদূর সম্ভব সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে পরবর্তীতে তাদের নির্দেশে রচিত পুস্তক সমূহে এ বিষয়ে আলোচিত হয়নি। যে কারণেই মনে হয় পরবর্তী লেখকগণ এমনকি ইউরোপীয় লেখকগণ ও জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান সাহেবদের রাজ্যশাসন, ব্যবহারিত দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে আকবরনামার উল্লেখিত বিবরণ বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হতে পারেননি। ফলে তারাও তাদের বর্ণনায় ঈসা খানের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি সুকৌশলে বর্জন করে তাদের বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। এটিরও কোন সঠিক মীমাংসাও হয়নি।

এ প্রসংগে ডঃ ননিলীকান্ত ভট্টাশালী উপরোক্ত বিষয়টির উপর অনুরোপ মতামত পেশ করে বলেন, মসনদ-ই-আলা ঈসা খান ঐ সময়ের একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় তাঁর অধঃস্তন পুরুষগণ এখনও বিদ্যমান। তাদের একজনও তাদের গৌরবরোজ্জ্বল পূর্বপুরুষের ইতিহাস উদ্ধার করতে তাঁরা কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেননি। ঐ উত্তরসরীরা ইতিহাসের নামেমাত্র 'মসনদ-ই-আলার' ইতিহাস নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, পুস্তিকায় প্রামাণ্য তথ্যভিত্তিক কোন বিবরণ উপস্থাপিত হয়নি। পুস্তিকাটি কিংবদন্তী ও গল্পের সমাহার মাত্র। অথচ ঈসা

---

[৮১] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁ: মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

খানের অদ্ভুত কুটনৈতিক প্রতিভা তার স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার জন্য আজীবন সংগ্রামের স্পৃহা ঐ সমস্ত লেখায় শোচনীয়ভাবে বিকৃত হয়েছে।[৮২] যদিও তাঁর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর কূটনৈতিক প্রতিভার প্রভাবে বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল।

এ অবস্থায় ঈসা খানের প্রকৃত ইতিহাস রচনার স্বার্থে এবং তার জন্ম ও বাল্যকালের সঠিক ও তথ্যভিত্তিক বিবরণ উপস্থাপনের জন্যে প্রকৃত ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সূত্র ধরেই অগ্রসর হতে হবে।

ড. আব্দুল করিম বলেন, ঈসা খানের জন্ম তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তথ্যভিত্তিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিধারণ করা প্রয়োজন ঈসা খান কখন জন্ম গ্রহণ করেন। বিষয়টির উপর যদিও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি তবুও আলোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য আনুমানিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করা হবে।

প্রফেসর ডঃ আব্দুল করিমের মতে, সম্রাট শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহ ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। এরপর ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খানের সাথে ইসলাম শাহের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫৪৬ বা ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে ইসলাম শাহের সেনানায়ক তাজখান ও দরিয়া খান সোলায়মান খানকে ডেকে এনে হত্যা করার সময় ঈসা খান ও তার ভাই ঈসমাইল খানের বয়স ছিল ৮ বা ১০ বছর। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে প্রফেসর আব্দুল করিম বলেন, ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ অথবা ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ ঈসা খানের জন্ম সন তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব।[৮৩] ডঃ আব্দুল করিম তার অন্য একটি গ্রন্থে বলেন, "ঈসা খানের সঠিক জন্ম তারিখ পাওয়া না গেলেও ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, তিনি ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ অথবা ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ জন্ম গ্রহণ করেন।[৮৪]

আরো পরিস্কার করতে আবুল ফজলের বর্ণনাটি উপস্থাপন করা যায়। তিনি বলেন, "আফগান সেনাপতি তাজ খান ও দরিয়া খান সোলায়মান খানকে হত্যা করে তার দুই শিশু পুত্র ঈসা খান ও ইসমাইল খানকে তুরস্কের একদল বণিকের নিকট বিক্রি করে দেয়।[৮৫]

উপরোক্ত আলোচনাতে একটি বিষয়ে পৃথক আলোচনার দাবীদার তা হলো শিশু ঈসা খান ও ইসমাইল খানকে দাসরূপে বিক্রয় করে দেওয়ার বিষয়, যা নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

---

[৮২] ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ভল্যুম-৩৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৮৩] ড. আব্দুল করিম, ঈসা খাঁ, (পুস্তিকা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[৮৪] ড. আবদুল করিম, বাংলাদেশে মোঘল শাসন, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৪৯

[৮৫] আবুল ফজল আকবরনামা, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ইতোপূর্বেই সোলায়মান খান সম্পর্কে আলোচনায় এ বিষয়টি মীমাংসায় পৌছি সোলায়মান খান সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ দিকে। পরবর্তী সময়ে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে শেরশাহ কর্তৃক গৌড় অবরোধের পূর্বেই সালতানাতের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকা সরাইল পরগনার জায়গীর প্রাপ্ত হন এবং সেখানেই ঈসা খান জন্ম গ্রহণ করেন।

অতএব ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে সোলায়মান খানের হত্যার সময় ডঃ আব্দুল করিমের বর্ণনা অনুযায়ী যদি ঈসা খানের বয়স ১০ বছর হয় তাহলে অবশ্যই ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খানের জন্ম হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতারাং বলা যায় ঈসা খান মসনদ-ই-আলা ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ জন্মগ্রহণ করেন।

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খান ভাটি অঞ্চলের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ সম্রাট শেরশাহের মৃত্যু পর্যন্ত সোলায়মান খান তার রাজত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে শেরশাহের অনুগত্য স্বীকার করেছিলেন কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তবে সে সময় তিনি শান্তিপুর্ণভাবে সরাইলে অবস্থান করেছিলেন এটা অবশ্যই বলা যায়।[৮৬]

সোলায়মান খানের হত্যাকান্ডের পর ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দ ১০ বছর বয়সে ঈসা খানের ভাগ্যে কি ঘটেছিল?

বিষয়টির উত্তরে আলোচনা করার প্রয়োজন। আবুল ফজল এর আকবরনামায় বিবৃত ঈসা খান ও তাঁর ভাই ইসমাইল খান তুরস্কের একদল বণিকের নিকট দাসরূপে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আল্লামা আবুল ফজলের বর্ণনাটিকে পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন যে, ঈসা খান ও ইসমাইল খানকে আদৌ তুরস্কের কোন বণিকের নিকট বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল কিনা। তবে সমসাময়িক কালের ঘটনাবলী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাবলীর বিশ্লেষণের মধ্যেমে এ বিষয়টির যথার্থতা সম্ভব হতে পারে।

এ প্রসংগে মোহাম্মদ মতিউর রহমান, 'দেওয়ান ঈসাখাঁ, নামক পুস্ত্মকে ফারসী ভাষায় লিখা আকবরনামায় বলা হয়েছে, অচিরেই বিহারের শাসনকর্তা তাজখাঁ ও শেরশাহের সেনানায়ক দরিয়া খাঁ তাকে দমন করতে বঙ্গে আগমন করলেন। যুদ্ধে সোলায়মান খান নিহত ও তার দুই পুত্র ঈসা খান ও ইসমাইল খান বন্দী হয়ে বণিকদের নিকট দাসরূপে বিক্রি হলেন। ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ নওয়াব তাজখাঁ পন্নি বঙ্গবিহারে স্বাধীন রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। বহুদিনের অরাজকতা ও বিপ্লবের পর দেশে শান্তি র সুবাতাস প্রবাহিত হল। এই সময় নিহত দেওয়ান সোলায়মান খানের ভ্রাতা কুতুব খান নওয়াব

[৮৬] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁ: মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

তাজ খাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হয়ে রাজকার্যে নিযুক্ত হন। কুতুবখান তার ভ্রাতৃষ্পুত্রদ্বয়ের জন্য অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন ছিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর সুদূর তুরান দেশের কোন ধনাঢ্য গৃহে তাদের সন্ধানপ্রাপ্ত হয়ে প্রচুর অর্থ প্রদান পূর্বক তিনি ভ্রাতৃষ্পুত্রদ্বয়কে তথা হতে মুক্ত করেন [৮৭]

উল্লেখিত আলোচনায় দেখা যায় যে, ঈসা খান ১৬ বছর (১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) তুরস্কে অবস্থান করেছিলেন। ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ তাঁর চাচা কুতুব খান তাদেরকে তুরস্ক থেকে মুক্ত করে আনেন। এখানে একটি কথা স্পষ্ট যে, ঈসা খানের বিক্রি হওয়ার সময় তার চাচা কুতুব খান নিরাপদেই ছিলেন এবং এটাও পরিস্কার যে, তিনি তখন বাংলাদেশেই অবস্থান করছিলেন।

আরেকটি বিষয় পরিস্কার হওয়ার দরকার তাহলো, তখন ঈসা খানের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কি পরিণতি হয়েছিল। পূর্বেই লক্ষ্য করা হয়েছে, তার চাচা কুতুব খান নিরাপদেই ছিলেন। তার মা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অন্য কারও বন্দী অথবা নিহত হওয়ার বিষয় লিপিবদ্ধ হয়নি।

যে কোন যুদ্ধে গমনের পূর্বে রাজকীয় নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয় স্বজন, অমাত্যবর্গ, কে কোথায় কীভাবে অবস্থান করবে সব কিছুই নির্দিষ্ট করে দেয়া হত। আবার কোন কোন সময় পরিবারের লোকজনদেরকে সঙ্গে নিয়েও যুদ্ধ যাত্রার নিয়ম ছিল। যদি সোলায়মান খান তার পরিবারবর্গকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করে থাকেন তাহলে তার পরিবারের সকলেই তো বন্দী হবার কথা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ঈসা খান ও ইসমাইল খান ছাড়া আর কারও বন্দী হবার কথা জানা যায় না।

একটি কথা বলার অবকাশ থাকে যে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের মধ্যে ঈসা খানের পিতাকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ডেকে এনে হত্যা করা হয়েছিল। একই কারণেই দুই পুত্র ঈসা খান ও ইসমাইল খানকে তুরস্কে বিক্রয় করা হয়। যুদ্ধের বন্দীর নিয়ম মানা হয়নি।

অন্যদিকে আফগানদের সাথে সোলায়মান খানের যে সকল যুদ্ধ হয়েছিল ঐ যুদ্ধ ক্ষেত্রগুলো অবস্থান যদি র্নিণয় করা যায় তাহলে দেখা যায় যে, সোলায়মান খানের আবাস্থল থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্রগুলো ৫ থেকে ১০ মাইলের মধ্যে ছিল।

এমতাবস্থায় যুদ্ধকালীন সময়ে তার পরিবার পরিজন অবশ্যই প্রাসাদবাটিতে অবস্থান করেছিলেন এতে সন্দেহ নাই। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সোলায়মান খানের হত্যার পর তার পরিবার পরিজন অবশ্যই কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।[৮৮]

---

[৮৭] মোহাম্মদ মতিউর রহমান, দেওয়ান ঈসা খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৮৮] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁ: মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোলায়মান খানের নিহতের সময় "আকবরনামার" লেখক আবুল ফজল জন্ম গ্রহণ করেননি। আবুল ফজল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারী।[৮৯] সোলায়মান খানের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রায় চল্লিশ বছর পর আবুল ফজল আকবরনামা রচনা শুরু করেন। ঐ সময় ঈসা খান ছিলেন সম্রাট আকবরের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বি। অন্যদিকে আবুল ফজল ছিলেন সম্রাট আকবরের মন্ত্রী ও বন্ধু। ফলে বিষয়টি স্পষ্ট যে, আবুল ফজল কোন বর্ণনাকারীর পদও বিরবণ অনুযায়ী তার গ্রন্থে বিষয়টি ঐ ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

এই প্রসংগে মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহানের লেখাটি "ঈসা খান" নামক গ্রন্থে বিষয়টি চমৎকারভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তা'হলো-আবুল ফজল যদি কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে ঈসা খান ও ইসমাইল খানের দাস হিসেবে বিক্রির ঘটনাটির উল্লেখ করে থাকেন, তাহলেও তিনটি কারণে বক্তব্যটি আমাদের জন্য গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য। প্রথমত, দাসপ্রথা তখন মুসলমানদের মধ্যে চালু ছিল না। ভৈবারিজ যেমনটি বলেছিলেন, ঈসা খানের পিতা যদিও হিন্দু ছিলেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় কোন মুসলমানকে মুসলমান কর্তৃক দাসরূপে বিক্রি করার কোন আইন তখন ছিল না। দ্বিতীয়ত, সোলায়মান খান নিহত হবার সময় তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য নিরাপদেই ছিলেন। কারণ আবুল ফজল ঐ সময় সোলায়মান খানের পরিবারের অন্য কারোর হত্যা অথবা নিহত হবার কথা বলেননি। তৃতীয়ত, তখনকার দিনে যুদ্ধের নিয়ম কানুন পর্যালোচনা করলেও ঈসা খানের দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। রাজকীয় নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধে গমনের পূর্বে শাহী পরিবারের সদস্যবৃন্দ, অমাত্যবর্গ কোথায় কীভাবে অবস্থান করবে সব কিছুই নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়েও যুদ্ধযাত্রার বিষয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিরবণে দেখা যায়। তবে সাধারণত দূরবর্তী স্থানে সংঘটিত যুদ্ধ ক্ষেত্রেই পরিবার পরিজনকে সাথে করে নেয়া হতো। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সোলায়মান খানের সাথে আফগানদের যুদ্ধ সোলায়মান খানের অবস্থান ৩ থেকে ৭ মাইলের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। তাই পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে সোলায়মান খানের যুদ্ধে গমন করবেন এটা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। আবুল ফজলের বর্ণনা অনুযায়ী তাজ খান ও দরিয়া খান সোলায়মান খানকে আলোচনার জন্য ডেকে এসেছিলেন, যুদ্ধের জন্য নয়। এমতাবস্থায় সোলায়মান খান শিশু পুত্রদের সাথে নিয়ে আফগান শিবিরে কেন যাবেন তাও আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

অতএব, সোলায়মান খান নিহত হবার সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্য অবশ্যই প্রাসাদ বাটিতে অবস্থান করছিল বলে অনুমান করা যায়। এছাড়াও আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে এই

[৮৯] আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, (অনুবাদ) বাংলা একাডেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টিও স্পষ্ট বা ঐ সময় ঈসা খানের চাচা কুতুব খানও নিরাপদে ছিলেন। অতএব আমরা এই ধারণা করতে পারি যে, ঈসা খান ও তার ভাই ইসমাইল খান তুরস্কের বণিকদের নিকট দাসরূপে বিক্রি হননি।[৯০]

এ প্রসংগে মোশাররফ সাহেব আরো কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছেন, তা'হলো, ঈসা খান ও তার ভাই ইসমাইল খানের ভাগ্যে কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যে লালিত কিছু বক্তব্য । ঈসা খানের বর্তমান বংশধর জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান আমিন দাদ খানের কাছে এ প্রসংগে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, "আফগান সেনানায়কদের হাতে ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খান নিহত হয়েছিলেন এই বিষয়টি সত্য। কিন্তু ঈসা খানকে তুরস্কের কোন বণিকের নিকট দাসরূপে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল এই বক্তব্যটি সঠিক নয়। কারণ ঐ সময় সোলায়মান খানের স্বাধীন রাজ্যের পূর্ব দিকেই ছিল তরফ রাজ্য। সোলায়মান খানের ভাগ্যের এই বিপর্যয়ে তার পরিবারের সকল সদস্যই তরফ রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কেননা তাদের অধিকর্তা হযরত সৈয়দ ইব্রাহিম মালেকুল উলামা (র.) ছিলেন ঈসা খানের খালু। আর এই আত্মীয়তার কারণেই ঈসা খান শৈশব থেকে সতের বছর পর্যন্ত তরফ রাজ্যে হযরত সৈয়দ ইব্রাহিম মালেকুল উলামা (র.)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, পারিবারিকভাবে আমরা এই বিবরণটি লালন করে আসছি।'[৯১] ঈসা খান সম্পর্কে এ পারিবারিক তথ্যের সমর্থনে আর কোন ঐতিহাসিক দলিল আমাদের জানা নেই। তবে অন্যান্য প্রচলিত ধারণার তুলনায় পরিবারিক এই বক্তব্যটি অনেক সঙ্গতিপূর্ণ এবং যুক্তিসঙ্গত মনে হওয়ায় আমরা তথ্যটি সঠিক বলে ধরে নিতে পারি। সুতারাং সোলায়মান খান নিহত হবার সময় তার পুত্রদ্বয় নিরাপদ আশ্রয়েই ছিল। তুরস্কের বণিকদের নিকট বিক্রি হয়নি।

এছাড়াও এও হতে পারে যে, আবুল ফজল যখন ইতিহাস লেখেন তখন ঈসা খানের সাথে আকবরের যুদ্ধ চলায়, আকবরের মন্ত্রী ও বন্ধু হওয়ার কারণে অথবা এই সময় তিনি সোলায়মান খানের সন্তানদের অবস্থান জানতে চেষ্টা করে এই তথ্য পেয়েছেন অথবা সঠিক তথ্য তিনি পাননি। যে তথ্য পেয়েছেন সেটিই তিনি গ্রন্থে লিখেছেন। যা সঠিক ছিল না।

এ প্রসংগে ড. এম আবুল কাদের বলেন, পিতা হত্যার পর ঈসা খানকে এবং তার ভাই ইসমাইল খানকে নাকি তুরানী সওদাগরদের নিকট বিক্রি করা হয়। পরে তার চাচা কুতুব খান ক্ষমতাশালী হয়ে অনেক অনুসন্ধানের পর তাদেরকে ছাড়িয়ে আনেন। কিন্তু তুরান ঘরের কাছে নয়

[৯০] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

[৯১] গবেষক ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ মার্চ মাসে জঙ্গলবাড়ির দেওয়ান আমিন দাদ খানের নিকট থেকে এই তথ্যটি সংগ্রহ করেন। মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান" ঈসা খান, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

এবং মুসলমান রাজ্যে কোন মুসলমানকে দাসরূপে বিক্রি করার আইন নেই। কাজেই এ বক্তব্য ভিত্তিহীন।[৯২]

বিষয়টির উপর ডঃ ননিলীকান্ত ভট্টাশালী কোন মন্তব্যই করেননি। আর যেহেতু ডঃ এম, আবুল কাদের দৃঢ়তার অভাব আছে, সুতারাং ধরে নিব প্রথমটিই সঠিক।

সম্ভবতই সেই কারণে ঈসা খান যখন ক্ষমতা ও সুযোগ পেয়েছেন তখনই নিজেকে প্রমাণ করেছেন। আর যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সময়টুকু হযরত সৈয়দ মালেকুল উলামার (র.)-এর তত্ত্বাবধানে তাঁর আদর্শে লালিত পালিত হয়েছিল। সেই কারণেই পরবর্তীতে বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে এই জাগরণেই প্রেরণা হয়ে সাহায্য করেছিল।

[৯২] ডঃ এম আবদুল কাদের, সুবর্ণ গ্রামের ঈসা খাঁ (প্রবন্ধ), দৈনিক সংগ্রাম ২২শে অগ্রহায়ন, ১৩৯৭ বাংলা সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের বাল্যকাল ও উত্থান

এখন আমরা ঈসা খানের বাল্যকাল সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস জানার চেষ্টা করব। বয়ো:প্রাপ্ত হওয়ার পর ঈসা খান কি করেছেন সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। ডঃ দীনেস চন্দ্রসেন বলেছেন,"জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের ইতিহাস গ্রন্থে অথবা কাব্যগাঁথার ইতিহাসে ঈসা খানের বাল্যকালের ইতিহাস দেয়া হয় নি। সমস্ত বিবরণেই ঈসা খান সোলায়মান কররানীর মৃত্যুর পর প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটদ্রোহী বীরাগ্রগণ্য রূপেই আমাদের নিকট উপস্থিত আছেন।"[৯৩] ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়, মিঃ ষ্টেপেলটন সপ্তদশ শতাব্দির সাতটি কামান সম্বন্ধে সমালোচনা শীর্ষক প্রবন্ধে দেওয়ান বংশ ও তাদের পূর্ব পরিচয় বিষয়ে কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রশ্নের বিচার করেছেন। ঐ প্রবন্ধেও মিঃ ষ্টেপেলটন ঈসা খানের বাল্যকাল বিষয়টির কোন সমাধান করেননি। ঐতিহাসিকদের মতে, আকবরনামায় প্রদত্ত বিবরণ সমূহ প্রামাণ্য তথ্যভিত্তিক এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এক্ষেত্রে ঈসা খান মসনদ-ই-আলা সম্পর্কে আবুল ফজলের সমগ্র বিবরণই তথ্যভিত্তিক হতে পারে কিনা তা লেখার সময়, ভাব, বিষয় উদ্দেশ্য ভেবে দেখার অবশ্যই অবকাশ রয়েছে।

এ প্রসংগে জনশ্রুতি, লোককাহিনী ও কিংবদন্তী অনুযায়ী যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে, আফগান সেনাপতি তাজ খান ও দরিয়া খান সোলায়মান খানকে হত্যার পর সোলায়মান খানের পরিবারবর্গসহ তাঁর পুত্র ঈসা খান ও ইসমাইল খান কুতুব খানের তত্ত্বাবধানে তরফের অধিকর্তা সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালা (র.)-এর অধঃস্তন পুরুষ সৈয়দ ইবরাহিম মালেকুল-উলমা (র.)-এর নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হন। দীর্ঘ ১৭ বছর পর্যন্ত ঈসা খান তরফ রাজ্যেই লালিত পালিত হয়েছিলেন।

যেহেতু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সৈয়দ ইব্রাহিম মালিকুল-উলামা (র.) ছিলেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের জ্যেষ্ঠ কন্যার জামাতা এবং ঈসা খানের খালু। সোলায়মান খানের হত্যার পর তার পরিবার পরিজন মালেকুল-উলামা (র.)-এর রাজ্যে আশ্রয় নেবার বিষয়টি অধিকতর গ্রহণ যোগ্য। জনশ্রুতি আছে যে, ঈসা খানের বয়স যখন ১৭ বছর তখন তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের সেনাপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তবে ঈসা খানের কিশোর জীবনের একটি গুরুত্বপুর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন হযরত নগরের দেওয়ান সাত্তার দাদ খান। তিনি বলেন, ঈসা খান সরাইলে তাঁর পিতার পরিত্যাজ্য জমিদারী ফিরে পাবার পূর্বে তরফ রাজ্যের সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন

[৯৩] ড. দ্বীনেশ চন্দ্র সেন, পূর্ববঙ্গ গীতিকা. পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন এবং তৎকালীন তরফের অধিকর্তা সৈয়দ ইব্রাহিম মালেকুল-উলামা (র.)-এর কন্যা সৈয়দা ফাতেমা খাতুনকে তিনি বিয়ে করেছিলেন।[৯৪]

এই বক্তব্যের সমর্থনে আর কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া না গেলেও এটি স্বভাবিক ছিল যে, পিতা হত্যার পর তরফরাজ্যে খালুর কাছে লালিত পালিত ও তাঁর আদর্শে গড়ে উঠার কারণেই সৈয়দ ইব্রাহিম মালেকুল-উলামা (র.)-এর শেষ কন্যা সৈয়দ ফাতেমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, ঈসা খান কিছুকালের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন এবং তিনি রাজা অমরমানিক্যের তুষ্টি সাধনের নানাবিধ প্রয়াস পেতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৯৫]

এখানে একটি প্রশ্ন? ঈসা খান মোট কতকাল ত্রিপুরা রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন এ বিষয়ে দ্বীনেশচন্দ্র সেন কোন ধারণা দিতে পারেন নি। অন্যদিকে ত্রিপুরার রাজ্য শাসন ব্যবস্থার প্রামাণিক এবং গ্রহণযোগ্য ইতিহাস "রাজমালা" গ্রন্থে ঈসা খানের ত্রিপুরা রাজ্যের সেনাপতির দায়িত্ব পালনের বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করা হয়নি। "রাজমালায়" ঈসা খান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দের পর যখন তিনি ভাটিরাজ্যের অধিপতি হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখানে নির্দিষ্ট কোন সময়ের কথা বলা হয়নি।

আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত রাজা বিজয়মানিক্য থেকে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখব যে তিনি ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দ বিজয় মানিক্য মৃত্যুবরণ করেন। এরপর পুত্র অনন্তমানিক্য পরে ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ অনন্তের শশুর এবং অভিভাবক গোপনে অনন্তকে হত্যা করে উদয়মানিক্য উপাধি নিয়ে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ উদয়মানিক্য মৃত্যুবরণ করেন। ১৫৪০ থেকে ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'রাজমালা' গ্রন্থে কোথায় ঈসা খান ত্রিপুরা রাজ্যের সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকলে অবশ্যই এ সম্পর্কে আলোচনা থাকত। তবে রাজমালা ঈসা খানের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এমতাবস্থায় বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তাহলে ঈসা খান কিভাবে তাঁর পিতার ভাটিরাজ্যে ক্ষমতাসীন হলেন। বাংলার এ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে বিহারের শাসনকর্তা সুলতান তাজখান কররানী বাংলা অধিকার করার মনস্থ

[৯৪] হয়বত নগরের শেষ জমিদার দেওয়ান মান্নান দাদ খানের পুত্র দেওয়ান ছাত্তার দাদ খান ১৯৮৯ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে এই তথ্যটি প্রদান করেন। বি, দ্র, মোশাররফ হোসেন শাহাজান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭-৩৮

[৯৫] ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, পূর্ব বঙ্গ গীতিকা, ২য় খন্ড, ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

করেন। এ পর্যায়ে তিনি বাংলার অভিজাত পরিবার সমূহের সাথে এবং যে সমস্ত এলাকায় আফগানরা ক্ষমতাশালীন ছিলেন তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এ সময় ঈসা খানের চাচার কুতুব খান সুলতান তাজখান কররানীর সাথে সাক্ষাত করে বাংলার সিংহাসনের আরোহনের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। কুতুব খান ইতোমধ্যেই বাংলার বার ভূঞাদের পক্ষ থেকে তাজখান কররানীর প্রতি সমর্থনের বিষয়টি মীমাংসা করেন। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাজখান সুলতান গিয়াস উদ্দিনকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। 'আকবরনামায়' প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী ঐ সময় ঈসা খানের চাচা কুতুব খান তাজখান কররানীর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন এবং উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। কুতুব খান সুলতান তাজখানের নিকট এই মর্মে আবেদন পেশ করেন যে, বাংলার মহামান্য সুলতান যদি সোলায়মান খানের সরাইল পরগনার জায়গীর তার পুত্র ঈসা খানকে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদান করেন তা'হলে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করবে এবং সুলতানের প্রতি সর্বাস্থায় অনুগত থাকবে। সুলতান তাজখান কুতুব খানের এই আবেদন অনুমোদন করে এবং ঈসা খান সরাইল পরগনার জায়গীর প্রদান করেন। তাজখান কররানী কর্তৃক তার পিতার জমিদারী প্রাপ্তির পর পরই বিপুল ক্ষিপ্ততার সাথে ক্ষমতা এবং খ্যাতির শীর্ষবিন্দুতে আরোহন করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিমান বার ভূঞাদের অর্ন্তভূক্ত হন এবং বাংলার স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের নেতা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৭৫ খ্রিস্টাবদ পর্যন্ত এই দশ বছর সময়ে ঈসা খানের প্রকৃত বিবরণ অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। কারণ ঐ সময়কালের কোন তথ্যভিত্তিক বিবরণ ঐতিহাসিকরা উপস্থাপন করতে পারেননি। লোককাহিনী, কিংবদন্তী এবং জনশ্রুতিতেই এ সময়কালের মধ্যে ঈসা খানের সংগ্রামী জীবনের কোন দলিল সংরক্ষিত হয়নি।[৯৬]

ঈসা খান প্রথমে তার পৈত্রিক জায়গীর সরাইলে তার নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন? তবে কীভাবে তা করেন, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ঐতিহহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবু আমরা চেষ্টা করব বিষয়টি আরো পরিস্কার করতে।

এ প্রসংগে আকবরনামায় বলা হয়েছে, ঈসা খানের চাচা কুতুব খান সম্রাট সেলিম শাহের মৃতুর পর তাজখান কররানী যখন বাংলার মসনদে বসেন তখন তিনি প্রাধান্য লাভ করেন। ঐ সময় কুতুব খান তাজখান কররানীর অধীনে উচ্চপদে চাকুরিতে প্রবেশ করে যথেষ্ঠ সুনাম ও অর্জন

---

[৯৬] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খা: মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[৯৭] সম্ভবত ঐ সময় কুতুব খানকে তার পৈত্রিক জমিদারী ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সুলতান তাজখান কররানীকে অনুরোধ করেছিলেন।

তবে ঈসা খান কবে সরাইলে জায়গীর লাভ করেন, সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায়।

আবুল ফজল বললেন, তাজখান কররানী যখন বাংলার সিংহাসনে বসেন তখন ঈসা খান তাঁর পিতার পরিত্যাজ্য জায়গীর ফিরে পেয়েছিলেন।[৯৮]

তাজখান কররানী বাংলার সিংহাসনে বসেন ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে। নলিনীকান্ত ভট্টাশালীও মনে করেন ঈসা খান তাঁর পৈত্রিক জায়গীর ফিরে পেয়েছিলেন ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ অথবা ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে।[৯৯] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁ: মসনদ-ই-আলা, গ্রন্থে ঈসা খানের পিতার জায়গীর পাওয়ার তারিখ বলেন ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ।

সুলতান তাঁজখান কররানী ঈসা খানের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শনের কারণ সম্পর্কে বলা যায় যে, ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দ অথবা ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দ দিকে যুদ্ধের যাবতীয় নিয়মকানুন ভঙ্গ করে তাজখান কররানী ঈসা খানের পিতার সোলায়মান খানকে হত্যা করে। সম্ভবত পরবর্তী সময় তাজখান কররানী ঐ নৃশংসতায় অনুতপ্ত হয়ে কুতুব খানের অনুরোধে ঈসা খানের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য দেখান। বিবিধ বিবরণী থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে, ঈসা খান ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাঁর চাচা কুতুব খানের সহায়তায় এবং তৎকালীন বাংলার সুলতান তাজখান কররানীর অনুগ্রহে তার পিতার পরিত্যক্ত জমিদারী ফিরে পেয়েছিলেন। আর সেই সাথে ঈসা খান বিশেষ খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। এই বিষয়টি আকবরনামায় স্বীকার করা হয়েছে। আবুল ফজল বলেন, বিচক্ষণতা ও ন্যায়বিচারের দ্বারা ঈসা খান অচিরেই সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বাংলার শাসকদের অনুগত ছিলেন। বিচক্ষণতা ও সতর্কতার জন্য বাংলার শাসকদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন না। দূরে থেকে নম্র ভাষা ব্যবহার করতেন।[১০০]

---

[৯৭] আবুল ফজল, আকবরনামা, ৩য় খন্ড, ফারসি থেকে অনুদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৮

[৯৮] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৮

[৯৯] নলিনীকান্ত ভট্টাশালী, বেঙ্গল পাষ্টল এন্ড প্রেজেট-ভ্যলুম-৩৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[১০০] আবুল ফজল, আকবরনামা, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৮

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে ঈসা খান জন্ম গ্রহণ করেন ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে পিতা সোলায়মান খানের হত্যার পর আকবরনামার বিবরণ অনুযায়ী তুরস্কের বণিকদের নিকট বিক্রি করে দেয়া হয়। চাচা কুতুব খান ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ বা ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ দিকে অনেক অর্থের বিনিময়ে ফেরত আনেন যা গ্রহণযোগ্য। অন্যদিকে তার অধঃস্তন পুরুষদের মত অনুযায়ী তিনি তাঁর খালু তরফরাজ্যে লালিত পালিত হন এবং ১৭ বছর বয়সে তরফরাজ্যে সেনাপতি ছিলেন। ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দের দিকে তাঁর চাচা কুতুব খানের সহায়তায় বাংলার সুলতান তাজখান কররানীর নিকট থেকে পিতার পরিত্যক্ত জমিদারী ফিরে পান। যুক্তিসংগত কারণে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হন। এটি যুক্তিযুক্ত কারণে গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণ করার মত।

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের সমসাময়িক বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে সুলতান তাজখান কররানী ঈসা খানকে সরাইলে তার পৈত্রিক জমিদারী ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তবে আলাচনার বিষয়টি হলো ঐ সময় বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন ছিল। আলোচনার প্রেক্ষিতে বিষয়টি স্পষ্ট হবে যে, ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে সম্রাট আকবরের সেনানায়কদের সাথে ঈসা খান কীভাবে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

বাংলার কররানীর বংশের শাসনের শুরু থেকেই ঈসা খানের উত্থান শুরু হয়েছে। তাজখান কররানীর রাজত্বকাল ছিল মাত্র এক বছর। এরপর তার ভাই সোলায়মান খান কররানী বাংলা মসনদে বসেন। ঐ দিকে সম্রাট আকরব মোঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে শুরু করেন। ফলে দিল্লী, আগ্রা ছাড়াও ভারতীয় উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের আফগানরা ক্রমান্বয়ে বাংলার দিকে চলে আসতে থাকে। আর সেই অনুপাতে আফগান শক্তির ধারক ও বাহক হতে থাকেন সোলায়মান খান কররানী। তার সামরিকশক্তি মোটেও কম ছিল না। এই সময় তিনি বিভিন্ন রাজ্যও জয় করেছিলেন তার শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।

সোলায়মান খান কররানীর রাজ্য শাসনের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এই যে, তিনি একজন বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। সম্রাট আকবরের সাথে সংঘর্ষে জড়ানোর মত কোন কর্ম থেকে বিরত ছিলেন। সম্ভবত এ জন্যই ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ পযর্ন্ত সম্রাট আকবর বাংলা বিজয়ের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর বাংলার এই কৃতি শাসক মৃত্যু বরন করেন।[১০১]

এ সময় সম্ভবত ঈসা খান সরাইলে পরগনার জমিদার হিসেবে সোলায়মান খান কররানীর আনুগত্য স্বীকার করে প্রভূত শক্তি সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। ১৫৬৫ থেকে ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসে এই সাত বছর সময়কালের মধ্যে কোন বিদ্রোহ অথবা সোলায়মান খান কররানীর বিরুদ্ধাচারণ করার বিবরণ পাওয়া যায় নি।[১০২]

১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে সোলায়মান খান কররানীর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়জীদ খান কররানী বাংলার মসনদে আরোহন করেন। কিন্তু কিছুদিন ব্যবধানে তিনি নিহত হন। এরপর বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন সোলায়মান খান কররানীর কনিষ্ঠ পুত্র বাংলার সর্বশেষ আফগান সুলতান দাউদ খান কররানী।

---

[১০১] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪০

[১০২] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁ:মসনদে-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

দাউদ খান কররানী ছিলেন বয়সে তরুণ। বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি তখনও গড়ে উঠতে পারেননি। দরবারের অমাত্যবর্গ এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে ক্রমাগত দুর্ব্যবহারের জন্য বেশীরভাগ অমাত্য ও আত্মীয় স্বজন তার আক্রোশে পরিণত হয়। রাজত্বের প্রথম দিকেই শুরু হয় এক সর্বনাশা বিশৃঙ্খলা ও মত বিরোধ। তিনি তার পিতা সোলায়মান খান কররানী আমলের প্রধান উজির লোদীখানের জামাতা ইউসুফকে হত্যা করে লোদীখানের বিরাগভাজন হন। এছাড়াও ফতলু খান এবং ওজর খান প্রমুখ স্বার্থান্বেষী আফগান আমীরের পরামর্শে কাজ করে দাউদখান কররানী নিজেকে বিপদাপন্ন করে তুলেন[১০৩] এবং বাংলার সালতানাতের পতন ডেকে আনেন।

অন্যদিকে বাংলা যখন সর্বনাশা বিশৃঙ্খলা ও মতবিরোধে জর্জরিত ঠিক এই সুযোগে সম্রাট আকবর সেনাপতি মুমিন খান,খান-ই জাহানকে বাংলা এবং বিহার আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। মুমিন খান চুনার থেকে পাঠনার দিকে অগ্রসর হন এবং বাংলা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই সংবাদ পেয়ে দাউদ খান কররানী তার প্রধান আমীর লোদীখান আফগানকে মোঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। পাঠনায় উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হয়। অবশেষে উভয় দল সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের পর স্ব-স্ব এলাকায় ফিরে যায়। কিন্তু সম্রাট আকবর এই চুক্তি অনুমোদন করতে অসম্মত হন এবং রাজা তোডরমলকে বাংলার প্রশাসক পদে নিযুক্ত করেন। খান-ই-জাহানের বাহিনী থেকে সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যদের আলাদা করে তোডরমলের নেতৃত্বে দাউদখান কররানীকে শাস্তি দেয়ার জন্য অগ্রসর হবার আদেশ দেয়া হয়।[১০৪] সেই প্রেক্ষিতে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মার্চ 'তুকারা' নামক স্থানে মোঘলদের সাথে দাউদখান কররানীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এই যুদ্ধ "মোঘলমারীয়" যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধে দাউদখান কররানী পরাজিত হয়ে সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং মোঘল সামন্ত হিসেবে উড়িষ্যা শাসন করার ক্ষমতা লাভ করেন। ইতিহাসে এই চুক্তি "ফটকের" চুক্তি নামে খ্যাত।

দাউদ খান কররানী ফটকের চুক্তি অনুযায়ী সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেও আফগানদের মধ্যে এবং বার ভূঞাদের অনেকেই এই চুক্তি গ্রহণ করেন নি। ফলে তারা তাদের নিজস্ব এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন।[১০৫] এবং মোঘলদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে থাকে। বিশেষ করে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে আফগানরা শক্তিশালী হয়ে উঠে। ফটকের চুক্তির প্রায় ছয়মাস পর বর্ষাকালে বাংলার নদী-নালা বর্ষার পানিতে প্লাবিত হবার ফলে আফগানরা মোঘলদের জলে-স্থলে উভয় দিক

---

[১০৩] যদুনাথ সরকার, হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল, ঢাবি, তৃতীয় মুদ্রণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

[১০৪] গোলাম হোসেন সলীম, রিয়াজ-উস-সালাতীন, আকবর উদ্দীন-অনুদিত রাংলা একাডেমী, ঢাকা- পৃ. ১২১

[১০৫] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৯

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রতিহত করতে থাকে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুমিন খান বাংলা "রাজধানী ভান্ডা" [১০৬] থেকে গৌড়ে স্থানান্তর করেন। গৌড়ের আবহাওয়া তখন এমন দূষিত ছিল যে, বিপুল পরিমাণ মোঘল সৈন্য গৌড়নগরে অবস্থান করার ফলে সেখানে মহামারী দেখা দেয়। এ অবস্থায় মুমিন খান আবার ভান্ডায় ফিরে যান। কিন্তু সেখানে ফিরে যাবার ১০ দিন পর ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ ২৩শে অক্টোবর মুমিন খান নিজে মহামারীর কবলে পড়ে মৃতুবরণ করেন।[১০৭]

এ সময় দাউদখান কররানী ও সমগ্র আফগান শক্তি দ্বিগুণ উৎসাহে এবং ফটকের চুক্তি ভংগ করে মোঘলদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। কারণ ইতোমধ্যেই তাদের মধ্যে একতা ফিরে আসে। উল্লেখ্য যে, দাউদখান কররানীর সাথে ফটকের চুক্তির পর মোঘল নৌবাহিনী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য মোঘল সেনানায়ক শাহ বরদীর নেতৃত্বে এক বিরাট নৌবহর মোতায়েন করে। কিন্তু দাউদখান কররানী মোঘলদের বিরুদ্ধে আবারও সামরিক অভিযান শুরু করেন এবং মোঘল সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে মোঘল সেনাপতি নজর বাহাদুর নিহত হয়। এই সংবাদ পেয়ে জালেশ্বরের মোঘল সেনাপতি মুরাদ খান ভান্ডায় পালিয়ে যান এবং পরে সকল মোঘল বাহিনী গৌড়ে পলায়ন করে।

এদিকে মোঘল নৌ বাহিনীর মীর-ই-বহর শাহ বরদীর নেতৃত্বে এক বিরাট নৌসেনা বহর পূর্ব বাংলায় অবস্থান করছিল। তারা বাংলার জমিদারদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল এইজন্য যে, দাউদ খান কররানীর বিদ্রোহের সুযোগে বাংলার অন্যান্য পক্ষ যেন মোঘলদের বিরুদ্ধাচারণের সুযোগ না পায়। এই সময় সরাইল পরগনার জমিদার ঈসা খান অসাধারণ পজ্ঞা, সাহস ও কৃতিত্বের সাথে উল্লেখযোগ্য শক্তিতে পরিণত হন। ঈসা খান যখন জানতে পারলেন দাউদখান কররানী মোঘলদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তখন ঈসা খান তাঁর নিজ নৌবহর সজ্জিত করে শাহবরদীর নৌবহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।[১০৮] ঈসা খানের পক্ষ থেকে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে শাহবরদী তার নৌবাহিনীসহ ভান্ডার দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

মোঘল বাহিনীতে তখন এক মারাত্মক সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ দাউদখান কররানী অত্যান্ত চতুরতার সাথে "তেলিয়াগড়" গিরিপথ অবরোধ করে রাখেন। যাতে মোঘল বাহিনী

---

[১০৬] ভান্ডা বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগরীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার বিপরীত তীরে অবস্থিত। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ বাংলার সুলতান সোলায়মান খান কররানী গৌড়নগরী থেকে বাংলার রাজধানী ভান্ডায় স্থানান্তর করেন

[১০৭] আবুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৬

[১০৮] আঃ করিম, বাংলার মোঘল শাসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০

Dhaka University Institutional Repository

ঐ গিরিপথ অতিক্রম করতে না পারে। এমতাবস্থায় মোঘলরা তেলিয়াগড় গিরিপথ বাদ দিয়ে ত্রিন্দুতের পথে পশ্চিম দিকে পালাতে থাকে।[১০৯]

এদিকে মুমিনখানের মৃত্যুর সংবাদে সম্রাট আকবর খান-ই-জাহানকে বাংলায় গমনের নির্দেশ করেন এবং তোডরমলকে খান-ই-জাহানের সঙ্গে থাকতে নির্দেশ দেন। খান-ই-জাহান ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাংলার দিকে যাত্রা করেন। তিনি ভাগলপুরে পৌছলে পলায়নপর মোঘল সৈন্যদের সাক্ষাৎ পান এবং তাদের একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হন।

অতপর তিনি রাজকীয় বাহিনী নিয়ে তেলিয়াগড় গিরিপথ অধিকার করেন এবং রাজমহল পাযর্ন্ত অগ্রসর হন। কারণ দাউদখান কররানী ইতোপূর্বে রাজমহলে সৈন্য সমাবেশ করে মোঘলদের যাত্রাপথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে জুলাই পযর্ন্ত তারা উভয় পক্ষই মুখেমুখি শিবির স্থাপন করে দিন কাটান, এই সুযোগে ঈসা খান ও অন্যান্য আফগান জমিদার এই অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। মহেশ্বরদী ও সোনারগাঁও পরগনার জমিদার ইব্রাহিম নাড়াল ও করিম দাদ, মুসাজাই[১১০] ঈসা খানের সাথে যোগদান করেন এবং ভাওয়াল পরগনায় তালেপ্রতাপ, সেলিমপ্রতাপ, চন্দ্র ও সুলতান প্রতাপের জমিদারগণও ঈসা খানের সাথে মৈত্রী জোটে একত্রিত হন।

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুলাই বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান দাউদখান কররানী মোঘলদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। দাউদ খান কররানীর মৃত্যুর পর মোঘলরা অনুভব করেছিল যে, আফগান সালতানাত বাংলা থেকে বিলুপ্তি ঘটলেও বাংলার এই অঞ্চলে বিপুলসংখ্যক জমিদার একত্রিত হয়ে মোঘল আগ্রাসন প্রতিরোধে নিজেদেরকে তৈরী করতে পারে। এদিকে আশ্চর্যজনকভাবে মোঘল সেনাপতি শাহবরদী স্বপক্ষ ত্যাগ করে ঈসা খানের সাথে একত্মতা ঘোষণা করেন।

এই খবর মোঘল শিবিরে পৌছার সাথে সাথে খান-ই-জাহান বিপুল সৈন্য নিয়ে অতিদ্রুত গতিতে পূর্ব বাংলার দিকে অগ্রসর হন। খান-ই-জাহান অতঃপর ভাওয়ালে এসে শিবির স্থাপন করেন। প্রথমেই তিনি দলত্যাগী বিদ্রোহী সেনাপতি শাহবরদীকে অবিলম্বে মোঘল বাহিনীর নিকট

---

[১০৯] আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০

[১১০] আকবরনামায় এদের কোন পরিচয় দেয়া হয়নি। নলিনীকান্ত ভট্টাশালী বলেছেন-তারা ভাওয়ালের নিকটবর্তী কোন অঞ্চলের স্থানীয় জমিদার ছিলেন। তবে ধারণা করা যায় যে, এই দুইজন জমিদার সোনারগাঁও এবং মহেশ্বরদী গভর্ণর ক্ষমতাশীল ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মসমর্পনের আহবান জানান।[১১১] অন্যদিকে ইব্রাহীম নাড়াল ও করিম দাদ, মুসাজাইসহ এই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন জমিদার সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। ইতোমধ্যে শাহবরদী তার কৃতকার্যে অনুতপ্ত হয়ে খান-ই-জাহানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এমতাবস্থায় মোঘল সেনাপতি আশা করেছিলেন যে, যেহেতু ঈসা খানের মিত্র শক্তি ইব্রাহীম নাড়াল ও করিম দাদ, মুসাজাই এবং সেনাপতি শাহবরদী আত্মসমর্পণ করছে, সেহেতু বর্তমানে একক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে ঈসা খান হয়তো বা আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু ঈসা খান আত্মসমর্পণের কোন চিন্তা না করে মোঘল আগ্রাসন শক্তিকে প্রতিরোধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম মনস্থির করনে।

---

[১১১] আবুল ফজল, আকবরনামায়, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository

মোঘলদের সাথে ঈসা খানের প্রথম যুদ্ধ

ঈসা খান মোঘলশক্তি মোকাবেলা করতে গঠন করলেন এক বিরাট নৌ ও পদাতিক বাহিনী। এই মিলিত বাহিনী যাতে করে মোঘলদের আগ্রাসন শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে তজ্জন্য তার সামরিক ব্যবস্থাকে অত্যান্ত শক্তিশালী করে গড়ে তুলেন।

মোঘল শিবিরে এই খবর পৌছে গেল যে, ঈসা খান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং বাংলার পূর্বাঞ্চলের এই এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে ঘোষণা দিয়ে বর্তমানে ভাটিমুল্লুকের শাহানশাহ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্যদিকে ঈসা খানের সাথে যোগদান করেছে জৈনশাহী পরগনার মজলিশ কুতুব ও মজলিশ দেলওয়ার নামে দু'জন আফগান জমিদার। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের পর থেকে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এর সবই সবগুলিই ছিল মোঘল বাহিনীর বিপক্ষে। কারণ তখন তিনি আনুগত্যশীল ছিলেন বাংলার স্বাধীন সুলতান দাউদখান কররানীর [১১২] প্রতি। দাউদখান কররানী যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধে লিপ্ত তখন সেনানায়ক শাহবরদীর নেতৃত্বে মোঘল রাজকীয় নওয়ারা ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্যা নদীতে বাংলার ভূ-স্বামীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য অবস্থান করছিল। ঈসা খান তখন এ অঞ্চলের অন্য জমিদারদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে শাহবরদীর নৌবহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের বিপর্যস্ত করে তোলেন।[১১৩]

এ প্রসংগে আব্দুল করিম বলেন, ঈসা খান ও শাহবরদী সংঘর্ষস্থল নির্ণয় করা কঠিন, তবে বিনাদ্বিধায় বলা যায় যে, শাহবরদী কোন মতে নৌবহরসহ পশ্চিম দিকে পলায়ন করে অন্যান্য মোঘল সেনাপতির সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হন।[১১৪]

---

[১১২] ইতোপূর্বে দেখেছি ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ বাংলার সুলতান তাজখান কররানীর অনুগ্রহে ঈসা খান তাঁর পিতার পরিত্যক্ত জমিদারী ফিরে পেয়েছিলেন। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ তাজখান কররানীর মৃত্যুর পর তার ভাই সোলায়মান খান কররানী বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র বায়জিদ খান কররানী সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করেছিলেন। একদল লোহানী আফগানদের ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হলে তার ছোট ভাই দাউদখান কররানী বাংলার মসনদে বসেন।

[১১৩] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[১১৪] আব্দুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯

Dhaka University Institutional Repository

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর হোসেন কুলীবেগ খান-ই-জাহান উপাধি নিয়ে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হয়ে আসার পর তৎকালীন বঙ্গের সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা করেন এবং বিশেষ করে ঈসা খানকে শায়েস্তা করার উপায় নিয়ে ভাবতে থাকেন। আবুল ফজল বলেন, শাহবরদী ও হোসেন কুলী বিরাট বাহিনী নিয়ে "গিয়ারা সুন্দর"[১১৫] নদী দিয়ে ঈসা খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন।[১১৬]

এ প্রসঙ্গে আঃ করিম বলেন, মোঘল নৌবহরে লক্ষ্যা নদীর ভেতর দিয়ে এগারসিন্ধুর[১১৭] নামক স্থানে পৌছে এবং ঈসা খানের জমিদারী সরাইল পরগনার দিকে যাত্রা করেন।[১১৮] এই প্রসংগে মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান "ঈসা খাঁ: মসনদ-ই-আলা" গ্রন্থে বলেন, ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মোঘল সেনাপতি খান-ই-জাহান প্রচুর সৈন্য সামন্ত সহকারে সেনানায়ক মোহাম্মদ কূলী ও শাহবরদীকে ঈসা খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বিপুল পরিমাণ রণতরী ও সামরিক সরঞ্জামসহ পদাতিক বাহিনীর এক বিশাল সেনাবহর ভাওয়াল থেকে রওনা হয়ে লক্ষ্যানদী দিয়ে এগারসিন্দুরে এসে পৌছে। এই অভিযানে আফগান জমিদার করিম দাদ মুসাজাই ও ইব্রাহিম নাড়ালও যোগদান করেন।[১১৯]

এ প্রসঙ্গে এগারসিন্দুর সম্পর্কে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রাচীনকাল থেকেই এগারসিন্দুর একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান ছিল। খ্রিষ্টপূর্বকাল হতে বাংলার দক্ষিণ অঞ্চল থেকে কামরূপ গমনের জন্য এগারসিন্দুর ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এছাড়া ও এগারসিন্দুর ছিল কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণ সীমার সর্বশেষ স্থান। ফলে এগারসিন্দুরে গড়ে উঠে একটি বিশাল বাণিজ্য বন্দর। নবম শতাব্দির দিকে কামরূপ রাজ্যের অভ্যন্তরে গড়ে উঠে ক্ষদ্র ক্ষদ্র রাজ্য। এই ধরনের একটি সীমান্ত রাজ্যেরও

---

[১১৫]এইচ তেরারিজের মতে ইন্ডিয়া অফিস পান্ডুলিপিতে শব্দটি "গিয়ারা সুন্দর" লিখিত আছে। তবে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, দিল্লী অথবা অন্যান্য স্থানের লেখক অথবা পর্যটকরা বাংলার এই পূর্বাঞ্চলের অনেক স্থানকে নদীর নামে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার অথবা বৃহত্তর ঢাকা জেলার কোন নদীর নাম গিয়ারা সুন্দর বা কিয়ারা সুন্দর ছিল না। এমতাবস্থায় আবুল ফজল এগার সিন্দুর স্থানের নামটির নদীর নামে উল্লেখ করায় স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, যিনি আবুল ফজলকে এই ভাষা দিয়েছিলেন তিনি সঠিকভাবে তা উপস্থাপন করতে পারেন নি।

[১১৬] আবুল ফজল, আকবরনামা, ৩য় খন্ড,প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৭৭,

[১১৭] প্রাচীনকাল থেকে এগারসিন্দুর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। খ্রিস্টপূর্বকাল হতে বাংলার দক্ষিণ অঞ্চল থেকে কামরূপ গমনের জন্য এগারসিন্দুর ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এছাড়া এগারসিন্দুর ছিল কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণ সীমার সর্বশেষ স্থান। ফলে এগারসিন্দুরে গড়ে উঠে এক বিশাল বন্দর।

[১১৮] আব্দুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪৪৯

[১১৯] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁ: মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভব ঘটেছিল নবম শতাব্দির শেষদিকে এগারসিন্দুরকে কেন্দ্র করে। ঐ সময় এই স্থানটির নাম ছিল "গঞ্জে হাবেস্ক"। এ এলাকায় যে সকল ট্রাইব জনগোষ্ঠির বসবাস ছিল তাদের মধ্যে হাবেস্ক গোত্র ছিল অন্যতম। এই হাবেস্কদের নামেই শহরটির নাম হয়েছিল গঞ্জে হাবেস্ক। যে হাবেস্ক শহরের কথা ইবনে বতুতা তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। এই অঞ্চলে মুসলমানদের অধিকারভূক্ত হবার পর সম্ভবত হাবেস্ক শহরটি এগারসিন্দুর নামে রূপান্তরিত হয়। সামন্ত রাজারা এগারসিন্দুরে নির্মাণ করেছিল সুরক্ষিত দূর্গ। বাংলার স্বাধীন সুলতানরা তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই দূর্গের পরিধি বৃদ্ধি করে আরো সুরক্ষিত করেছিলেন পরবর্তী সময়গুলোতে।[১২০]

এ প্রসংগে মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান বলেন, তদানিন্তন সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বপাড়ের এলাকা সমূহের মধ্যে এগারসিন্দুর ছিল একটি প্রাচীন জনপদ। বাংলার পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চলে যাতায়াতের সিংহদ্বার হিসেবে খ্যাত এগার সিন্দুরের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। বাংলার প্রাচীন নদীবন্দরগুলোর মধ্যে এগারসিন্দুর একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছিল বলেই প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অধীন সামন্ত রাজারা গড়ে তুলেছিল সামন্ত রাজ্যের রাজধানী রূপে।

ভাটিরাজ্যের অধিপতি ঈসা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথমেই এগারসিন্দুর অধিকার করা ছিল মোঘলদের বিশেষ উদ্দেশ্য। অন্য আর একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, এগারসিন্দুরের একজন প্রাচীন কোচ সামন্ত রাজা সুলতান শামছ উদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময় যে দূর্গটি নির্মাণ করেছিলেন সেই দূর্গটি মোঘল বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসার একান্ত প্রয়োজন ছিল বিধায় প্রথমেই এগার সিন্দুর দখল করে মোঘলরা শিবির স্থাপন করল।[১২১]

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় উত্তর প্রদেশ থেকে ইতিপূর্বে যে সকল আফগান বিতাড়িত হয়েছিল তারা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরের এগারসিন্দুরসহ এ অঞ্চলটিকে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিল। আর নিরাপদ স্থানগুলোতে প্রবেশের জন্য নৌপথে এগারসিন্দুর ছিল প্রবেশদ্বার। এ জন্যই মোঘল বাহিনী প্রথমে এগারসিন্দুরে তাদের অবস্থান নেয় এবং সেনানায়ক

---

[১২০] এ প্রসঙ্গে জনশ্রুতি রয়েছে যে, দশম শতাব্দির প্রথম দিকে কামরূপে দুর্বল রাজাদের রাজত্বকালে এগারসিন্দুরের কয়েক মাইল পূর্বে নগর হাজরাদির সামন্ত রাজা আজাহাবা এগারসিন্দুরের হাবেক্ক গোত্রের বটং রাজাকে পরাজিত করে এগারসিন্দুর অধিকার করেন। পরে আজহাবাকে পরাজিত করে বেবুদ নামে একজন এগারসিন্দুরে হাবেক্ক গোত্রের বটা রাজকে পরাজিত করে এগারসিন্দুর অধিকার করেন। এই ববুদ রাজার স্মৃতি চিহ্ন আজও এগার সিন্দুরে পরিলক্ষিত হয়।

[১২১] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহাজাহান, ঈসা খাঁ: মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

হোসেনকুলী কিছু সংখ্যক নৌ ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে এগারসিন্দুরে অবস্থান করতে থাকেন। অন্যদিকে সেনাপতি শাহবরদীর নেতৃত্বে এক বিরাট নৌ ও পদাতিক বাহিনী সরাইলের দিকে যাত্রা করে।

এদিকে দাউদখান কররানীর মৃত্যুর পর যে সকল আফগান জমিদার তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে ঈসা খানের সাথে এসে যোগ দিয়েছে। ঈসা খান সম্ভাব্য মোঘল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে সরাইল থেকে কয়েক মাইল উত্তর পশ্চিমে মেঘনার অপর তীরে অষ্টগ্রামের নিকট কাস্তল[১২২] অভিমুখে এগিয়ে যান। ঈসা খান অন্যান্য মিত্র জমিদার মজলিশ দেলোয়ার, মজলিশ কুতুব এবং মজলিশ জালালসহ বাংলার পাইকদেরকে নিয়ে কাস্তলে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে অপেক্ষা করেছিলেন।

এদিকে মোঘল বাহিনী ব্রহ্মপুত্র নদ বেয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে ভৈরবের নিকট পঞ্চবটি নামক স্থানে এসে জানতে পারল ঈসা খান কাস্তলে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করেছেন। মোঘলরা আর সরাইলের দিকে অগ্রসর না হয়ে মেঘনা থেকে ধলেশ্বরী নদী বেয়ে অতিদ্রুত কাস্তলের দিকে যাত্রা করে। ইতিমধ্যে ঈসা খান রণ ভাওয়ালের[১২৩] জমিদার ওয়াহেদ খানের নেতৃত্বে এক সেনাবহর অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে কাস্তলের কয়েক মাইল দক্ষিণে সাদেক পুরের দিকে প্রেরণ করেন। অন্য একটি বাহিনী আফগান জমিদার মজলিশ কুতুব ও মজলিশ দেলওয়ারের[১২৪] নেতৃত্বে এগারসিন্দুরের

---

[১২২] কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানগুলোর মধ্যে "কাস্তল" অন্যতম অষ্টগ্রাম থানা সদর থেকে সামান্য কিছু পশ্চিমে প্রাচীন এই স্থানটি অবস্থিত। দ্বাদশ শতকে বল্লাল রাজত্ব থেকে এই স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন অনন্তদত্ত নামে একজন ব্রাহ্মণ। তিনি তার গুরু ঠাকুরকে দ্বীজঠাকুরকেও সাথে নিয়ে এসেছিলেন। ক্রিয়াযাগসার নামে একটি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে এই তথ্য জানা যায়। আবুল ফজল এই স্থানটিকে 'কাইথল' বলে উল্লেখ করেছেন। এইচ ভেবারিজ এই স্থানটিকে চিহ্নিত করতে পারেননি।

[১২৩] ভাওয়াল বৃহত্তর ঢাকা জেলার একটি গড় এলাকা। বর্তমানে ভাওয়াল এরাকাটি গাজীপুর জেলার অর্ন্তগত। ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম পাড়ে ভাওয়ালের গড় অবস্থিত।

[১২৪]জনশাহী ও খালিয়াজুরী পরগনার আফগান জমিদার হিসেবে তার পরিচিত। প্রথম পর্যায়ে ঈসা খানের সাথে যারা মৈত্রী জোট গঠন করেছিলেন তাদের মধ্যে তারা অন্যতম। আবুল ফজল এ প্রসঙ্গে মজলিস প্রতাব ও মজলিস দেলওয়ারের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নামটি মজলিশ কুতুব হবে প্রতাব হবে না। কারণ জৈনশাহী পরগনার জমিদার হিসেবে মজলিশ কুতুবের নাম পাওয়া যায় প্রতাবের নাম পাওয়া যায় নি। এছাড়া অষ্টগ্রামের কুতুব শাহী মসজিদ মজলিশ কুতুবের স্মৃতি বহন করছে। মজলিস কুতুবের পরবর্তী বংশধরকে সম্রাট জাহাঙ্গির যে ফরমান দিয়েছেলেন তার একটা কপি কিশোরগঞ্জ জেলা পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

দিকে প্রেরণ করেন। মোঘল বাহিনী প্রথমেই ওয়াহেদ খান কর্তৃক বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রচন্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পড়ল। কিন্তু মোঘলদের প্রচন্ড আক্রমণে ওয়াহেদ খানের বাহিনী মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে সৈন্যদেরকে নিয়ে পশ্চাদপসরন করার ফলে মোঘল বাহিনী কাস্তুলের দিকে অতিদ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে ঈসা খানের বাহিনীর উপর প্রচন্ড কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। মোঘল বাহিনীর প্রচন্ড গোলা বর্ষণের ফলে ঈসা খানের নৌ ও পদাতিক বাহিনী ছত্র ভঙ্গ হয়ে মেঘনার অপর পাড়ে রসুলপুরের দিকে পশ্চাদপসারণ করে।

এ প্রসংগে আবুল ফজল বলেন, "কাস্তুলের সীমান্তে উভয় পক্ষের মধ্যে এই ভীষণ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়।[১২৫] ঈসা খানের সাথে মোঘল বাহিনীর এই যুদ্ধে জয় পরাজয় নিশ্চিত হবার পূর্বেই মোঘল সৈন্যরা ব্যাপক এলাকা জুড়ে ত্রাস এবং লুটতরাজের মাধ্যমে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ঐ সময় মজলিশ কুতুব ও মজলিশ দেলোয়ার ঈসা খানের সেনাবাহিনীকে পুনরায় সুসংগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ঈসা খান অতিসত্ত্বর ত্রিপুরা রাজ্যের নিকট সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন। আর নিজেরা সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখবেন।

এ প্রসংগে ডঃ ননিলীকান্ত ভট্টাশালী বলেন, ঐ সময় ঈসা খান তার সৈন্য বাহিনীকে পেছনে রেখে মেহের কূলের পাড়া দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী উদয়পুর পৌছেন।[১২৬]

মোঘলরা যখন জৈনশাহী ও হাজারাদী পরগনার ব্যাপক অঞ্চলে লুটতরাজ এবং ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলছিল তখন মজলিশ কুতুব ও মজলিশ দেলোওয়ার ঐ অঞ্চলে ছোট ছোট নদী ও খাল বিল থেকে প্রচুর নৌকা সংগ্রহ করে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে মোঘল রাজকীয় নাওয়ারার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তারা প্রায় অতর্কিতভাবেই মোঘলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ সময় মোঘল বাহিনী এগারসিন্দুরে অবস্থান করছিল। মোঘল রাজকীয় বাহিনী ও আকস্মিক আক্রমণে কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে। এ প্রবল আক্রমণের মুখে সেনানায়ক হোসেন কুলী শত চেষ্টা করেও মোঘল বাহিনীকে একতাবদ্ধ করতে ব্যর্থ হন এবং অবশেষে তিনি বন্দী হন।[১২৭] অপর মোঘল সেনাপতি শাহবরদী অত্যন্ত দ্রুতগতিতে

---

[১২৫] আবুল ফজল, আকরামনামা, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

[১২৬] ডঃ নলিনীকান্ত্ম ভট্টাশালী, ভল্যুম-৩৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

[১২৭] আবুল ফজল, আকবরনামা, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ভাওয়ালের [১২৮] দিকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিপুল সংখ্যক মোঘল সৈন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আকবরনামায় বলা হয়েছে, মোঘল বাহিনীর বিপর্যস্ত অবস্থায় আশ্চার্যজনকভাবে ভাওয়াল পরগনার জমিদার তিলা গাজী মোঘল বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। সম্ভবত ঐ সময় তিলা গাজীর প্রচেষ্টায় মোঘল বাহিনীর সেনানায়ক হোসেন কুলী বান্দী আবস্থা থেকে মুক্তি হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে এ প্রসঙ্গে আকবরনামায় কিছুই বলা হয়নি।

নলিনী কান্ত ভট্টাশালী বলেন, "বাংলায় মোঘল বাহিনীর উপর এমন বিপর্যয় এর পূর্বে আর কোন দিন হয়নি। ত্রিপুরা রাজার সাহায্য নিয়ে যখন ঈসা খান সরাইলে উপস্থিত হন তখন তার সাথে যুদ্ধ করার আর কেউ ছিল না। কারণ মোঘলরা ইতিপূর্বে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছে।[১২৯]

মোঘলদের এই পরাজয়ের প্রেক্ষিতে খান-ই-জাহান তার সৈন্য সামন্তসহ ভান্ডায়[১৩০] চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ঈসা খান চেষ্টা সাধনা করেছেন বাংলাকে স্বাধীন রাখার জন্য এবং তিনি প্রমাণ করেছেন মোঘলদের সাথে যুদ্ধ করে তিনি ছিলেন সফল বীর পুরুষ। যে চেতনার ধারাবাহিকতায় অবশেষে বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা তারই প্রমাণ।

---

[১২৮] ভাওয়াল বৃহত্তর ঢাকা জেলার একটি গড় এলাকা (বর্তমান ভাওয়ালে এলাকাটি গাজীপুর জেলার অন্তর্গত বহ্মপুত্র ও শীতলক্ষা নদীর পশ্চিম পাড়ে ভাওয়ালের গড় অবস্থিত)

[১২৯] ডঃ নলিনীকান্থ ভট্টাশালী, ভল্যাম-৩৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

[১৩০] ভান্ডা বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগরীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত গংগার বিপরীত তীরে অবস্থিত। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ বাংলার সুলতান সোলায়মান খান কররানী গৌড়ে থেকে বাংলার রাজধানী ভান্ডর স্থানান্তর করেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ প্রচন্ড বন্যায় ভান্ডা নগরী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের চট্টগ্রাম অজ্ঞাতবাস এর ঠিকানা

এই পরিচ্ছেদে ঈসা খান সম্পর্কে একটি ভিন্নতর প্রসঙ্গ আলোচনা করা হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাস্তলের যুদ্ধে জয় পরাজয় নিশ্চিত হবার পূর্বেই ঈসা খানের সৈন্য সাহায্যের আশায় ত্রিপুরার মহারাজা অমরমানিক্যের শরণাপন্ন হন এবং তাদের সহায়তায় বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে মোঘলদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু এ প্রসংগে বিভিন্ন লেখক ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে, ঈসা খান ত্রিপুরা মহারাজা অমরমানিক্যের নিকট সামরিক সাহায্যের জন্য শরণাপন্ন হন। কিন্তু দরবারের অন্যান্য অমাত্যবর্গের অমতের কারণে কোন সাহায্য না পেয়ে তিনি চট্টগ্রামের দিকে চলে যান। এখন এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হবে।

ঈসা খানের চট্টগ্রামের অজ্ঞাতবাস সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থে কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি। ১৩৬৫ বাংলা সনের ভদ্র-চৈত্র সংখ্যা বাংলা একাডেমী পত্রিকায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক ডঃ আহমদ শরীফ চট্টগ্রামে ফটিকছড়ি থানায় "ঈসাপুর" পরগনার কবি এতিম কাশেম রচিত "আওরা দ্য বারোজ"[১৩১] প্রশস্তির ভূমিকায় লিখেছেন যে, ঈসাপুর গ্রামের উৎপত্তি সম্পর্কে চট্টগ্রামের একটি কিংবদন্তি আছে যে, ঈসা খান মসনদ-ই-আলা কোন মোঘল সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে পালিয়ে আসেন। যে জঙ্গলকীর্ণ পাহাড় ঘেরা জায়গাটিতে দু'বছর অজ্ঞাতবাস করেন তা "ঈসাপুর" নামে পরিচিত হয়। বাংলার মোঘল সেনানী খান-ই-জাহান হোসেন কুলীবেগের হাতে পরাজিত হয়ে (১৫৭৬-১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ) ঈসা খান পালিয়ে যান বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। কিন্তু কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন তা জানা যায় না। এরপর আহমদ শরীফ বিভিন্ন পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, কোথাও ঈসা খানের চট্টগ্রামে পলায়নের বর্ণনা নেই। কাজেই উক্ত কিংবদন্তির মূলে কোন সত্য নেই বলে মনে হয়।[১৩২]

---

[১৩১] আওর দ্য বারোজ উত্তর চট্টগ্রামের ইসারপুর পরগনার পর্তুগীজ বংশীয় শেষ মহিলা জমিদার। প্রথম পর্তুগীজ জমিদার আন্দর ফর্নাদের মৃত্যুর পর তার পুত্র কালুচ ফার্নাদ জমিদার জমিদার হন। তার মৃত্যুর পর তিতান্ন কিছু দিন জমিদারি কারার পর নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে মৃত্যুবরণ করে। তখন তার বিধবা পত্নীরা দ্যা বারোজ ঈসাপুর পরগনার জমিদার হন। আব্দূল হক চৌধুরী চট্টগ্রাম ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৫১-৫২

[১৩২] ডঃ আহমদ শরীফ, আওরা দ্য বারোজ প্রশাস্তির ভূমিকা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা ভাদ্র-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৬৫ বাংলা চট্টগ্রামের ইতিহাসে প্রসাদ, আব্দুল হক চৌধরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ শরীফের উল্লেখিত বক্তব্যে দ্বিমত পোষণ করে "চট্টগ্রাম ইতিহাস প্রসঙ্গ" গ্রন্থের লেখক আব্দুল হক চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রামের ঈসা খানের আগমন ও ঈসাপুরে পরগনা উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত আছে যে, কোন মোঘল সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ঈসা খান সপরিবারে চট্টগ্রামে পালিয়ে আসেন। পাহাড় ঘেঁষা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে তিনি বাসস্থান নির্মাণ করে অজ্ঞাতবাসের শেষ দু'বছর অবস্থান করেছিলেন। পরবর্তীকালে তা ঈসাপুর পরগনা নামে পরিচিত হয়। এখানে অবস্থানকালে শক্তি সঞ্চয় করে ঈসা খান স্বীয় রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন।[১৩৩] আব্দুল হক চৌধুরী তার বক্তব্যের সমর্থনে রাজমালার বিবরণ, মুক্তাল হোসেন কাব্য ও নসলে উসমান ইসলাম বাদ কাব্যে বর্ণিত তথ্য এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানা অর্ন্তরগত নোয়াজিশপুর গ্রামে অবস্থিত ঈসা খানের দীঘি ও হাটহাজারী থানার মেথল গ্রামের চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি রোড হতে রাউজান ও ফটিকছড়িসহ তিন থানার মধ্যে দিয়ে প্রসারিত ইসাপুর ভিলেজ রোড প্রমাণ ইত্যাদির বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।

প্রথমেই দেখা যেতে পারে কবি মোহাম্মদ খান মুক্তল হোসেন কাব্যের উপক্রমে পীরের প্রশস্তি অংশে কী বলেছেন। কবি বলেছেন-

বার বাংলার রাজা ঈসা খান বীর
দক্ষিণ কুলের রাজা আদম সুধীর।।
স্নেহভাবে যাহাকে পুজন্ত প্রতিনিতি
যাহাকে প্রশংসা কৈলা মগধের প্রতি।।
সদর জাহাঁ কাজী যাকে বোলন্ত বাখান
পরম পান্ডিত্য গুণে রসের নিদান।"

আহমদ শরীফ উল্লিখিত বক্তব্যের আলোকে বলেছেন যে, কাব্যের এ অংশ থেকে চট্টগ্রামের সাথে ঈসা খানের যোগাযোগ অনুমান করা যায় না।[১৩৪]

অন্যদিকে আব্দুল হক চৌধুরী বলেন, মোঘল সেনানায়কের হস্তে পরাজিত ঈসা খান ত্রিপুরা মহারাজার আশ্রয়রূপে উত্তর চট্টগ্রামে অজ্ঞাতবাসকালে পীর কাজী সদর জাহাঁর কাছে মুরিদ হয়েছিলেন।[১৩৫]

---

[১৩৩] আব্দুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২

[১৩৪] আহমদ শরীফ, আওরা দ্যা বারোজ প্রশস্তির ভূমিকা বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভদ্র-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৬৫ বাংলা। উদ্ধৃতি আব্দুল হক চৌধুরী রচিত চট্টগ্রাম ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৩৯

[১৩৫] আব্দুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে চট্টগ্রামের কবি সদর জাহাঁ ঈসা খান মসনদ-ই-আলার পীর ছিলেন। কাজেই অনুমান করা যায় ঈসা খান কোন সময় পীরের সংগে সাক্ষাৎ করার জন্য চট্টগ্রাম গমনের পর যে স্থানে শিবির স্থাপন করেছিলেন সে স্থানটি পরবর্তীকালে "ইসাপুর" নামে খ্যাতি হয়।[১৩৬]

এ প্রসংগে আর একটি বিবরণ উপস্থাপন করেছেন, ১৩৪১ বাংলা সনে কলিকাতার মাসিক বসুমতি পত্রিকায় 'জঙ্গলবাড়ী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মিঃ উমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী। তিনি বলেন, হতভাগ্য ইসমাইল খান ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ কোন একটি যুদ্ধে বীরত্বের সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তৎপর ঈসা খান ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বিদ্রোহের পাতাকা উত্তোলন করলেন। সম্রাট আকবর তাকে দমন করার জন্য কাকশাল সেনাপতি শাহবাজ খানকে বঙ্গে প্রেরণ করেন। অনেক চেষ্টার পর শাহবাজের হস্তে ঈসা খানের পরাজয় হয়। ঈসা খান সপরিবারে চট্টগ্রামে পলায়ন করেন। এই যুদ্ধে জয়ের সংবাদে মুন্সী আবুল ফজল সম্রাট আকবরকে পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করেন। পত্রের মর্ম এই অতিশয় সন্তোষদায়ক রণজয় সংবাদ বঙ্গ হতে আসে। ঈশ্বানুগ্রহ শাহবাজ খাঁ ঘোড়াঘাট হতে সাগর তীর পর্যন্ত জয় করেন। বিদ্রোহী ঈসা খান পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান।[১৩৭]

উমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরীর বক্তব্যটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করা যায় না। কারণ শাহবাজ খাঁ বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ ঐ সময় ঈসা খান সোনারগাঁও থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করার জন্য তার নিজস্ব এলাকাতেই অবস্থান করছিলেন এ বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে সত্য। অতএব সুবাদার শাহবাজ খাঁর সময় ঈসা খান চট্টগ্রাম গমন করেছিলেন এ বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া উমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী ঈসা খানের ভ্রাতা ইসমাইল খানের মৃত্যুর বিষয়ে যে বিবরণটি উপস্থাপন করেছেন তাতে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে কাস্তুলের যুদ্ধে ইসমাইল খানের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু কাস্তুলের যুদ্ধের বিবরণটি আবুল ফজল আকবরনামায় উপস্থাপন করেছেন তাতে ইসমাইল খান নিহত হবার কোন উল্লেখ করেননি।

জনাব আবদুল হক চৌধুরী ঈসা খানের চট্টগ্রাম অজ্ঞতবাস সম্পর্কে আলোচনায় ত্রিপুরার মহারাজাদের বিবরণ "রাজমালার" বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ঈসা খান যখন চট্টগ্রাম অবস্থান করছিলেন তখন ত্রিপুরার মহারাজা ঈসা খানকে উত্তর চট্টগ্রামের শাসন ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করে পাঠান। কিন্তু রাজমালার প্রদত্ত বিবরণ

---

[১৩৬] আব্দুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[১৩৭] উমেশ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী "জঙ্গলবাড়ী" প্রবন্ধ মাসিক বসুমতি পত্রিকা ১৩৪১ বাংলা সন

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী ঈসা খানের চট্টগ্রামে অবস্থানের বিষয়টির সত্যতা নিরূপণ করা যায় না। রাজমালায় বলা হয়েছে।

ঈসা খানের প্রতি রানী রাজাতে কহিল
মহারাজা সৈন্য দিতে তাকে আদেশিল
বায়ান্ন হাজার সৈন্য ঈসা খান সঙ্গে আর
সিংহ সবর উক্তির সঙ্গে সৈন্য সমিভ্যার।[১৩৮]

ঈসা খান কর্তৃক ত্রিপুরায় রাজার নিকট সৈন্য সাহায্য চাইবার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, কীরূপে ত্রিপুরা রাজ্যের সাহায্য লাভ করা যাইবে এ সম্বধে ঈসা খান ত্রিপুরা রাজ্যের সেনাপতিদ্বয় তাজ খান ও বাজুখাঁর পরামর্শ চাইলে তারা ঈসা খানকে রানী অমরাবতীর শরণাপন্ন হতে উপদেশ দেন। তারা বলেন যে, রাজা সমস্ত ব্যাপারেই রাণীর পরামর্শ মানিয়া ছিলেন।[১৩৯] এরপর ঈসা খান রাণীর কাছে আবেদন করলে রাণীর পরামর্শ মত রাজা অমরমানিক্য বায়ান্ন হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এ প্রসংগে মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান বলেন, ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের প্রায় শেষদিকে যখন ঈসা খান কাস্তুলের যুদ্ধে সামরিকভাবে পরাজিত হন তখন তিনি ত্রিপুরার রাজার নিকট সৈন্য পাওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তখন রাজা অমরমানিক্য ঈসা খানকে বায়ান্ন হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল।[১৪০]

নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে, ত্রিপুরা রাজ্যের সৈন্য নিয়ে ঈসা খান সরাইলে উপস্থিত হবার পূর্বেই মোঘল বাহিনী মজলিশ কুতুব ও মজলিশ দেলোওয়ারের আক্রমণে পরাজিত হয়ে বিপর্যস্ত হবার পর সেনানায়ক খান-ই-জাহান বন্দী হন এবং শাহবরদী ভাওয়ালের দিকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। এমতাবস্থায় মোঘল বাহিনী এই বিপর্যস্ততায় ঈসা খান কী কারণে অজ্ঞাতবাসে যাবে তা কোনভাবেই বোধগম্য হচ্ছে না। তাই আব্দুল হক চৌধুরীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।[১৪১]

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রামের বেশকিছু অংশ ঈসা খানের রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত ছিল বলে ঐ অঞ্চলের বেশ কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন যে, চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার অন্তর্গত চারিয়া গ্রাম নিবাসী কবি উজির আলী রচিত "নসলে উসমান ইসলামাবাদ" নামক প্রকাশিত বাংলাকাব্যের পান্ডুলিপিতে লিখা রয়েছে যে, উত্তর চট্টগ্রাম ঈসা খানের রাজ্যভূক্ত

---

[১৩৮] আব্দুল হক চৌধুরী-প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[১৩৯] দীনেশ চন্দ্র সেন, পূর্ব্বঙ্গ গীতিকায়, ২য় খন্ড, কলিকাতা, পৃ. ৪২

[১৪০] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, "ঈসা খান", প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[১৪১] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

ছিল।[১৪২] এবং উক্ত কাব্যে চট্টগ্রামের ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। যদিও কবি উজির আলীর তথ্যগুলো কাব্যেররূপ দিতে গিয়ে অতিব নজনের আশ্রয় নিয়েছেন।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কবি উজির আলী ঈসা খানের সময় থেকে ১৩০ বছরের ব্যবধানে "নসুলে ওসমান ইসলামাবাদ" কাব্য রচনা করেছিলেন আর তাতে চট্টগ্রামে ঈসা খানের অবস্থানের বিষয়টি যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়।

কিন্তু এরপরেও যে বিষয়টি দাঁড়ায় জনাব আব্দুল হক চৌধুরী চট্টগ্রামে ঈসা খানের অবস্থানের বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতোপূর্বই আমরা লক্ষ্য করেছি কাস্তুলের যুদ্ধের শেষে ঈসা খান উদয়পুরের চলে যাবার পর মজলিশ দেওয়ান ও মজলিশ কুতুব মোঘলদেরকে এগারসিন্দুর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে মোঘল বাহিনী পর্যদস্ত হবার প্রেক্ষিতে সুবেদার খান-ই-জাহান প্রাণ ভয়ে ভাভায় দিকে পলিয়ে যান। ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী এই যুদ্ধে ঈসা খানের অংশ গ্রহণ পরিস্কার ভাবে বলা যায় না। কারণ তখন ঈসা খানের ত্রিপুরার রাজা অমরমানিক্যে স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু কাস্তুলের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন বিষয়টি প্রতিভাত হচ্ছে না। কেননা কাস্তুলের যুদ্ধে করল সেই সময় ঈস খান কি কারণে চট্টগ্রামে পালাবার বিরবণ থাকতে পারে।

এ প্রসংগে ডঃ আহমদ শরীফের প্রথম বর্ণনাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কেননা একজন পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাত করার জন্য ঈসা খান চট্টগ্রামে গমন অসম্ভব কিছুই না।

উল্লেখিত আলোচনা পরিস্কার এইভাবে করা যেতে পারে যে, হয়ত ঈসা খান তার যে রাজ্যের যে বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন তাতে অনুমান করা যায় যে, রাজ্যের দক্ষিণ সীমা চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানা পর্যন্ত বিস্তৃতি ছিল। এ বিষয়টি সত্য যে ঈসা খান শাসন ব্যবস্থার বিচার বিভাগের জন্য বিভিন্ন স্থান সদর কাজী নিয়োগ করেছিলেন। তাই মুক্তাল হোসেন কাব্যের পীর প্রশস্তি অংশে সদর জাহান কাজী বলতে কোন ব্যক্তি বা পীর নাম বোঝায়নি এবং ব্যক্তি পদবী বোঝানো হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। এমতাবস্থায় সদর জাহান কাজী ঈসা খানের পীর ছিলেন বলেন আমাদের মনে হয় না।

এ প্রসঙ্গে হয়বত নগরের দেওয়ান ছাত্তার দাদ খানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, ঈসা খানের পীর ছিলেন তদানিন্তন তরফের শাসনকর্তা হযরত সৈয়দ ইব্রাহীম মালেফুল উলামা (র.)। তিনি সিলেট বিজয়ী হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহ সালা (র.)-এর তৃতীয় অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন।

---

[১৪২] আব্দুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রাম ইতিহাস প্রসঙ্গ-নোয়াজিশাপুর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৬, পৃ. ৫১-৫২

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায় রাজ্য শাসন প্রয়োজনে হয়ত ঈসা খানের চট্টগ্রামে যাবার বিষয়টি অসম্ভব নয়। কিন্তু অজ্ঞাতবাসের বিষয়টি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। কারণ ১৫৭৮ থেকে ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঈসা খানের কার্যকলাপের বছর ওয়ারী বিবরণ আকবরনামায় বিধুত হয়েছে। যদি ঈসা খানের এই সময়ের মধ্যে কোথাও পালিয়ে আত্মগোপন করতেন তা হলে আবুল ফজল 'আকবরনামা' গ্রন্থে অবশ্যই উল্লেখ করতেন।[১৪৩]

ঈসা খান তার অধীনে নিয়োগকৃত সদর জাহাঁন কাজী সাহেবের কার্যকলাপ নিজ চোখে দেখতে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন অথবা চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন হয়ত কিন্তু সদর জাহান কাজী কোন পীর ছিলেন না। কেননা তার পীর ছিলেন সৈয়দ ইব্রাহীম মালেকুল উলামা (র.)। যিদিও তার শশুর ছিলেন তাকে তিনি পীর মানতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। অতএব, ঈসা খান চট্টগ্রামে পীরের উদ্দেশ্যে অজ্ঞাতবাস বলে এমন কিছুই ছিল না। এখানে বিষয়টি পরিস্কার যে, তার পীর ছিলেন সৈয়দ ইব্রহীম মালেকুল উলামা (র.)। তিনি তার খালু তার নিকটই পিতার মৃত্যুর পর লালিত পালিত হন এবং তার আদর্শে উৎজীবিত হয়ে বাংলার ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় দেশরক্ষার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন যা সহজেই অনুমেয়।

---

[১৪৩] মোহাম্মদ মোশররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পৃ. ৭৩-১৩২

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ঈসা খানের তরফ অভিযান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) ঈসা খানের জঙ্গলবাড়ী অধিকার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ) ঈসা খানের বাইশ পরগনার অধিপতি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঘ) মোঘলদের সাথে ঈসা খানের পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের তরফ অভিযান

১৫৮১ খ্রিস্টাব্দ ঈসা খান সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত তরফের[১] অধিকর্তা ফতেহ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করেন। এই যুদ্ধের বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে ত্রিপুরার মহারাজাদের শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস "রাজমালা গ্রন্থে"।

১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ উদয়পুর [২] পাহাড়ের পশ্চিমে চৌদ্দগ্রামের রাজা অমরমানিক্য "অমর সাগর" নামে একটি প্রকান্ড দীঘি খননের মনস্থ করেন। দীঘি খননের জন্য রাজার অনেক মাটিয়ালের প্রয়োজন হয়। রাজা অমরমানিক্য তার পার্শবর্তী এলাকার জমিদারের নিকট তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কোদালি দিয়ে সাহায্য করার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। সে অনুযায়ী ঈসা খানসহ কিছু সংখ্যক জমিদার ত্রিপুরার মহারাজকে কোদালি দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু তরফের আফগান জমিদার ফতেহ খান কোদালি দিতে অস্বীকার করেন।

এরপর রাজা অমরমানিক্য তরফের জমিদার ফতেহ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। রাজামালার বর্ণনা মতে, ঐ সময় ঈসা খান রাজা অমরমানিক্যের আহবানে তার সেনাবাহিনীসহ ফতেহ খানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের যুবরাজ রাজধরের নেতৃত্বে বাইশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীসহ ঈসা খানের এই সামরিক অভিযানের কথা রাজ মালায় বলা হয়েছে।

---

[১] চতুর্দশ শতাব্দির প্রথম থেকেই তরফ শব্দের উৎপত্তি। বৃহত্তর সিলেট জেলার বেশ কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে তরফ রাজ্যটির গঠিত হয়। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দ এই অঞ্চলে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবার পর হযরত শাহজালাল (র.)-এর নির্দেশে হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার (র.) এই অঞ্চলটি অধিকার করেন। এই সময় সাকুল্য অঞ্চলটি রাজা আচক নারায়ণের অধীনে ছিল। তার রাজধানী ছিল রাজাপুর। উত্তরে বরাক নদী, দক্ষিণে পার্বত্য ত্রিপুরা, পূর্বে ভানুগাছ আর পশ্চিমে লাখাই থানা। উল্লেখিত ভৌগৌলিক সীমার মধ্যে তরফ রাজ্যটির অবস্থান ছিল। যা বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার এবং মৌলভী বাজার জেলার কিছু অংশ বিস্তৃত রয়েছে। বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে তরফ রাজ্যের প্রথম শাসনকর্তা ছিলেন হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার (র.)-এর পর তার অধঃস্তনগণ ক্রমাগতভাবে এ অংশে শাসন করেন। সম্রাট শেরশাহের সময় তরফ রাজ্যে আমিল এবং ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়।

[২] কুমিল্লা শহর থেকে আনুমানিক ত্রিশ কিলোমিটার পূর্ব দিকে উদয়পুর অবস্থিত। বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত। স্থানটির নাম প্রথমে ছিল ছত্রপুর। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ ত্রিপুরার রাজা উদয়মানিক্য রত্নপুর থেকে রাজধানী চন্দ্রপুর স্থানান্তর করেন এবং স্থানীয় নাম রাখে উদয়পুর।

Dhaka University Institutional Repository

এই ক্রমে চলিলেক শ্রীহট্ট যুদ্ধেতে।
নৌকা পথে চলিলেক ঈসা খাঁ সহিতে।।
অমর মানিক্য আজ্ঞা পাইয়া তখন
ইসা খাঁ সহিতে চলে বঙ্গ সোনাগণ।।
সুরমা উজাইয়া নৌকা শ্রীহট্ট গেল
ফতেহ খান পাঠান সঙ্গে পূর্বে যুদ্ধে দিল।।[৩]

এ প্রসংগে রাজা অমরমানিক্য হরিশ্চন্দ্রের পুত্র সুবুদ্ধি নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সামন্ত ভূস্বামীদের মধ্যে কে কতজন কোদালী দিয়ে সাহায্য করেছেন। এই প্রেক্ষিতে সুবুদ্ধি নারায়ণ ফাজাকে নিম্নে উল্লেখিত তথ্য প্রদান করেন।

বিক্রমপুরের চাঁদ রায় – ৭০০ জন
বাকলার বশু জমিদার – ৭০০ জন
গোপাল পাড়ার গাজী – ৭০০ জন
ভাওয়ালের জমিদার – ১০০০ জন
অষ্টগ্রামের জমিদার – ৫০০ জন
রণভাওয়ালের জমিদার–১০০০ জন
সরাইলের ঈসা খান – ১০০০ জন
ভলুয়ার জমিদার – ১০০০ জন

রাজা অমরমানিক্য তরফের জমিদার ফতেহখানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দেন। যুবরাজ রাজধরের নেতৃত্বে বাইশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী তরফ অভিমুখে প্রেরণ করে রাজমালার বর্ণনা অনুযায়ী এই যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন ঈসা খান। উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পূর্ব থেকেই ঈসা খানের সাথে ত্রিপুরার মহারাজার একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যে কারণে ঈসা খান ত্রিপুরা রাজার আহবানে সাড়া দিয়ে তরফের আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করেছিলেন।

এ কাহিনী যতদূর সত্য তা প্রমাণ করা কঠিন। তবে যতদূর জানা যায় সম্ভবত ফতেহ খান সম্রাট শের শাহের সময় অথবা তার পুত্র সেলিম শাহের রাজত্বের সময় তরফ অঞ্চলে আমীর অথবা

[৩] আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২

Dhaka University Institutional Repository

ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। উইলিয়াম হান্টারের 'ষ্টেটিসটিক্যাল একাউন্টাস অব আসাম' গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায় যে, সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত আমীর বা ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন।[৪]

১৪৪০ খ্রিস্টাব্দ মুকাবিল খান, ১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দ মনিক উদ্দীন, ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ মুযলিশ আলম, ১৫১১ খ্রিস্টাব্দ রুকন খান, ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ খোয়াজ খান, ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দ মসনদ-ই-আলা ফতেহ খান।[৫]

যতদূর সম্ভব ফতেহ খান সম্রাট শেরশাহের সময় অথবা তার পুত্র সেলিম শাহের রাজত্বের সময় তরফ এলাকার আমির অথবা ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। শেরশাহী রাজত্বের শেষে সম্ভবত স্বাধীন জমিদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফতেহ খানের বিরুদ্ধে ঈসা খানের যুদ্ধ যাত্রার বিষয়টি আশ্চার্যজনক হলেও অসম্ভব কিছুই নয় এজন্য যে, বিশেষ করে শেরশাহের আত্মীয় স্বজনদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। কারণ শেরশাহের পুত্র সেলিম শাহের নির্দেশেই আফগানরা ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খানকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছিল। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে ঈসা খান যখন বাংলার অন্যান্য জমিদারদেরকে নিয়ে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মৈত্রী জোট গঠন করেন তখন হয়তবা ফতেহ খান ঈসা খানের সাথে মৈত্রী জোট গঠনে অস্বীকার করেছিলেন। সুতরাং এই ঘটনার ঐতিহাসিক সততা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে রাজমালার বিবরণের একটি বিষয়ে আমাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলেছে তা'হল এ যুদ্ধে তদানীন্তন সময়ের সিলেটে শাসনকর্তা তরফ অধিপতির পক্ষ অবলম্বন করেছিল বলে উল্লেখ করেছে। এ প্রসংগে রাজমালার বিবরণ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধে ত্রিপুরার বাহিনী ও ঈসা খান বাহিনী তরফ সেনাপতি খোভারায় ও তার পুত্রকে প্রথমে পরাজিত করার পর পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় উদয়পুরে প্রেরণ করে এবং ফতেহ খান পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পন করে। অন্যদিকে সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার (র.)-এর অধঃস্তন পুরুষ সৈয়দ মুসা ও তদীয় পুত্র সৈয়দ অলমকে বন্দী করে। রাজমালার বর্ণনা অনুযায়ী ত্রিপুরায় রাজধানী থেকে সৈয়দ আদম মুক্তি লাভ করেন এবং আরাকানে আশ্রয় নেন। পরে আরাকান রাজ্যের সহায়তায় সৈয়দ মুসাও মুক্তি লাভ করেন।

এ প্রসংগে মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান তার "ঈসা খান" মসনদ-ই-আলা নামক গ্রন্থে আলোচনায় বলেন, রাজামালার ঐ বিবরণের দ্বারা জটিলতার সৃষ্টি এজন্য হয়েছে যে, ফতেহ খানের বিরুদ্ধে ঈসা খানের যুদ্ধ যাত্রার যুক্তি সংগত কারণ থাকলেও সৈয়দ নাসির উদ্দিন

---

[৪] মোঃ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান "ঈসা খাঁ, মসনদে-ই-আলা" প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১

[৫] বাংলা একাডেমী পত্রিকা, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৭২, বাংলা, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

সিপাহসালার (র.)-এর অধঃস্তন পুরুষদের সাথে যুদ্ধের বিষয়টি বোধগম্য হচ্ছে না। তাছাড়া তরফের সৈয়দ বংশের সাথে ঈসা খানের আত্মীয়তার বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তরফের সৈয়দ বংশের বিরুদ্ধে ঈসা খানের যুদ্ধ এবং সৈয়দ মুসা ও সৈয়দ আদমকে বন্দীর বিষয়ে এবং তৎপরবর্তী কালে তাদের মুক্তি বিষয়ে অনুমান করা যায় যে, যুবরাজ রাজধরের নেতৃত্বে যে বাহিনীটি প্রেরিত হয়েছিল সম্ভবত সেই বাহিনীটিই সৈয়দ মুসা ও তদীয় পুত্র সৈয়দ অদম ও অন্যান্য জনকে বন্দী করেন। পরবর্তী সময়ে ঈসা খানের সহায়তায় অমরমানিক্যের বন্দীখানা থেকে মুক্তি লাভ করে তারা আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সময় আরাকানের রাজা ছিলেন সেকান্দর শাহ।

এ প্রসংগে দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী 'জালালাবাদের কথা' গ্রন্থে বলেন, অমর মানিক্যের আক্রমণে তরফের অভিজাত সৈয়দ পরিবারের যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তা অস্বীকার করার উপায় নাই।[৬]

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ মাঝামাঝি সময়ে তরফের এই যুদ্ধে জমিদার ফতেহ খান পরাজিত হন এবং আত্মসমর্পন করেন। রাজমালার বর্ণনা অনুযায়ী রাজা অমরমানিক্যের পক্ষ হয়ে ফতেহ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার প্রেক্ষিতে রাজা অমরমানিক্য ঈসা খানের সম্মানিত করার জন্য একটি দরবার আহবান করেন। মহারাজা প্রকাশ্যে ঈসা খানের বীরত্বের প্রশংসা করেন এবং জামাতা দয়াবন্ত নারায়ণের পার্শ্বে তাকে আসন প্রদান করেন। আর এই দরবারেই মহারাজ অমরমানিক্য ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধীতে ভূষিত করেন।

ত্রিপুরার রাজমালা গ্রন্থের প্রথম দিকটা অর্থাৎ যেখানে চন্দ্রবংশীয় সযাতির সাথে ত্রিপুরার রাজবংশের সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস রয়েছে সেই অংশটুকু বাদ দিলে তৎবর্ণিত অন্যান্য ইতিবৃত্তগুলোর অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়। ইতিহাস পূর্বযুগের বিবরণ কল্পনা মিশ্রিত হলেও পরবর্তী যুগের শাসন সংকান্ত ইতিবৃত্ত রাজসভার ঐতিহাসিকগণ যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন। অবশ্য তথাকার রাজন্য বর্গের বীরত্ব প্রতিপাদন করার জন্য ঐ পুস্তকে সময় সময় কাল্পনিক যুদ্ধ বিগ্রহ ও জয় লাভের কাহিনী প্রদত্ত হয়েছে।[৭]

তবে এ বিষয়টি অত্যান্ত সত্য যে, তরফের সৈয়দ বংশের সাথে ঈসা খানের কোন বিরোধ ছিল না। অতএব ফতেহ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ারকালে একই সময় তরফের সৈয়দগণের সাথে ত্রিপুরারাজ্যের সংঘর্ষ কেন ঘটেছিল এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন। এ প্রসংগে

---

[৬] দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৩, পৃ. ১৫৩

[৭] ড. দীনেস চন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

তরফের ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, মোঘল কুল তীলক আকবর শাহের পূর্ব পর্যন্ত যিনিই সিংহাসনে আরোহন করেন কেউই আর তার পূর্ব পর্যন্ত অধিকার করতে পারলেন না। সুতরাং এই দীর্ঘকাল পর্যন্ত সৈয়দ মুসা ও তার পূর্ব পুরুষগণ স্বাবলম্বীতার দ্বারায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। ত্রিপুরাধিপতি ও অন্যান্য রাজাগণ যদিও মেঘনার পূর্বপার মুসলমান রাজত্ব হতে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন কিন্তু সৈয়দ মুসা শাসিত প্রদেশের প্রতি কেউই হস্তক্ষেপ করতে পারলেন না। কেবলমাত্র পূর্বত সন্নিকটস্থ জনপদ ত্রিপুরাধিপতির বশ্যতাধীকার করায় কিয়দাংশ রাজ্য মূসার হস্তচ্যুত হয়েছিল।[৮]

আলোচনায় দেখা যায় যে, ফতেহ খান ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দ পূর্ব থেকে তরফ রাজ্যের একটি অঞ্চলে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকের মতে ঈসা খানের সাথে মৈত্রী জোট গঠনেও তিনি অস্বীকার করেছিলেন। এমতাবস্থায় রাজা অমরমানিক্য যখন ফতেহ খান-এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ঈসা খানের সৈন্য সাহায্য কামনা করেন, ঈসা খান এ আহবানে সাড়া দেন এবং ফতেহ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধের কারণ যাই হউক না কেন এটা জানা যায় যে, ত্রিপুরা বাহিনী ও ঈসা খানের বাহিনী তরফ সেনাপতি শোভারাম ও তার পুত্রকে প্রথমে পরাজিত করার পর পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় উদয়পুরে প্রেরণ করে এরপর ফতেহ খান পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পন করেন। এই যুদ্ধ সম্পর্কে আরো ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ অমরমানিক্য তরফ জয় করার পর স্মারক মুদ্রা বা বিজয় মুদ্রা উৎকীর্ণ করেছিলেন। মুদ্রার পাঠ নিম্নরূপ ঃ

শ্রীহট্ট বিজয়ী শ্রী যুক্তামর মানিক্য দেব

শ্রী অমরাবী দৈব্যৌ শক ১৫০৩ (১৫৮১)

এছাড়াও ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় স্টেপলটন সপ্তদশ শতাব্দির সাতটি কামান শীর্বক একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, নারায়ণগঞ্জের অদূরে দেওয়ানবাগে ঈসা খানের চতুর্থ অধঃস্তন মনোওয়ার খান হাভেলীতে মাটি খনন করে ৭টি কামান উদ্ধার করা হয়। এই ৭টি কামানের একটিতে শেরশাহ অন্যটিতে ফতেহ খানের নাম অঙ্কিত রয়েছে।

ঢাকার তদানিন্তন ম্যাজিস্ট্রেট এম. ই. ষ্টিনটন এই কামানগুলোর বর্ণনা লিখার জন্য এইচ. ই স্টেপ্লটনকে দায়িত্ব প্রদান করেন। কামানগুলোর চারটি ব্যাঘ্রমুখাকৃতি এবং লিখা রয়েছে যে, শেরশাহ ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ এটি প্রস্তুত করেন। কামানগুলোর বিপরীত দিকে তরফ রাজ্য কথাটি লিখা রয়েছে।

---

[৮] সৈয়দ আব্দুল গাফফার, তরফের ইতিহাস, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বাকি তিনটি কামান ঈসা খানের নিজের ছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। কারণ ঐগুলো বাংলায় "ঈসা খান" নামাঙ্কিত রয়েছে। সুতরাং শেরশাহ এবং ফতেহ খান নামাঙ্কিত কামানগুলো ফতেহ খানকে পরাজিত করে ঈসা খান অর্জন করেছিলেন এতে কোন সন্দেহ নাই।

ফতেই খানের সাথে ঈষা খান এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যুদ্ধের কাহিনীগুলো রাজমালায় সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজমালার বর্ণনা অনুযায়ী রাজা অমরমানিক্যের পক্ষ হয়ে ফতেহ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার প্রেক্ষিতে রাজা অমরমানিক্য ঈসা খানকে সম্মানিতও করার জন্য একটি দরবার আহবান করেন। দরবারে মহারাজা প্রকাশ্যভাবে ঈসা খানের বীরত্বের প্রশংসা করেন এবং রাজা অমরমানিক্যের জামাতা দয়াবন্ত নারয়ণের পাশে তাকে আসন প্রদান করেন।

এই সময় তরফ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো যারা ক্ষমতাশীল ছিলেন তাদের মধ্যে সিলেট বিজয়ী হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহশালার (র.)-এর অধঃস্তন সৈয়দ মুছা ছিলেন অন্যতম। ফতেহ খানের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজার সামরিক অভিযানের প্রেক্ষিতে ফতেহ খানের সাথে যুদ্ধকালীন সময়ে সম্ভবত সৈয়দ মুছা এবং অন্যরা ফতেহ খানের পথ অবলম্বন করেছিলেন। ফলে অমরমানিক্যের সৈন্যরা ফতেহ খানকে বন্দী করার সময় সৈয়দ মুছা এবং তার পুত্র সৈয়দ অদমকেও বন্দী করেছিলেন। তবে সৈয়দ মুছা এবং সৈয়দ আদমকে বন্দী করার ক্ষেত্রে ঈসা খাঁ সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিনা তা অনুমান করা যায় না। কারণ তারা ছিলেন ঈসা খানের মাতুল বংশ। এমতাবস্থায় ফতেহ খানের বিরুদ্ধে ঈসা খানের সামরিক অভিযানের যুক্তিসংগত কারণ থাকলেও তরফদের সৈয়দ বংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়টিতে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে। রাজমালায় বলা হয়েছে যে, ঐ সময় তরফের সৈয়দ আদম ত্রিপুরা বাহিনীর হাতে বন্দী হন। কিছুদিনের ব্যবধানে তারা আবার মুক্তিও পান।

এ বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুবরাজ রাজধরের নেতৃত্বে যে বাহিনীটি যুদ্ধরত ছিল সম্ভবত তারাই তরফের সৈয়দদেরকে বন্দী করে। পরবর্তী সময়ে ঈসা খানের সহায়তায় অমরমানিক্য বন্দীখানা থেকে মুক্তি লাভ করেন।

এ প্রসংগে রাজমালাতে যা বলা হয়েছে, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐ যুদ্ধের পরে তরফের সৈয়দ বংশের অনেকেই আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহন করেন। আরাকান রাজ তাদেরকে বিভিন্ন রাজকার্যেও নিয়োজিত করেছিলেন। রাজমালয় বর্ণনা থেকে আরো জানা যায় যে, সৈয়দ মুছার আরাকান রাজ্যে আশ্রয় নেবার পর পুত্র সৈয়দ আদমকে ত্রিপুরায় বন্দীখানা থেকে মুক্তি করার জন্য আরাকান রাজ্যের সহায়তা চেয়েছিলেন। এ প্রসংগে রাজমালায় বলা হয়েছে,

মঘরাজা সেকান্দর রনাঙ্গেতে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

অমরমানিক্য স্থানে পত্র যে লিখিল।

আদম শাহকে রাজা পাটাও ত্বরতি

তবে তোমা সঙ্গে আমা হবে বহু প্রীতি

সেকান্দর শাহ স্থানে নৃপে লিখে পুনি।

শরণাগত আদম শাহ না দিব কখনি।[৯]

রাজমালায় উল্লেখিত বক্তব্যে সৈয়দ আদমকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি দেবার কথা লিখা না থাকলেও অনুমান করা যায়, ঈসা খানের অনুরোধে রাজা অমরমানিক্য সৈয়দ আদমকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কারণ পরবর্তীকালে সৈয়দ মুছা যখন আরাকান রাজ্যের প্রধান আমত্যপদ লাভ করেছিল তখন তাঁর পুত্র সৈয়দ আদম চট্টগ্রামের রামু এলাকায় আরাকান রাজ্যের অধীনে প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিল।[১০]

এমতাবস্থায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঈসা খান যখন ফতেহ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এই সুযোগে যুবরাজ রাজধর তরফের সৈয়দ বংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাস্ত করেন এবং ত্রিপুরা মহারাজাদের বহুদিনের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটালেন।

---

[৯] দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী,“জালালাবাদের কথা”,বাংলা, ঢাকা ১৯৮৩, পৃ. ১৫২-১৫৩

[১০]আসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খন্ড, ১৯৬৬, পৃ. ৭৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের জঙ্গলবাড়ি অধিকার

ঈসা খান তরফ রাজ্যে সামরিক অভিযান পরিচালনার মাত্র কয়েক মাস তিনি সরাইলে অবস্থান করেছিলেন। এরপর তিনি ভাটিরাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে কাতরাবোতে[১১] ভাটিরাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। মূলত ঈসা খানের নিকট এগারসিন্দুরে মোঘল বাহিনীর পরাজয় এবং তরফ রাজ্য বিজয় ঈসা খানকে আরো দুঃসাহসী করে তুলে। তিনি তার কর্তৃত্বাধীন এলাকা আরো বিস্তার করতে মনোনিবেশ করেন। ঐ সময় তিনি বিক্রমপুরের চাঁদরায়[১২] যশোদলের শ্রীমন্তরায়[১৩] এবং চারিপাড়ার নবরঙ্গ রায়ের[১৪] সমর্থন আদায় করেন। কিন্তু জঙ্গল বাড়ীতে[১৫] নিযুক্ত সুসং[১৬] রাজ্যের প্রতিনিধি ও জঙ্গলবাড়ী দূর্গের নিয়ন্ত্রক লক্ষণ হাজরার অনুগত্য আদায় করতে ব্যর্থ হন।

---

[১১]এই গবেষণায় ঈসা খানের দূর্গ অধ্যায়ে কাতরাবো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

[১২]বিক্রমপুর বাংলার একটি প্রাচীন স্থান। কীর্তিনামা (পদ্ম) নদীর তীরে শ্রীপুর নামক স্থানে স্বাধীন জমিদার চাঁদরায়ের অবস্থান ছিল। বিক্রমপুরের ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চাঁদরায়ের পূর্বপুরুষ নিমরায় বাংলার সেন বংশের রাজত্বকালীন সময়ে বিক্রমপুরে আসেন এবং এক সময় সামন্ত রাজা হিসাবে এই অঞ্চলে শাসন করেন। ঈসা খানের সাথে সামজিক মৈত্রী জোটে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

[১৩] কিশোরগঞ্জ জেলা সদর শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণে যশোদল গ্রামটি অবস্থিত ষোড়শ শতকে এই অঞ্চলের সামন্ত রাজ শ্রীমন্তরায়-এর প্রসাদ বাটির চিহ্ন আজও পরিলক্ষিত হয়।

[১৪] কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি থানার আসমিতা ইউনিয়ন চারিপাড়া স্থানটি অবস্থিত। পঞ্চদশ শতাব্দি থেকে নবরঙ্গ রায়ের পূর্বপুরুষ ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে আগমন করে কামরূপ রাজ্যের সামন্ত রাজা হিসেবে এই অঞ্চল শাসন করেন। চারিপাড়ার নবরঙ্গ রায়ের প্রসাদ বাটির চিহ্ন না পাওয়া গেলেও তার নির্মিত একটি আখড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য যখন এগারসিন্দুর আগমন করেন তখন তিনি এই আখড়ার বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

[১৫] জঙ্গল বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার অন্তর্গত কাদির জঙ্গল ইউনিয়নের একটি ঐতিহাসিক স্থান। কিশোরগঞ্জ থেকে জঙ্গলবাড়ির দূরত্ব প্রায় সাত কিলোমিটার পূর্বদিকে। করিমগঞ্জ থেকে জঙ্গল বাড়ির দূরত্বে প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে দিকে। প্রাচীন নদী নরসুন্দার তীরে প্রাকৃতিক কারণেই সুরক্ষিত জঙ্গলবাড়ি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরত্বপূর্ণ স্থান।

[১৬] সুসংরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সোমেশ্বর পাঠক নামে একজন ব্রাহ্মণ। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দ সোমেশ্বরে পাঠক তার স্ত্রীসহ কামরূপে মহামায়ার মন্দির দর্শনের জন্য আগমন করেন। তবে ঐতিহাসিকদের মতে ষোড়শ শতাব্দির পূর্বে কামরূপে মহামায়ার কোন মন্দির নির্মিত হয়নি। এমতাবস্থায় অনুমান করা যায় যে, মোমেশ্বর পাঠক তা স্ত্রী কন্যা পরিজনসহ ভাগ্যান্বেষণে কামরূপে আগমন করেছিলেন। পরে গারোপাহাড়ের দক্ষিণবর্তী বৈশ্য গারোর রাজ্য অধিকার করতে সমর্থ হন। মোমেনশাহীর নতুন ইতিহাস গ্রন্থের লেখক খান সাহেব এম আবদুল্লার মতে

Dhaka University Institutional Repository

জঙ্গলবাড়ির নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, "ঈসা খান' নামক গ্রন্থে জঙ্গল বাড়ি একটি ঐতিহাসিক স্থান। একাদশ শতাব্দীতে আসামের দবঙ্গ জেলার প্রতাপগড় থেকে কোন কারণে বিতাড়িত হয়ে "জঙ্গল" বোলাহুর নামক একজন রাজা এই স্থানে এসে ভাটিরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার নামে এই স্থানটি জাঙ্গালবাড়ি নামকরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ের বিবর্তনে জঙ্গলবাড়ি নামধারণ করে। রাজা জোঙ্গল বোলাহুর এই স্থানটিতেই তার রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এরপর থেকে ষোড়শ শতাব্দির প্রথম পর্যন্ত জঙ্গলবাড়ির ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ দিকে বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র যুবরাজ নাসির উদ্দিন কামরূপের বিভিন্ন অঞ্চলসহ এই স্থানটি অধিকার করেন। তখন সুসং রাজ কামাইনাথ বাংলার সালতানাতের অনুগত্য স্বীকার করেন। ফলে যুবরাজ নাসির উদ্দিন সুসং রাজা কামাইনাথকে "মল্লিক" ও 'হাজরা' উপাধি দিয়ে এই অঞ্চলটির শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন।

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ নাসির উদ্দিন নূসরত শাহ যখন গৌরের সিংহাসনে আরোহন করেন।তখন কামাইনাথকে নাসিরউজ্জিয়ান[১৭] পরগনার শাসনক্ষমতা প্রদান করেন। ফলে জঙ্গলবাড়ির দূর্গটির এ সময় কানাইনাথের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কামাইনাথ মল্লিকের মৃত্যুর পর সুসং এর সিংহাসনে বসেন

সোমেশ্বর পাঠক একজন সম্ভ্রান্তব্রাহ্মণ ছিলেন তার সংস্পর্শে এই দুর্গম জঙ্গলকীর্ণ পার্বত্য লোকদের মিলিত প্রবাহকে সুসঙ্গ বা সুসং নামে স্থানটির নামকরণ হয়। সোমেশ্বর পাঠক সুসং রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেও তিনি কামরূপ সামন্তরাজা হিসেবেই প্রথমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাংলার সুলতান নাসির উদ্দিন নূসরত শাহ কামরূপ রাজ্যের এই অঞ্চল অধিকার করার পর তদানিন্তন সুসং রাজ্যকে পূর্বদ্দার রক্ষী পদে নিয়োগ দান করেন এবং মল্লিক উপাধি দান করেন। অনেকে বলেছেন, সুসং রাজাদের 'হাজরা' উপাধিও দেয়া হয়েছিল। কারণ তাদের হাজার হাজার সৈন্য রাখার অধিকার দেয়া হয়েছিল।

[১৭]হোসেন শাহী বংশের সুলতান নাসিরউদ্দিন নূসরত শাহের নামে এই পরগনাটির নামকরণ করা হয় নাসিরউজ্জিয়াল। কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানা, নেত্রকোকনা থানার কেন্দুয়া ও মদন থানা বিস্ত্রীন হাওড় অঞ্চল এই পরগনায় অর্ন্তভুক্ত। উল্লেযোগ্য যে, এই অঞ্চলের ষৌড়শ শতকে যে পরগনাগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। তা বেশীর ভাগই আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্রদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন আলাউদ্দিন হোসেন শাহের অপর পুত্র জয়েন শাহের নামে জয়েনশাহী পরগনা যা কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্ঠগ্রাম গ্রাম ও মিঠামইন থানার বিস্ত্রীণ হাওড় অঞ্চল এ পরগনার অর্ন্তভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জানকি নাথ মল্লিক। এক সময় ঐ বংশের লক্ষণানাথকে জঙ্গলবাড়ির দূর্গের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দান করে জঙ্গলবাড়িতে প্রেরণ করা হয়।[১৮]

প্রশ্ন হতে পারে যে, কি কারণে ঈসা খানের জঙ্গলবাড়ি অধিকার করেন? ভাটিরাজ্যের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত জঙ্গলবাড়ি সুসং রাজ্যের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঠিক তেমনি ঈসা খানের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফলে স্থানটি ঈসা খানের নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ঈসা খান সুসং রাজ্যের সাথে সংঘাত সৃষ্টি না করে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। কারণ ভাটি অঞ্চলে তখনও তার অবস্থান সুসংহত ছিল না। তাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সুসং রাজ্যের অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তার অত্যাচারে লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে ঈসা খানের শরণাপন্ন হয় এবং জঙ্গলবাড়ি অধিকার করার জন্য অনুরোধ করে।

আমার ধারণা বিষয়টি সঠিক নয়, কারণ ষোড়শ শতকের প্রথম থেকেই এই অঞ্চলটি ছিল বাংলার লোক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিদের আবাসস্থল। কবি চন্দ্রবর্তী, কবি দ্বীজবংশীদাস প্রমূখ কবিরা তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে এই স্থানে অবস্থান করে। যদি লক্ষণ হাজরা অত্যাচারী হতেন তাহলে অবশ্যই তাদের রচিত কবিতায় বিষয়টি উল্লেখ থাকত। তবে মনে হয়, প্রাচীনকাল থেকে ভাটি রাজ্যের রাজধানী হিসেবে জঙ্গলবাড়ির একটি রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। তাই ভাটিরাজ্যের অধিপতি হিসেবে জঙ্গলবাড়ি অধিকার করা ছিল ঈসা খানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমরা লক্ষ করেছি যে, ইতোপূর্বে এ অঞ্চলের বেশ কয়েকজন আফগান জমিদার ঈসা খানের সাথে মোঘলদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে মৈত্রী জোটের অংশগ্রহণ করে। এই সময় জঙ্গলবাড়িতে অবস্থানরত সুসং রাজ্যের প্রতিনিধি লক্ষণ হাজরা ঈসা খানের কোন আহবানেই সাড়া দেয়নি বরং বিদ্বেষ পূর্ণ কার্যকলাপের মাধ্যমে মূলতঃ মোঘলদের পক্ষাবলম্বন করে। এমতাবস্থায় ঈসা খানের জঙ্গলবাড়িতে সামরিক অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন।

এখানে একটি বিষয় বলার প্রয়োজন, কোন যুদ্ধ বা অভিযান ঐতিহাসিক দিকে চিন্তা করলে দেখা যায়, নির্দিষ্ট কোন একটি কারণে কোন যুদ্ধ হয় না ।

রঘুসিংহ জঙ্গলবাড়ি আক্রান্ত হবার বিষয়টি জানার পর পরই পিতা জানকিনাথ মল্লিক ও ভাই যদুনাথ মল্লিক এবং কিছুসংখ্যক কোচ ও গারো সৈন্যদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনীসহ সুসং থেকে জঙ্গলবাড়ির দিকে যাত্রা করেন। জঙ্গলবাড়িতে আগমন করার পর রঘুসিংহ ঈসা খানের বিপুল শক্তি সম্পর্কে অবগত হন।

---

[১৮]মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায় তিনি যুদ্ধে না জড়িয়ে ঈসা খানের সাথে সন্ধি করার মনস্থ করেন। কারণ জঙ্গলবাড়ী দূর্গের অধিপতি লক্ষণ হাজরা মোঘলদের সাথে ঈসা খানের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য রঘুসিংহ এবং জানকি নাথ মল্লিককে প্রদান করেন। ফলে বিষয়টি বহুমূল হয় যে, বিশাল শক্তির অধিকারী মোঘল বাহিনী যেখানে ঈসা খানের বাহিনীর নিকট পর্যুদস্ত হয়ে পশ্চিম বঙ্গের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে সুসং রাজ ঈসা খানের সাথে সংঘর্ষ জড়ালে এর পরিণতি খারাপ হতে পারে বিবেচনা করেই রঘুসিংহ ঈসা খানের সাথে সন্ধি করার মনস্থ করেছিলেন।

কিন্তু ইতোমধ্যে সুসংরাজ জানকিনাথ মল্লিক আততায়ীর হাতে নিহত হন। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, ঈসা খান কর্তৃক নিয়োজিত কোন আততায়ীর হাতে জানকিনাথ মল্লিক নিহত হয়েছিলেন। ঈসা খাঁর অধঃস্তনগণ এই ধারণাটি সঠিক নয় বলে জানেন।[১৯]

তাদের যুক্তি হল ঈসা খানের সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করেও এই ধরণের অমানবিক কর্মকান্ডের বিবরণ ঐতিহাসিকরা দিতে পারেননি। তারাযদি ঈসা খানকে জানকিনাথ মল্লিক হত্যার পরিকল্পনা করতেন তাহলে এই ঘটনাটি অবশ্যই সমসাময়িক কালের লেখক আবুল ফজল তার "আকবর নামা" গ্রন্থে উল্লেখ করতেন।

কথিত আছে যে, জানকিনাথ মল্লিক আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর রঘুসিংহ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেন। তিনি ঈসা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন। এই সংবাদ পেয়ে ঈসা খান শ্রীমন্তরায় ও মোহাব্বত খানের[২০] নেতৃত্বে একটি নোবাহিনী ও পদাতিক বাহিনী একটি দল জঙ্গলবাড়ির দিকে প্রেরণ করেন।

রাজা শ্রীমন্তরায় ও মোহাব্বত খান তাদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে জঙ্গলবাড়ি আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রঘূসিংহ পরাজিত ও বন্দী হন। রঘুসিংহকে জঙ্গলবাড়ি দূর্গে বন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে একদল বিশ্বস্ত গারো সৈন্যের সহায়তায় রঘুসিংহ জঙ্গলবাড়ি দূর্গের বন্দিখানা থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন।

---

[১৯] জঙ্গল বাড়ির দেওয়ান আমিনদাদ খান এ প্রসঙ্গে বলেন, এই বিবরণটি তিনি তার পিতা ও পিতামহ থেকে শুনেছেন। তিনি আরও বলেন যে, এই বিবরণগলো লিখিতভাবে না থাকলেও এই অঞ্চলের লোক মুখে পাচীনকাল থেকেই বিধৃত হয়ে আসছে।

[২০] রণ ভাওয়াল অঞ্চলের জমিদার মোহাব্বত খান। মোঘলরা ভাওয়াল অঞ্চলে অবস্থান করার পর মোহাব্বত খান তার পরিবার পরিজন নিয়ে ঈসা খানের আশ্রয়ে চলে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন ঈসা খান একজন বিশিষ্ট মযলিশ।

Dhaka University Institutional Repository

যে খাল দিয়ে রঘুসিংহ জঙ্গলবাড়ি থেকে পালিয়ে আসেন তা আজও রঘুখালি[২১] নামে পরিচিত। বিবরণটি কতটুকু সত্য তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে বিষয়টি এমন ও হতে পারে যে, সুসং এর সাথে যোগাযোগের জন্য হয়তোবা রঘুসিংহ এই খালটি খনন করিয়েছিলেন। ফলে খালটি রঘুখাল নামে পরিচিতি লাভ করে। অথবা রঘুখালী নামে নামকরণ হয়।

এ প্রসঙ্গে শ্রী উমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী বলেছেন, "ঈশা খাঁ সসৈন্য বীরদর্পে লক্ষণের দূর্গটি আক্রমণ করলেন, উপায়ন্তর না দেখে,কোচরাজ তদীয় ভবনের পূর্বদিকের ইস্টক নির্মিত গুপ্ত সুড়ঙ্গে পলায়ন করলেন।[২২]

উমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরীর বক্তব্যটি সম্ভবত সঠিক। কারণ দূর্গের অভ্যন্তরে সুরঙ্গ পথের দ্বারা আত্মরক্ষা করা তৎকালীন সময়ে যুদ্ধেরই কৌশল ছিল। এমতাবস্থায় ধারণা করা যায় যে, রঘুসিংহের যখন যুদ্ধ জয় করা সম্ভব মনে হয়নি তখন রাতের বেলা সুরঙ্গ পথে জঙ্গলবাড়ি দূর্গ থেকে বের হয়ে সুসং ফিরে আসাটাই স্বাভাবিক।

কথিত আছে যে, রঘুসিংহ জঙ্গলবাড়ি থেকে পালিয়ে এসে সরাসরি আগ্রায় গমন করে সম্রাট আকবরের দরবারে তার করুণ কাহিনী বর্ণনা করেন এবং প্রতিকার প্রার্থনা করেন।

ঈসা খান জঙ্গলবাড়ি অধিকার করার পর সেখানে তিনি তার রাজত্বের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করে চাকলে কৈরবাড়ি অধিকার করেন। তিনি ব্রহ্মপুত্রের উজান পথে ধুবড়ী উপস্থিত হয়ে রাঙ্গাআটিয়া একটি দূর্গ নির্মাণ করেন। গড় জরিপা দূর্গ সংস্কার করে কামরূপ জয়ে মনোনিবেশ করেন এবং গোয়েন্দ পাড়া জেলার কিছু অংশ জয় করেন। তিনি ধুবড়ীতে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন।[২৩] রাজ্যবিস্তার থেমে থাকেনি। তিনি যখননি সুযোগ পেয়েছেন তখনই ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করে গিয়েছেন। করেছেন ধময়ি প্রতিষ্ঠান। ঈসা খানের দূর্গ সংস্কার ও যখনই সযোগ পেয়েছেন তখনই নতুন দূর্গ নির্মাণ করে নিজেকে শক্তিশালী করে পরবর্তীতে সমগ্র বাংলা অধীনে আনতে সক্ষম হয়েছেন। যার ধারাবাহিকতা বাঙ্গালী জাতিয় চেতনায় শত শত বছর স্বাধীনভাবে শাসিত হয়ে এই চেতনায় অবশেষে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেন।

---

[২১] কিশোরগঞ্জ জেলা মদন থানা সাতারপুর নামক স্থানে নরসুন্দা নদী থেকে রঘুখালী নামক খালটির উৎপত্তিস্থল আজও লক্ষ্য করা যায়

[২২] উমেশচন্দ্র সিংহ চৌধরী, জঙ্গলবাড়ি মাসিক বসুমতি পত্রিকা, প্রাগুক্ত

[২৩] খান সাহেব, এম. আব্দুল্লাহ মোমেন শাহীর নতুন ইতিহাস, প্রাগুক্ত. পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের বাইশ পরগনার অধিপতি

ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুযায়ী বাংলা মুসলিম শাসনের শুরু থেকে বহু সংখ্যক জমিদার ছিল। সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায় যে, বাংলার ভূমি ব্যবস্থাকে কয়েকভাবে বিভক্ত করা হয়েছিল। ১.জমিদারি অর্থাৎ কর প্রদায়ী ভূমি, ২.ইজারাদারদের আওতাধীন ভূমি, ৩.আমীলদের অধীন ভূমি ৪.জায়গীর এবং আয়মার ভূমি। অন্যদিকে বাংলায় জমিদার ছিল দুই শ্রেণীর। কর প্রদানকারী জমিদারগণ এবং রাজস্বের ইজারাদারগণ। কর প্রদানকারী জমিদারদের উৎপত্তি হয় বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে। আর তারা ছিলেন ক্ষদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা। তারা মুসলিম শাসকদের নিকট আত্মসমর্পন করেন এবং নিয়মিত কর প্রদান ও অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। মুসলমান লেখকগণ তাদেরকে জমিদার নামে অভিহিত করেছেন। এর পরবর্তী সময় রাজত্বের ইজারাদারগণও জমিদার নামে পরিচিত হন।

তদানিন্তন সময়ে বাংলাদেশে জায়গীর ভূমির পরিমাণ ব্যাপক ছিল। বেশীর ভাগ সামরিক বেসামরিক রাজকর্মচারীকে জায়গীর দানের মাধ্যমে তাদের বেতন দেয়া হতো। খালসা বা জমির ক্ষেত্রে জমিদারগণ হয় করদাতারূপে নতুবা ইজারাদার হিসেবে রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন। আলীমগণ ছিলেন রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকারি কর্মচারি।

আফগান শাসনকালে বাংলার সমগ্র অঞ্চলের পরগনা বিভাগ সমূহ এবং পরগনা বিভিক রাজস্ব নিরূপণ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। বাংলার অপরাপর মুসলমান শাসকদের মত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সম্রাট শেরশাহ একটি ঐতিহ্যগত দিক অনুসরণ করেছিলেন। তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে যে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন তাতে তার রাজস্ব সংস্কারে মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে ঐতিহাসিক বিবরণীগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রাজা তোডরমল মোঘলপুর্ব আমলে শাসকদের পরগনা ভিত্তিক রাজস্ব তালিকা ও রাজস্ব বিবরণীর ভিত্তিতে তার রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। কারণ বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠী খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো কালেই অশান্ত প্রকৃতির ছিল না। [২৪] অনেকের মতে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ রাজা তোড়রমল যখন তার বিখ্যাত রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রচলন করেন তখন তার রাজস্ব বন্দোবস্তের আওতায় এমনসব পরগনার নাম অন্ত ভূক্ত করেছিলেন যে, এই সমস্ত এলাকা তখন পর্যন্ত মোঘলদের অধিকারভূক্ত হয়নি।

---

[২৪] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসংগে ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেন, এতে "স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, এই পরগনা সমূহ ছিল মোঘল পূর্ব যুগের রাজস্ব বিভাগ এবং প্রত্যেকটি পরগনার রাজস্ব দামে নিরূপণ করা হয়েছে, বাংলার মোঘল পূর্ব আমলের শাসকদের পরগনা ভিত্তিক রাজস্ব তালিকা ও রাজস্ব বিবরণীর ভিত্তিতে"। বস্তুতঃ রাজা তোডরমল মোঘল পূর্ব আমলের রাজস্ব প্রথার কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে এবং নতুন কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে জটিলতার সৃষ্টি করে রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন না। কারণ বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠী খাজনা আদায়ের ক্ষেতে কোন কালেই অশান্ত প্রকৃতির ছিলনা।

এ প্রসংগে আল্লামা আবুল ফজল বলেন, "বাংলার লোকেরা শান্ত প্রকৃতির। তারা বৎসরের খাজনা কিস্তিতে আটমাসে পরিশোধ করে। সরকার ও রায়তদের মধ্যে কার্য্য ভাগাভাগির প্রচলন না থাকায় লোকেরা খাজনা পরিশোধের নিমিত্তে মোহর এবং টাকা নিয়ে একটি নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হয়। ফসলের মোটামুটি একটি হিসাব করে খাজনা ধার্য করা হয়। সুবিবেচক সম্রাট এই রীতি মেনে নিয়েছেন।[২৫]

রাজা তোডরমল ভূমি জরিপ কাজে লোহার আংটাযুক্ত কয়েকটি বাঁশের দ্বারা ভূমি পরিমাপের ব্যবস্থা করেছিলেন এই পরিমাপ যন্ত্র ছিল ৬০ গজের সমতুল্য যাতে ৩৬০০ বর্গগজের একখন্ড জমি এক বিঘা পরিগণিত হয়।[২৬] রাজা তোডরমল আনাবাদী জমিও পরিমাপের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে এর উপর রাজস্ব ধার্য করা হতোনা বরং ক্রমাগত আরও পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনার জন্যই এটা করা হয়েছিল, যাতে করে প্রজা সাধারণ এবং সরকার উভয়ই উপকৃত হতে পারে। নতুন ভূমির জন্য প্রথম বছরে কৃষককে সাধারণ রাজস্বের কেবলমাত্র এক পঞ্চমাংশ দিতে হত।[২৭] এক কথায় রাষ্ট্র ও প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করে যে রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন রাজা তোডরমলের এই বন্দোবস্তই ইতিহাসে "ওয়সির তুমার" জমা নামে পরিচিত।[২৮]

---

[২৫] আবুল ফজল, আইনী-ই-আকবরী, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

[২৬] ড.এম.এ রহিম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ১০৯ (অনূবাদিত)

[২৭] আর এইচ কোরেশী আকবর রেভেনিউ রিফর্মর্স, পাকিস্তান হিষ্টিকাল পত্রিকা, প্রথম খন্ড, ৩য় অধ্যায়, ১৯৫৩, পৃ. ২৩৭

[২৮] আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, এইচ ব্লক ম্যান অনূদিত, স্পোইজ পাবলিকেশন পুং মুদ্রন-১৯৮৯, পৃ. ৩৭৭

রাজা তোডরমল সমগ্র বাংলাদেশকে ১৯টি সরকার ৬৭৮ টি পরগনায় বিভক্ত করেছিলেন। বৃহত্তর বিভাগগুলো সরকার এবং ক্ষুদ্রতম বিভাগগুলো পরগনা বা মহাল নামে অভিহিত হত। পরগনার আরবী প্রতিশব্দ মহাল। পঞ্চদশ শতকের বেশ কয়েকটি শিলালিপিতে পরগনার উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং ৩৯টি সরকার গঠন করা হয়েছিল। তন্মোধ্যে সরকার বাজুহার ছিল ৩২টি, পরগনা। সরকার সোনারগাঁওয়ের ছিল ৫২টি পরগনা এবং সরকার ঘোড়াঘাটের ছিল ৮৪টি পরগনা। রাজা তোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রত্যেকটি রাজস্ব হিসাব আবুল ফজল তার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

সরকার	পরগনা / মহাল	দাম
সোনারগাঁও	৫২	১,০৩,৩১,৩৩৩/-
বাজুহা	৩২	৩,৯৫,১৬,৮৭১/-
ঘোড়াঘাট	৮৪	৮,০৮,৩০,৭২-১/২

সরকার বাজুহার অধীনে ছিল বিস্তৃত অঞ্চল। এর পুরু সীমা বর্তমান সিলেট জেলার অংশ পশ্চিমে রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলার অংশ এবং দক্ষিণে বর্তমান ঢাকা শহরের বুড়িগঙ্গা নদীর তীর পর্যন্ত ছিল। বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সরকার সোনারগাঁওয়ের অর্ন্তভূক্ত ছিল।[২৯] ঈসা খান সরকার বাজুহার ১৫টি, সরকার ঘোড়াঘাটের ১টি এবং সরকার সোনারগাঁও এর ৬টি সর্বমোট ২২টি পরগনার অধিপত্য গ্রহণ করেছিলেন। পরগনাগুলোর বিবরণ বেশ কয়েকটি গ্রন্থে এ সবের বিররণ পাওয়া যায়।

নলিনীকান্ত্ম ভট্রাশালীর 'ময়মনসিংহের ইতিহাস' গ্রন্থে কেদারনাথ মজুমদার এবং পুর্ববঙ্গ গীতিকার পালাগানে পরগনাগুলোর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি লক্ষ করার মত যে, ঈসা খানের রাজত্বের সীমা উত্তরে গারোপাহাড়ের পাদদেশে কৈড়বাড়ী থেকে দক্ষিণে চিটাগাং পযর্ন্ত্ম। ১৯টি সরকারের মধ্যে সরকার চিটাগাং একটি। কিন্তু সরকার চিটাগাং এর কোন পরগনা উল্লেখিত বিবরণে দেখা যায় না।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বিহার, উড়িষ্যা এবং বাংলার পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে মোঘলদের বিরুদ্ধে আফগান ও অন্যান্য জমিদারগণ তাদের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য উপর্যুপরি চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

[২৯] কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের ইতিহাস, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ শতবর্ষ পূর্তী স্মারক গ্রন্থ ১৯৮৭, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

তখন ভাটিরাজ্যের অধিপতি ঈসা খান অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ও শান্ত অবস্থায় ভাটিরাজ্যকে সুসংহত করে তুলতে থাকেন। তিনি মোঘলদের সাথে বিরোধে না জড়িয়ে আরো শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতিতে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করেন।

রাজা তোডরমল যখন বিহার, উড়িষ্যা এবং বাংলায় পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেওয়ান পদে নিযুক্ত হলেন তখন বাংলার এই অঞ্চলের মোঘলদের সাথে একটি সন্ধির মাধ্যমে ঈসা খান ভাটিরাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। মূলত এই কারণেই রাজা তোডরমল এই অঞ্চলের রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য ঈসা খানের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে বাংলার রাজস্ব বন্দোবস্ত কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিল বলে মনে হয়না। আর এজন্যই ঈসা খান তার ভাটিরাজ্যের স্বার্থেই রাজা তোডরমলের আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলার রাজস্ব ধার্য করার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন।[৩০]

সেই সময় পরগনাসমূহের মূল্য নির্ধারণ করেছে এইভাবে। ৩২ মহল বা পরগনা সমন্বিত সরকার রাজুহার সরকারী রাজস্ব ছিল ৩৯৫১৬৮৭১ দাম বা ৯৮৭৯২১ টাকা।[৩১]

বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সরকার সোনাগাঁওয়ের অর্ন্তভূক্ত ছিল। এই সরকারের রাজস্ব ১০৩৩১৩৩৩ দাম বা ২৫৮২৮৩ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। ঈসা খান মসনদ-ই-আলা সরকার সোনারগাঁও ও সরকার বাজুহার সর্বমোট ২২টি পরগনার আধিপত্য গ্রহণ করেছিলেন। পরগনাগুলো নিম্নরূপ [৩২] ঃ-

ঈসা খানের বাইশ পরগনা চারটি গ্রন্থে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা পৃথক পৃথকভাবে ছকের সাহায্যে সাজানো হচ্ছেঃ-

ক্রমিক নং	বেঙ্গল এন্ড প্রজেক্ট	ক্রমিক নং	ময়মনসিংহের ইতিহাস	ক্রমিক নং	মংমনসিংহের গেজিটিয়ায়	ক্রমিক নং	পুর্ববঙ্গ গীতিকা
১	আলেপশাহী	১	আলেপ সিং	১	আলেপসিং	১	আলেপসিং
২	মোমেনশাহী	২	মোমেনশাহী	২	ময়মনসিং	২	হোসেনশাহী
৩	হোসেনশাহী	৩	হোসেনশাহী	৩	হোসেনশাহী	৩	মোমেনশাহী
৪	বড়বাজু	৪	বড়বাজু	৪	বড়বাজু	৪	ভাওয়াল

[৩০] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[৩১] আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

[৩২] কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

৫	কাগমারী	৫	মেরউনা	৫	কাগমারী	৫	শেরপুর
৬	আটিয়া	৬	হেরানা	৬	আটিয়া	৬	খালিয়াজুরি
৭	পুকুরিয়া	৭	খারানা	৭	ভাওয়াল	৭	সিংধা
৮	ভাওয়াল	৮	শেরআলী	৮	শেরপুর	৮	নাসিরুজ্জিয়াল
৯	দশকাহনিয়া	৯	ভাওয়ালবাজু	৯	খালিয়াজুরী	৯	দরজীবাজু
১০	জয়েনশাহী	১০	দশকাহনীয়া বাজু	১০	সিংধা	১০	হাজরাদী
১১	খলিয়াজুরি	১১	সায়েরজলকর	১১	নাসিরুজ্জিয়াল	১১	জয়েনশাহী
১২	সিংধা	১২	সিংধা	১২	দরজীবাজু	১২	বরদাখাতমসরা
১৩	দরজিবাজ	১৩	নাসিরুজ্জিয়াল	১৩	হাজরাদী	১৩	স্বর্ণগ্রাম
১৪	নাসিরউজ্জিয়াল	১৪	দরজী বাজু	১৪	জাফরশাহী	১৪	মহেশ্বরদী
১৫	হাজরাদী	১৫	হাজরাদী	১৫	বরদাখাত	১৫	পাইটকারা
১৬	জাফর শাহী	১৬	জাফর শাহী	১৬	সোঁনারগাঁও	১৬	কাতরাবোকুড়িগাই
১৭	বরদাখাত	১৭	বলদাখাল	১৭	মহেশ্বরদী	১৭	মহেশ্বরদী
১৮	সরাইল	১৮	সোনারগাঁও	১৮	পাইটকারা		জোয়ারেন হোসেন
১৯	পাইটকার	১৯	মহেশ্বরদী	১৯	কাতরাবো কুড়িপাই	১৯	জয়েন শাহী
২০	গঙ্গামডল	২০	পাইট কারা	২০	গঙ্গামন্ডল	২০	-
২১	সোনারগাঁও	২১	কাতবারো	২১	জোয়ার হোসেনপুর	২১	-
২২	মহেশ্বরদী	২২	গঙ্গামন্ডল	২২	জয়েনশাহী	২২	-

ঈসা খানের মৃত্যুর দেড়শত বৎসরের মধ্যে তার অধিকারর্ভূক্ত ২২টি পরগনার মধ্যে ১৫টি হস্তান্তরিত হয়ে গিয়াছিল। অবশিষ্ট ৭টি পরগনা তার বংশধরগণের ক্রমবিভাগ অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীতে পরিণত হয়। পরবর্তী শতাব্দিতে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য মুর্শিদাবাদের নওয়াব সরকার ও তৎকালীন ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক এদের অধিকাংশ নিলামে বিক্রিত হয়। উক্ত পরগনা সমূহের হস্তান্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিগত ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ জরিপে ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন আলোচনা তথ্য অনুযায়ী নিম্নে প্রদত্ত হল।[৩৩]

[৩৩] মোঃ মতিউর রহমান, দেওয়ান ঈসা খাঁ- প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩

Dhaka University Institutional Repository

১।*আলেপশাহী* ৫৬০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট। এই পরগনাটি ছিল ঈসা খানের মসনদ-ই-আলার একটি বিশাল পরগনা। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ পশ্চিমে জামালপুরের পেয়ারপুর। পূর্বে ঢাকা ময়মনসিংহ রেললাইন এবং দক্ষিণে ত্রিশাল ও ফুলবাড়িয়া থানা সীমা সম্বলিত এই পরগনাটি নবাব মুর্শিদকুলী খানের সময় ঈসা খানের বংশধরগণের হস্তচ্যুত হয়ে টিকবার জমিদারদের জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত হয়।[৩৪] খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দির শেষভাগে ঈসা খানের বংশধরগণের নিকট হতে এই পরগনা বড়বাজুর চন্দ ও পুটিজনার রায় পরিবারের হস্তগত হয়। নওয়াব আলীবর্দী খাঁর শাসনকালে (১১৩২-৩৩ বঙ্গাব্দ) মুক্তাগাছার বর্তমান জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য পুটিজনার রামচন্দ্র ও ভবানী রায় হতে পরগনার ছয় আনা অংশ ও লোকিয়া গ্রাম নিবাসী বিনোদরায় চন্দ্র হতে অবশিষ্ট দশ আনা অংশ ক্রয় করেন।[৩৫] ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ বন্দোবস্থ সময়ে এ পরগনার মোট আট আনার হিস্যার চার আনা শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের বংশধর শ্যাম কিশোর আচার্য এবং চন্দ্রকিশোর আচার্য লাভ করে। বাকি চার আনা অংশ কৃষ্ণকিশোর আচার্য লাভ করেন। বাকি চার আনা অংশ কৃষ্ণকান্ত আচার্য্যের বিধবা পত্নী গঙ্গাদেবী এবং রুদ্রোরাম আচার্য মালিক হন। ঈসা খানের অধঃস্তনগণ[৩৬] বলেছেন, পুটিজনার রামচন্দ্র মঙ্গলবাড়ি ষ্টেটের[৩৭] তহশিলদার ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দির শেষভাগে ষড়যন্ত্র করে এই পরগনাটি নবাব সরকার থেকে তাদের নামে নামজারি করে নিয়ে আসে।[৩৮] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই পরগনার সদর জমা ৬৫৩৯৩ টাকা ধার্য্য হয়। এর পরিমান ছিল ৫১০.২৪ বর্গমাইল।[৩৯]

২।*মোমেনশাহী*

এই পরগনাটি আলেপশাহী পরগনা থেকেও অনেক বড় ছিল। আয়তন ছিল ৬০৪ বর্গমাইল। গ্রামের সংখ্যা ছিল ১১৪২ টি। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পাড় থেকে বৃহত্তর সিলেট জেলার সীমা পর্যন্ত এই পরগনার পরিধি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দিতে মোমেনশাহী পরগনা টিকবার জমিদারদের হস্তগত হয়। নবাব আলীবর্দী খানের সময় তার রাজস্ব কর্মচারী শ্রীকৃষ্ণ আচার্য এই পরগনাটি হস্তগত করেন। এরপর এ পরগনাটির অংশ বিশেষ গৌরীপুর, গোপালপুর, ভবনপুর, গোলাকপুর, কাসীপুর, কৃষ্ণপুর,

---

[৩৪] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

[৩৫] মোহাম্মদ মতিউর রহমান, দেওয়ান ঈসা খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[৩৬] ঈসা খানের ১৫তম অধঃস্তন মরহুম দেওয়ান সাত্তারদাদ খান এই তথ্য জানান

[৩৭] জঙ্গলবাড়ি ছিল ঈসা খানের দ্বিতীয় রাজধানী ঈসা খান-এর ৪র্থ অধঃস্তন পুরুষ মাসুম খান এখানেই বসবাস করেন

[৩৮] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

[৩৯] মোহাম্মদ মতিউর রহমান, দেওয়ান ঈসা খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

বাসাবাড়ী, ডৌহাখলা এবং অন্যান্য এলাকার জমিদারগণের হস্তগত হয়। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ জেলা বন্দোবস্তের সময় ও পরগনার প্রথম চার আনা অংশ মুক্তগাছার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্র কিশোর রায়ের বিধবা পত্নীদ্বয় রতন মালা ও নবায়ণদেবীর সাথে, দ্বিতীয় চার আনা অংশ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর ২য় পুত্র গঙ্গানারায়ণ রায়ের পুত্র হরনাথ রায়ের সাথে এবং ৪র্থ চার আনা হিস্যা হরনারায়ণের দুই বিধবা পত্নীর সাথে বন্দোবস্ত হয়। বিট্রিশ শাসন আমলে গৌরীপুরের জমিদার ঐ জমিদারির চার আনা আড়াই গন্ডা অংশ, রাম গোপালপুরের চার আনা অংশ ও ভবনীপুর গোলোকপুর, কাসীপুর, কৃষ্ণপুর, বাসাবাড়ী, ধনকুড়া, ডৌহাখলা ও মুক্তগাছার জমিদারগণ অবশিষ্ট অংশের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ১৮৫০ সালের জরিপ নকসায় এই পরগনার জমি ৩.৮৬৪১৬ একর ২ রোড ১৫ পোল।[৪০] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জাফরশাহী পরগনাসহ এর সদর জমা ১২৩৬০৬ টাকা ধার্য্য হয়। মোমেনশাহী পরগনার পরিমাণ ৬০৩৭৮ বর্গমাইল।[৪১]

৩।*হোসেনশাহী*

বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নামের এই পরগনাটির আয়তন ছিল ৩২৫.৪৩ বর্গমাইল। ঈসা খানের মৃত্যুর পর তার জনৈক পরিষদ পরগনাটি হস্তগত করেন। ঐ পরিষদের বংশধরগণ বেত্রাটির[৪২] দেওয়ান বংশ বলে পরিচিত। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ তোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় এই পরগনার রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল ১৮২৭৫৪০ দাম। অষ্টাদশ শতাব্দিতে নাটোরের রাজবংশ এ পরগনা হস্তগত করে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ এ পরগনা খাজে আয়াতুন নামে একজন আর্মেনীয় ক্রয় করেন। ঐ সময় এই পরগনাটি রাজশাহীর কালেক্টরের অধীনে ছিল। খাজে আয়াতুন এই পরগনাটি ক্রয় করার পর রাজশাহীর কালেক্টরেট থেকে এই পরগনাটি ময়মনসিংহ কালেক্টরেটের অধীনে আনা হয়। আয়াতুনের মৃত্যুর পর তার পুত্র কন্যাদের মধ্যে এই জমিদারি বিভক্ত হয়ে যায়। তার পুত্র কন্যাদের মধ্যে বিবি কোথারিনা বিবি এজিনা, স্টিফেন্স ও কোস পার্জের সঙ্গে জমিদারীর চার আনা অংশ সমান ভাগে ভাগ হয়। এরপর আবার বাড়ীর জমিদার শম্ভুনাথ কেসপার্জের অংশ ক্রয় করেন।

মোহিনী মোহন রায় ক্রয় করেন কোথারিনের অংশ। মিস এজিনার অংশ এবং এটি ন্টিফেন্সের অংশ ক্রয় করেন নীলকর ওয়াইজ ও গোবিন্দ দত্ত। ওয়াইজ সাহেব, যখন এদেশ থেকে

---

[৪০] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬

[৪১] মোহাম্মদ মতিউর রহমান, দেওয়ান ঈসা খা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[৪২] বেত্রাটি কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল থানার একটি গ্রাম বেত্রাটির জমিদারগণ সম্ভবত ঈসা খানের মর্জলিশ জালালের অধঃস্তন ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

চলে যান তখন তার জমিদারি মুক্তাগাছার রামকিশোর আচার্য চৌধুরী এবং কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর থানা গাঙ্গাটিয়ার দ্বীননাথ চক্রবর্তী কটিয়াদী থানা মসুয়ার গ্রামের জমিদার হরকিশোরায় এবং বাজিতপুর থানার সরাচরের জমিদার জয়গোবিন্দ রায় এবং ইংরেজী নীলকর টি কেলানোজ ক্রয় করেন। এই পরগনার গ্রাম সংখ্যা ছিল ৭০৭ টি। নলিনীকান্ত ভট্টাশালী বলেন, হোসেন শাহী পরগনার সাথে জোয়ার[৪৩] হোসেনপুর অন্তর্ভূক্ত ছিল। জোয়ার হোসেনপুরের আয়তন ছিল ১৩৬.৩৬ বর্গমাইল। হোসেনশাহী এবং জোয়ার হোসেনপুরের মিলিত আয়তন ৪৬২ বর্গমাইল।

মতিউর রহমান 'দেওয়ান ঈসা খাঁ' গ্রন্থে বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উক্ত পরগনার সদর জমা ৪৫৪৫৭.৯৪ টাকা ধার্য হয়। যার পরিমাণ ফল ৩২৫.৪৩ বর্গমাইল।[৪৪]

৪।*বড়বাজু*

সরকার বাজুহা অন্তর্গত মহালগুলোর মধ্যে বড়বাজুই সর্বপেক্ষা বৃহৎ বাজু ছিল। ক্লথম্যান, বাজুর বহুবচন থেকে বাজুহার নামের উৎপত্তির কথা বলেছেন। রাজা তোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় কাগমারী ও আতিয়া এই বাজুর অন্তর্গত ছিল। আয়তন ছিল ৮৪ বর্গমাইল গ্রাম সংখ্যা ছিল ৬৬৯ টি।

465925

৫।*কাগমারী*

সরকার বাজুহার অন্তর্গত মহালগুলোর মধ্যে বড়বাজুই সর্বপেক্ষা বৃহৎ বাজু ছিল। বড়বাজু দু'ভাগে বিভক্ত হয়, যার একটির নাম কাগমারী। রাজা তোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় কাগমারী ও আতিয়া এই বাজুর অন্তর্গত ছিল।

৬।*আতিয়া*

বড়বাজু দু'ভাগে বিভক্ত হয়, যার একটির নাম আতিয়া। রাজা তোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় কাগমারী ও আতিয়া এই বাজুর অন্তর্গত ছিল। আয়তন ছিল ৮৪ বর্গমাইল গ্রাম সংখ্যা ছিল ৬৬৯ টি। করটিয়ার জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ সাঈদ খান পন্নিকে পরগনার যে অংশ মোঘল সম্রাটের পক্ষ থেকে জয়গীর প্রদান করা হয়েছিল সেই অংশটি আতিয়া নামে পরিচিত। ঈসা খানের বংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই বড়বাজু পরগনাটি তাদের হস্তচ্যুত হয়। বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার জমিদার আবজাল মোহাম্মদের পূর্বপরুষগণ এই পরগনাটি হস্তগত

---

[৪৩] তারা বোয়াইল বাড়ি থেকে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। পরগনার অন্তর্গত বিভাগ বিশেষ।

[৪৪] মোঃ মতিউর রহমান, দেওয়ান ঈসা খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

করেন। কথিত আছে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ এ পরগনার ছয় আনা অংশ সিরাজ আলী চৌধুরী এবং ১০ পয়সা অংশ হরিব্রজরায় ও শীবনাথ হস্তগত করেন।

সম্রাট শাহজাহানের সময় সুপ্রসিদ্ধ দরবেশ হযরত শাহ-ই-জামাল মাহিসওয়ার (র.) কাগমারী পরগনাটির জায়গীর প্রাপ্ত হন। হযরত শাহ-ই-জামাল এ জায়গীর তার একান্ত অনুসারী বাকল গ্রামের যার্দবেন্দ্র রায়ের হাতে ন্যাস্ত করেন। অতঃপর যাদবেন্দ্র রায়ের পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এনায়েত উল্লাহ (চৌধুরী) নাম ধারণ করে এই অংশের জমিদারি গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, এনায়েত উল্লাহ খান হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কায় গমন করলে সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে তার ভ্রাতৃস্পুত্র বিশ্বনাথরায় বিশ্বসঘাতকতা করে এনায়েত উল্লা খানের পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করে জমিদারি হস্তগত করে। এই বিশ্বনাথরায়ের বংশধরেরা সন্তোষ ও আলোয়ারের জমিদার ছিলেন।[৪৫]

৭। *পুখুরিয়া*

ঈসা খানের সময় এই পরগনাটি পুখুরিয়া বাজু নামে পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দিতে এই পরগনা ধনবাড়ীর জমিদার ইস্পিঞ্জর খান এবং মনোহর খানের অধিকার থেকে নাটোরের মহারাজাদের হস্তগত হয়। এ প্রসংগে কেদারনাথ মজুমদার বলেন, পুখুরিয়া পরগনার ভূমি সম্বন্ধীয় যে সকল প্রাচীন দলিল দেখা যায় তাতে বোধহয় তৎকালে পুখুরিয়া গড়ের পশ্চিমাংশ ইস্পঞ্জর খান, মনোহর খান এবং পূর্বাংশ সীমলা নিবাসী কৃষ্ণ জীবনরায় ও জীও জীবনরায়ের অধীনে ছিল[৪৬]। নাটোরের মহারাজারা ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পরগনাটি ভোগ করেন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ এই পরগনা নিলামে উঠে। ঐ সময় পুঠিয়ার রাজা ভুভেন্দ্র নারায়ণ ৬২.১০০ টাকা মূল্যে পরগনাটি ক্রয় করেন।[৪৭] এই পরগনার আয়তন ৪৩৭.২৯ বর্গমাইল, গ্রাম সংখ্যা ছিল ৯৪৯ টি।

---

[৪৫] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

[৪৬] কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, জেলা পরিষদ ময়মনসিংহ ১৯৮৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[৪৭] (মূল দলিলটি ফার্সি ভাষায় লিখিত ছিল) বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল, বহুল সম্মানিত সাকাউন্সিল গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের হুকুম অনুসারে বোর্ড অব রেভিনিউর সম্মানিত মেম্বারগণ রাজশাহী প্রভৃতির জমিদার মহারাজা রামকৃষ্ণের জমিদার জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত পর পুখুরিয়া যাহার সরকারী রাজস্ব নিম্ন তপছিলের লিখিত মত মং ৭০৬৭২২৯১০ সভা বটে। বাং ১৩৯৯ সনের সরকারের বাকি রাজস্ব আদায়ের জন্য ১৭৯৪ সনের ৪ঠা জুন কলিকাতা মোকামে বোর্ড অব রেভিনিও আদালতে বোর্ডের সেক্রটারী সাহেবের হুজুরে নীলাম হল। (মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৮।*ভাওয়াল বাজু*

এই ভূ-ভাগ পূর্বে ফজল গাজীর অধিকারভূক্ত ছিল। সম্রাট আকবর অন্যান্য পরগনাসমূহ এই পরগনাও ঈসা খানকে প্রদান করেন। পরগণা ভাওয়াল যা বর্তমানে ঢাকা জেলার অন্তর্ভূক্ত, তা ঈসা খানের হস্তগত হয় নি। ফজলগাজীর বংশধরগণ ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ভাওয়ালের অধিপতি ছিলেন। অতঃপর জয়দেবপুর, গাছী, বলধা ও কাশিমপুরের জমিদারগণের পূর্ব পুরুষগণের উহা হস্তগত করে।[৪৮] তপ্পা রণভাওয়াল ভাওয়াল পরগনার অন্তর্গত ভাওয়াল বাজু নামে পরিচিত। আলেপশাহী পরগনার দক্ষিণসীমা থেকে বৃহত্তর ঢাকা জেলার উত্তরসীমা পর্যন্ত এবং আতিয়া পরগনার পূর্বসীমা পর্যন্ত ছিল এ পরগনার অবস্থান। ষোড়শ শতাব্দিতে এ পরগনার ক্ষমতাসীন ছিলেন ভাওয়ালের গাজী বংশের ফজলগাজী। জেমস ওয়াইজ বলেছেন, খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দিতে ও গাজীবংশের প্রতিষ্ঠাতা পাহলোয়ান শাহের পুত্র কায়েম খান দিল্লীর সুলতানের পক্ষ থেকে জায়গীর লাভ করে এ পরগনার অধিপ্রত্ব গ্রহণ করেন এবং লক্ষ্য ছিল নদীর তীরে তার আবাসস্থল নির্ধারণ করেন।[৪৯] ঈসা খান মসনদ-ই-আলা এ পরগনার উত্তরাংশ অধিকার করেছিলেন। ভাওয়াল পরগনাতে ঈসা খানের সাথে মোঘলদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফলে এ পরগনাকে রণভাওয়াল নামেও অভিহিত করা হয়েছে। ঈসা খানের মৃত্যুর পর তার পরবর্তী বংশধরগণ ভাওয়ালকে আলেপশাহী পরগনার অন্তর্ভূক্ত করে নেন। অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথম ভাগে নবাবী আমলের কাগজ পত্রে রণভাওয়ালকে আলেপশাহী তপ্পা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরগনার আয়তন ছিল ৩১৮.০৩ বর্গমাইল। গ্রাম সংখ্যা ছিল ২৭৮ টি।[৫০]

৯।*দশকাহনীয়*

এই পরগনাটি আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দশকাহনীয়া বাজু শেরপুর নামে অভিহিত হয়েছে। কথিত আছে যে, ব্রহ্মপুত্র নদের প্রশস্ত এর ব্যাপক ছিল যে, পারাপারের দশকাহন কড়ি নির্ধারিত ছিল। পারাপারের মাশুলের পরিমাণ থেকেই এই বিস্তৃত মহাল দশ কাহনীয়া নামে পরিচিত। সুলতানী আমলে এই পরগনাটি কোচ সামন্ত রাজা দলিপের অধীনে ছিল। বাংলার সুলতান দ্বিতীয় ফিরোজশাহের সময় তার পূর্বাঞ্চলের শাসক মজলিশ খান হুমায়ুন দলিপ সামন্তকে পরাজিত ও নিহত করে এই অঞ্চলে অধিকারভূক্ত করেন। এরপর ঈসা খানের অধিকারভূক্ত হয় ষোড়শ শতাব্দির

[৪৮] মোনাওর খানের বংশধর ইটনা ও অষ্টগ্রামের দেওয়ানগণের বংশ তালিকা, গবেষণার শেষ অধ্যায়ে প্রদত্ত হল

[৪৯] কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, প্রাগুক্ত. পৃ. ৯

[৫০] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৮

শেষভাগে। ঈসা খানের মৃত্যুর পর গাজীগণ কর্তৃক হস্তগত হয়।[৫১] শেরআলী গাজী মৃত্যুর পর এই পরগনা বায়নাথ নন্দীর হস্তগত হয়। খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগে নন্দী ও দাসবংশীয় জমিদারগণের মধ্যে এই পরগনা বিভক্ত হয়। বর্তমানে শেরপুর মুক্তাগাছা ও কালীপুরের জমিদারগণ এই পরগনার মালিক। এর সদর জমা বার্ষিক ২৪৪৭৪.১৯ টাকা ধার্য আছে। যার পরিমান ৭৮৯.২৫ বর্গমাইল।[৫২] সপ্তদশ শতাব্দি পর্যন্ত এই পরগনা সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথমভাগে এই পরগনা চাকলে কড়ে বাড়ীর অধীনে নীত হয়। এই পরগনার গ্রাম সংখ্যা ছিল ৭৪৫টি। শেরপুর জেলাটি এর অন্তর্ভূক্ত।

১০। *জয়েনশাহী*

আই-ই-আকবরী গ্রন্থে জয়েনশাহী নামে পরগনাটির নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবত তৎকালে এই পরগনাটি সায়র জলকর মহালের অর্ন্তগত ছিল।[৫৩] বাংলায় হোসেনশাহী সালতানাতের সময় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র জয়েন আহম্মদ শাহের নামে এই পরগনার নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। আফগান শাসনামলে মনোয়ার খান নামক একজন আফগান এই পরগনার শাসনভার গ্রহণ করেন। ঈসা খানের সময় মনোয়ার খানের ৬ষ্ঠ অধঃস্তন দেলওয়ার খান এই পরগনার শাসনকর্তা ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ঈসা খানের একজন অন্যতম মজলিশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তার পরগনাটি ঈসা খানের নিয়ন্ত্রাধীনে চলে আসে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এই পরগনাটির কর্তৃক ঈসা খানের মজলিশ দেলওয়ারের পৌত্র জালাল খান ও ফতেহ খানকে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে একটি ফারসি ভাষায় লিখিত সনদ কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ বাংলার নবাব সরকারের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ মনোহর আলী ও নূর হায়দারের সাথে এ পরগনার বন্দোবস্ত হয়। ১২০৩ বাংলা সনে হায়দারের অংশ, যা নয় কোষা[৫৪] নামে পরিচিত

---

[৫১] কেদারনাথ মজুমদার ময়মনসিংহের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন যে, ঈসা খানের ১২ জন পরিষদ ছিল তন্মধ্যে চারজন গাজী ও চারজন মজলিশ বংশীয় ছিল। ঈসা খানের মৃত্যুর পর গাজীগণ শেরপুর ও ভাওয়াল পরগনা এবং মজলিশগণ নাসিরুজ্জিয়াল অধিকার করে নেন, ময়মনসিংহের ইতিহাস ময়নসিংহ জেলা পরিষদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

[৫২] মোহাম্মদ মতিউর রহমান-দেওয়ান ঈসা খা- প্রাগুপ্ত,পৃ. ৩৬।

[৫৩] কেদারনাথ মজুমদার ময়মনসিংহের ইতিহাস, প্রাগুক্ত. পৃ. ১৭

[৫৪] পরগনা জয়েন শাহীর অঙশ নরকোষা নামে পরিচিত হবার পেছনে ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। সুলতানী আমল ও তৎপরবর্তীকালে এই মহালের নির্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত নির্দিষ্ট সংখ্যক যুদ্ধোপযোগী কোসা বা নৌকা সুলতানের অনুকূলে প্রদান করা হত। যে পরগনা যত সংখ্যক কোষা প্রদানের জন্য দায়ী থাকত সেই পরগনা তত সংখ্যক কোষী বা কোষা বলে পরিচিত ছিল। এই কোষা প্রদানের জন্য যে, পৃথক কর ধার্য থাকত তার নাম ছিল নওয়াব

Dhaka University Institutional Repository

তা রামসুন্দর নামে একজন ক্রয় করেন। এই পরগনার আয়তন ছিল ২৪৬.৪৪ বর্গমাইল এবং গ্রাম সংখ্যা ১৪৬টি।

১১। *খালিয়াজুরী*

খালিয়াজুরী পরগনাটি মূলত ভাটি নামে পরিচিত ছিল। এক সময় এখানে কামরূপ রাজ্যের রাজধানীও ছিল। চতুর্দশ শতাব্দির মধ্যভাগে জীতারী নামে কোন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী কর্তৃক এই অঞ্চল অধিকৃত হলে তা কামরূপ রাজ্যের শাসনকেন্দ্র হয়।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ঈসা খানের প্রথম জীবনে এই ভাটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভাটি মহাল এককালে সরকার বাজুহার জলকর মহালের অন্তর্গত ছিল। ঈসা খানের মৃত্যুর পর এই পরগনা ঈসা খানের মজলিশগণের হস্তগত হয়। অল্পকাল পরে মজলিশদের হাত থেকে হোমবংশের[৫৫] শাসনাধীনে চলে যায়। এরপর তেকে ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ পর্যন্ত তারাই এই পরগনাটি শাসন করেন। এই পরগনার আয়তন ছিল ১৩০ বর্গমাইল। কেদারনাথ বাবু বলেছেন, এই পরগনার আয়তন ছিল ২৬৭.৪৬ বর্গমাইল। গ্রাম সংখ্যা ছিল ১৪৬টি।[৫৬] ধনু নদীর উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত এই পরগনাটির উত্তর পূর্ব দিকে সিলেট দক্ষিণে জয়েনশাহী ও পশ্চিমে ছিল নাসিরুজ্জিয়াল পরগনা। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ বঙ্গাব্দে মালিকগণ ঋণদায়ে একত্রে জমিদারীর অর্ধাংশ খাজা ওয়ালেস নামক জনৈক আর্মেনিয় বণিকের নিকট ৫০০১.০০ টাকায় বিক্রি করেন।

জমা। বাদশাহী আমলে পরগনা যখন শাহীর নওয়ারা থেকে সৈন্য পরিচালনা উপযোগী কুড়িখানা কোষা রক্ষিত হয়। আর এই কুড়ি খানা কোষা প্রদানের ভার ছিল বলে নবাবি কাগজ পত্রে এই পরগনার নাম কুড়ি কোষা ছিল। পরে এই পরগনা দুটির মালিক বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় সাড়ে নয় কোষা সাড়ে দশ কোষা নামে অভিহিত হতে থাকে। পরবর্তী সাড়ে লোপ পেয়ে নয় ও দশ কোষা নামে পরিচিতি লাভ করে।

[৫৫] এই তথ্যাটি দেকারনাথ মজুমদার রচিত ময়মনসিংহের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে হোম অংশ আরো বংশ করা এ সম্পর্কে কোন পরিচয় দেওয়া হয়নি। তবে ধারণা করা যায় যে, এই পরগনায় যখন কামরূপ রাজ্যের রাজধানী গৌহাটি থেকে স্থানান্তর করা হয়, তখন জিতাবী নামে একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এরপর আরো একজন রাজার নাম পাওয়া যায় যিনি জলপেশ্বর হোম নামে পরিচিত। সম্ভবত ঐ জলপেশ্বর হোমের অধঃস্তন পুরুষগণ পরবর্তীকালে হোমবংশের লোক বলে পরিচিত লাভ করে।

[৫৬] কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

১২।*সিংধা*

এই পরগনাটি হোসেন শাহীর একটি তপ্পা[৫৭] হিসেবেই পরিচিত ছিল। বর্তমান নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা আটপাড়া ও কেন্দুয়া নামা এলাকা নিয়েই এই তপ্পার অবস্থান ছিল। ঈসা খানের মৃত্যুর পর এ পরগনাটি বিভিন্ন জমিদার হস্তগত করেন। এরপর নবাব আলীবর্দীর সময় কৃষ্ণচন্দ্র আচার্য পরগনা মোমেনশাহী অধিকার করলে এই পরগনাটিও তার অধিকারভূক্ত করেন।[৫৮]

১৩।*দরজীবাজু*

এই পরগনাটি কিশোরগঞ্জ জেলা সদর শহরের মাঝামাঝি স্থান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে ধলেশ্বরী নদীর পূর্ব পাড়ের এলাকাসমূহ নিয়ে অবস্থিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথমদিকে এই পরগনাটি ঈসা খান-এর অধিনস্তদের হাতেই ছিল। পরবর্তী সময়ে ঢাকার নবাবেরা পরগনাটি খরিদ করলেন।[৫৯]

১৪।*নাসিরুজ্জিয়াল*

পরগনাটি প্রথমে নূসরত ও জিয়ান নামে পরিচিত ছিল। বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কামরূপ অধিকার করার পর এই অঞ্চলের শাসনভার তার পুত্র নাসির উদ্দীন নূসরত শাহের হস্তে প্রদান করেন। নূসরত শাহ কামরূপ থেকে বিতাড়িত হলে এই পরগনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এখান থেকেই তার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ঐ সময় এই অঞ্চল নূসরত শাহী প্রদেশ বলে পরিচিত ছিল। সম্রাট আকবরের সময়ও সমগ্র ময়মনসিংহকে নূসরত শাহী নামে অভিহিত করা হত। যার পরিপ্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত ময়মনসিংহকে নাসিরাবাদ নামে অভিহিত করা হয়।[৬০] ঈসা খানের মৃত্যুর পর এই পরগনাটি তার পরিষদ মজলিশ জালালালের[৬১] হস্তগত করেন। তাদের মধ্যে আধারমানিক, নওয়াপাড়া, মুক্তাগাছা কোয়াটি, কৃষ্ণপুর,

---

[৫৭] রাজস্ব বন্দোবস্তের পরে নামকরণকৃত পরগনাকে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ঐ পরগনার অন্তর্গত মহালকে বিভক্ত করে যে নতুন প্রশাসনিক মহাল সৃষ্টি করা হতো তাকে তপ্পা বলে অভিহিত করা হতো।

[৫৮] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

[৫৯] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ঈসা খাঁন, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭১

[৬০] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁন, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭১

[৬১] বর্তমার কেন্দোয়া থানার বোয়াহুর বাড়ীর বিখ্যাত আফগান জমিদার মজলিস জালালের আবাসবাটির ভগ্নস্তুপ এখনও বিদ্যমান। কিছুদিন পূর্বে মাটি খনন করে তার প্রবাদ বাটি ও একটি বার দোয়ারী মসজিদসহ বেশ কিছু দালান কোটা অধিকার করা হয়েছে আঠারবাড়ী রেলষ্টেশন থেকে বোয়াইল বাড়ীর দূরত্ব ৫কি, মিটার

Dhaka University Institutional Repository

ভবানীপুর, আঠারবাড়ী, ধনকুড়া প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ এই পরগনা শাসন করেন।[৬২] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই পরগনার রাজস্ব ২০০৮৬.৯৪ টাকা ধার্য হয়। এর পরিমাণ ছিল ১৯৪.১৬ বর্গমাইল।[৬৩] গ্রাম সংখ্যা ২৮৪টি।

১৫।*হাজরাদী*

রাজা তোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় হাজরাদী সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল না। ঐ সময় পরগনাটি সুসং রাজ্যের অধীন ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, সুসং রাজ জানকিনাথ মল্লিক তার বংশের লক্ষণ হাজরাকে জঙ্গলবাড়িতে শাসন কেন্দ্র স্থাপন করে হাজরাদি অঞ্চল শাসন করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ঈসা খান এই পরগনাটি দখল করেন। এবং তার নাম রাখেন হাজরাদী পরগনা। এই পরগনাটি দশশালা বন্দোবস্তের সময় পর্যন্ত ঈসা খানের বংশধরগণ কর্তৃক শাসিত হয়েছিল। এই পরগনার শাসনকেন্দ্র ছিল জঙ্গলবাড়ি এখানেই স্থাপন করা হয় ঈসা খান-এর দ্বিতীয় রাজধানী। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ দিকে ঈসা খান-এর অধঃস্তনগণ এই পরগনার জমিদারি রক্ষা করতে অসমর্থ হলে জমিদারি ইস্তফা দেন। এই পরগনার আয়তন ছিল ৩২২ বর্গমাইল। বার্ষিক কর ধার্যের পরিমাণ ছিল ৩৫২৯.৪৪ টাকা। গ্রাম সংখ্যা ছিল ৪০০টি।[৬৪]

১৬।*জাফরশাহী*

জাফর শাহী পরগনা রাজা তোডরমলের সময় সরকার ঘোড়াঘাটের অধীন ছিল। এই পরগনার অধিকাংশ বর্তমানে রংপুর জেলায় অবস্থিত। ঈসা খানের মৃত্যুর পর রাজস্ব আদায়ের জন্য তার অযোগ্য বংশধরগণের নিকট হতে এ পরগনা হস্তান্তরিত হয়ে যায়। নওয়াব আলীবর্দী খার কর্মচারী শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী মোমেনশাহী পরগনাসহ একত্রে এই পরগনারও জমিদারী সনদ লাভ করেন। এর পরিমান ২৫৩.৬১ বর্গমাইল গ্রামের সংখ্যা ৩৯৯টি।

১৭।*বরদাখাত*

এই পরগনাটি তপ্পা কুড়িখাই নামে ঈসা খানের শাসনাধীন ছিল। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব বাজার এলাকা ছিল এই পরগনার মধ্যবর্তী অঞ্চল। প্রাচীন ত্রিপুরায় ৩৬ মাইল পর্যন্ত ছিল এই পরগনার অংশ। ঈসা খানের অধঃস্তনগণের মধ্যে যখন এই পরগনাটির বিভিন্ন অংশ বন্টন করা হয় তখন পরগনায় একটি তপ্পা কুড়িখাই নামে পরিচিত লাভ করে। অতঃপর ঈসা খানের পঞ্চম অধঃস্তন দেওয়ান আদখান বিভাগ অনুসারে কুড়িখাইয়ের সম্পূর্ণ অংশ ওয়ারিশানা সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে জঙ্গলবাড়ি

---

[৬২] এই জমিদারগুলোর বেশীরভাগ বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ গৌরিপুর এবং সদর থানার অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন স্থানে আবস্থিত।

[৬৩] মোহাম্মদ মতির রহমান, প্রাগুক্ত,, পৃ. ৪১

[৬৪] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

ত্যাগ করেন এবং ভাগলপুরের[৬৫] এলে বসবাস করেন। পরবর্তীকালে রাজস্ব প্রদানে ক্রটির কারণে নবাব সরকারের আদেশে এই পরগনাটি খাস হয়ে যায়। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠার পর জেলার কালেক্টর মুহাম্মদ ঘোসীর সাথে এই মহালের বন্দোবস্ত হয়। এরপর পুনরায় এই মহাল ভাগলপুরের দেওয়ানদের হস্তগত হয়।

১৮।*সরাইল*

সরাইল অঞ্চলটি সাত্তার খান্দাল নামে পরিচিত। পরগনাটি জায়েনশাহী পরগনার অংশ ছিল বলে ধারণা করা যায়। ঈসা খানের পিতার সোলায়মান খান সর্বপ্রথম এই পরগনায় ক্ষমতাশীন হন এবং এখান থেকেই ভাটিরাজ্যের অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ঈসা খান ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ এই সরাইল থেকেই তার জমিদারি শুরু করেন। সরাইল মেঘনা ও তিতাস নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অস্থীতি। নলিনীকান্ত ভট্রাশালী বলেছেন, এই পরগনার দৈর্ঘ ২৬ মাইল এক গ্রন্থ ছিল ১৩ মাইল।[৬৬]

১৯।*পাইটকারা*

ঈসা খানের একটি ছোট পরগনা যা কুমিল্লা শহর থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। পরগনাটির উত্তরে ময়নামতি পাহাড় এবং দক্ষিণে লালমাই পাহাড় অবস্থিত। ১২ বর্গমাইল দৈর্ঘ এবং ১২ মাইল প্রস্থের এই পরগনাটির বিস্তারিত বিবরণ এখন আর পাওয়া যায় না। তবে ঈসা খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুসা খানের সময় পর্যন্ত ও এই পরগনা তাদের অধীনে ছিল। পাইটকারা ছিল প্রাচীন একটি রাজবংশের প্রধান শহর।[৬৭]

২০।*গঙ্গামন্ডল*

পাইটকারার লাগাতার উত্তর দিকেই গঙ্গমন্ডল পরগনাই অবস্থিত ছিল। বরদাখাত পরগানার দক্ষিণ দিকে গঙ্গামন্ডলের অবস্থান ছিল। নলিনীকান্ত ভট্টাশালী এই পরগনাটি সম্পর্কে আর কোন তথ্য উপস্থাপন করেননি।

২১।*সোনারগাঁও*

সোনারগাঁও ছিল বাংলার প্রাচীন রাজধানী। এই পরগনার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যথাক্রমে মেঘনা ও লক্ষানদীর অবস্থান। উত্তরে মহেশ্বরদী পরগনাটিকে বিভক্ত করেছে লক্ষ্যা নদীর মাধ্যমে। এই পরগনার সর্ববৃহৎ তপ্পা হচ্ছে তবে কাতরাবো। এইচ ভেবারিজ বলেছেন, কাতবাবো বর্তমান

---

[৬৫] বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর থানার সদর থেকে সামাণ্য কিছু পশ্চিমে ভাগলপুর অবস্থীত। ভাগলপুরের দেওয়ানরা দেওয়ান আদম খানের অধঃস্তন বংশধরগণ

[৬৬] নলিনীকান্ত ভট্রাশালী, ভল্যুম৩৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৬৭] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

মানিকগঞ্জ জেলায় খিজিরপুরের অপর দিকে লক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে এটি তপ্পা।[৬৮] জেমন ওয়াইজ বলেছেন কাতবারো হচ্ছে খিজিপুরের অপর দিকে লক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত একটি তপ্পা।[৬৯] এখানেই ঈসা খানের সর্বপ্রথম ২২টি পরগনাকে নিয়ে তার রাজত্বের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। নদী বেষ্টিত স্থান হিসেবে সোনারগাঁও পরগনাটি একটি সুরক্ষিত স্থান বলে প্রাচীন যুগ থেকেই পরিচিত। এই পরগনার আয়তন ছিল ৬৬ বর্গমাইল।

২২।*মহেশ্বরদী*

সরকার সোনারগাঁওয়ের অধীনে যে সমস্ত পরগনা ঈসা খানের হস্তগত হয়েছিল তন্মধ্যে বর্তমান নরসিংদী জেলার সমগ্র অঞ্চলকে নিয়েই মহেশ্বরদী পরগনা গঠন হয়েছিল। মহেশ্বরদীর প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল নগর মহেশ্বরদী গ্রামে। বর্তমান শিবপুর থানার নগর মহেশ্বরদী গ্রাম এখনও বর্তমান। নগর মহেশ্বরদী গ্রামের কাছেই ঈসা খানের একটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা ছিল, স্থানটির নাম গড়বাড়ি।[৭০]

এই পরগনার আয়তন ১১২ বর্গমাইল। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ বাংলায় সুবেদার ছিল জুমলা তার কনিষ্ঠ কন্যা বিবি জয়নবকে ঈসা খানের ৫ম অধঃস্তন পুরুষ দেওয়ান শরীফ খানের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে জামাতাকে মহেশ্বরদী পরগনার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে মহেশ্বরদী পরগনায় বেশ কয়েকটি ছোট ছোট জমিদারি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এদের মধ্যে রাজা পাদোনার জমিদার রাজনারায়ণ রায় ও মাঠবদীর জমিদার মুন্সি বিশ্বনাথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

উপরে যে ২২টি পরগনার আলোচনা করা হয়েছে ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা এই পরগনাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত রাজ্যটি অধিকার করেছিলেন তার আসাধারণ প্রতিভা বলে। অন্যদিকে রাজা তোডরমল এই ২২টি পরগনায় যে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেছিলেন তার পার্থক্য সুফল ঈসা খান পেয়েছিলেন। সরকার বাজুহার সরকার সোনারগাঁওয়ের ও সরকার মোড়াঘাটে সর্বমোট ২২টি পরগনার সকল জমিদারদারদের কাছ থেকে ন্যায় কার্যকর নীতির ভিত্তিতে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ঈসা খান এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণ কৃষকদের জন্য কর ধার্য্য করেছেন খুবই কম হারে। কণিক্ষেত লাগিত চৌধুরী বুড়ি এই প্রবাদ বাক্যটি ঈসা খানের আমলেই উৎপত্তি ঘটেছিল।

---

[৬৮] এইচ বেভারিজ অন, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-৩৪

[৬৯] জেমস ওয়াইজ জামাল, এসিয়াটিক সোসাইটি বেঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

[৭০] শফিকুল আসগর, নরসীংদীর ইতিহাস, জেলা পরিষদ ১৯৮৭, পৃ. ৩৬

ঐ সময় যে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু ছিল তা প্রাচীন ভারতীয় দিনার। ঈসা খানের সময় মুদ্রা ব্যবস্থার হিসাব নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৪ কুড়ি- ১ গন্ডা

৫ গন্ডা ১ কুড়ি বা- পয়সা

৪ কুড়ি /পয়সায় ১ আনা বা পণ

৪ পণ বা আনা - ১ চৌক

৪ চৌক - ১ টাকা[৭১]

এই সময়ের লেখকদের লেখায় টাকার হিসেবে একত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমসাসাময়িক কালে রচিত কাব্যে বা বন্দনা দেয়া হয়েছে যেখানে মাকে বন্দনা করতে গিয়ে বলা হলো, এখানে কাব্য কুড়িমূল বলতে লক্ষ্য কুড়ি মূল্য বোঝানো হয়েছে। সমসাময়িক কবি সুকন্দরাম (জন্ম ১৫৩৭ চান্ডি মংগল কাব্যে উল্লেখ করেছেন।

পুনচন্ড রায়ের কাব্যের এই অংশ থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় যে, ঈসা খান একটি জনকল্যাণমূলক রাজস্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যে রাজত্বে অন্যান্য অঞ্চল থেকে ঈসা খানের রাজত্বে এসে বিভিন্ন পেশার মানুষ বসতি স্থাপন করে নিজ নিজ পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। যথাসম্ভব যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে ভূমির রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এর ব্যবসা বাণিজ্যের শুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রে ঈসা খান যে পদ্ধতি চালু করেছিলেন তাতে এ বিরল বসতির একদিকে অরণ্যভূমি অন্যদিকে জলাশয় বেষ্টিত নিম্নভূমিতে মানব বসতি বাড়তে থাকে এবং লোকালয় পূর্ণ হতে থাকে। এ প্রসংগে কেদারনাথ মজুমদার বলেন, এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে আদিম আদিবাসী কোচ হাজ ও অন্যান্য অন্ত্যজভূঞাগণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং আল্প শাসন দন্ড পরিত্যাগ করে।[৭২]

তোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রত্যক্ষ সুফল ঈসা খান পেয়েছিলেন। কেননা রাজা তোডরমল ঈসা খানের দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছিলেন। ফলে ২২টি পরগনার শাসন ক্ষমতা পরিচালনার পাশাপাশি রাজস্ব আদায় একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাছাড়াও উল্লেখযোগ্য দিক ছিল রাজা তোডরমলের সাথে ঈসা খানের সুসাম্পর্ক ঘটার ফলে ভাটিরাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায়বঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। বীরে আলা ঈসা খান বুদ্ধিমত্তত্মার সাথে বাংলায় স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্টার পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতির উচু মাথায় বাংলার স্বাধীনতা প্রতিষ্টা করেন।

[৭১] মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ঈসা খান, কিশোরগঞ্জ সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকা, জানুয়ালী, ১৯৯৫ সংখ্যা, পৃ. ২১

[৭২] কেদারনাথ মজুমদার, প্রাগুক্ত,পৃ.২৮

Dhaka University Institutional Repository

মোঘলদের সাথে ঈসা খানের পরবর্তী যুদ্ধ সমূহ

১৫৮১ খ্রিস্টাব্দ পর থেকে শুরু হয় সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় মোঘলদের বিপর্যস্ত অবস্থা। ইতোমধ্যে উড়িষ্যার জায়গীরদার কাতলু খান লোহানীর নেতৃত্বে ঐ অঞ্চলের আফগানরা একতা বদ্ধ হয়। অপরদিকে সম্রাট আকবরের পাঁচ হাজারী মনসরদার সৈয়দ শাছুম খান কাবুলী গোপনে তার কর্মস্থল ত্যাগ করে কতলু খান লোহানীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং বর্তমান পাবনা জেলার চাটমোহরে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেন। অন্যদিকে বাংলা, বিহার উড়িষ্যার সকল স্বাধীন জমিদার একতাবদ্ধ হয়ে মোঘল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে।

ঐ সময় সম্রাট আকবর তার বিশিষ্ট অমাত্য রাজা তোডরমলকে বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত কওে, বাংলার শাসন ক্ষমতা ও রাজস্ব বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করেন। রাজা তোডরমল ইতোপূর্বে শেরশাহের সময় এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু শেরশাহের মৃত্যুর পর তার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। সম্রাট আকবর রাজা তোডরমলের পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে ঐ কাজে নিয়োগ দান করেন। রাজা তোডরমল তার দায়িত্ব পাবার পর অত্যন্ত সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন।

মোঘল বাহিনী যখন উড়িষ্যা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে উপর্যুপরি যুদ্ধে লিপ্ত ছিল ঠিক তখনই বাংলার এই অঞ্চলে মোঘল আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ঈসা খানের নিকারাজা তোডরমল সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ঈসা খান রাজা তোডরমলের এই আহবানে সাড়া দিয়ে যুক্তি প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে আলোচনা শেষে এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, ন্যায় ও কল্যাণকর নীতির উপর ভিত্তি করে ভুমি রাজস্ব নির্ধারণ করা হবে এবং ঈসা খানের অধিকৃত অঞ্চলসমূহ নিজ নিয়ন্ত্রাণাধীনে শাসিত হয়। তবে সে সকল পরগনা ঈসা খানের নিয়ন্ত্রানাধীনে থাকবে ঐ সমস্ত অক্তলসমূহ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের এক অংশ এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রি সম্রাটের দরবারে বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে। ঈসা খান অনুধাবন করেন যে, ভাটিরাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন আর সে জন্যেই উল্লেখিত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কিন্তু বেশ কিছু জমিদার ঈসা খানের সাথে বন্ধুত্ব না করার জন্য সম্রাট আকবরের নিকট আবেদন করেন। তাদের মধ্যে তাহিরপুরের জমিদার কংশ নারায়ণ পাবনার সিদ্ধবীর জমিদার ঠাকুর কালীদাস রায়, যাতোরের জমিদার শ্যামল এবং দিনাজপুরের রাজভ্রাতা গোপনীনাথ রায়[৭৩] ছিলেন

[৭৩] খান সাহেব এম আবদুল্লাহ, মোমেনশাহীর নতুন ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম। উল্লেখযোগ্য যে তারা শুধু ঈসা খানেরই বিরোদ্ধাচারণ করেন না, রাজা তোডরমলের সাথেও তাদের মতের অমিল হয়েছিল। ফলে পূর্ব বাংলায় সম্রাট আকবরের নিয়ন্ত্রানাধীনে আনার স্বার্থে উল্লেখিত জমিদারদের আবেদন মোতাবেক সম্রাট আকবর বাংলায় প্রশাসনিক পরিবর্তন আনেন। সম্রাট আকবর রাজা তোডরমলকে বাংলার শাসন ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে শুধু রাজস্ব বন্দোবস্তের দায়িত্বে রেখে খান-ই-আজম মির্জা কোকাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত পাঠান।

রাজা তোডরমলকে সুবাদারি পদ থেকে অব্যাহতি দেবার সাথে সাথে ঈসা খান মোঘলদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেন। এদিকে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ বিহারের আফগানদেরকে মোঘলরা পদানত করতে সমর্থ হয়। ঐ সময় সম্রাট আকবর আবার বাংলায় অভিযান করার নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় মোঘল সেনাপতি খান-ই-আযম এলাহাবাদ অযোধ্যা ও বিহারের জমিদারদেরকে নিয়ে এক বিরাট বাহিনী গঠন করে মুঙ্গের এবং খলগাঁও হয়ে রাজমহলের নিকট কটিগাঁও নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হন।[৭৪]

মোশাররফ হোসেন শাহজাহান বলেন, রাজা তোডরমলকে বাংলার শাসন ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেবার সাথে সাথে ঈসা খান মোঘলদের সাথে ইতিপূর্বে যে সন্ধি করেছিলেন তা বাতিল করেন এবং ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ শেষ দিকে সম্রাট জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের নির্দেশে এলাহাবাদ আযোধ্যা ও বিহারের সকল জারীকৃত আকরদের একত্রিত করে একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে তাদেরকে নিয়ে খান-ই-আযম যুদ্ধের ও খলগাও হয়ে রাজ মহলের নিকট কটিগাও নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হন।[৭৫]

অন্যদিকে উড়িষ্যার সকল স্বাধীন জমিদার কাতলুখান লোহানীর নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে মোঘলদের সামরিক অভিযান প্রতিহত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অপরদিকে মাসুম খান কাবুলীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী এবং কাতলু খান লোহানীর সেনাপতি খাজা ওসমান খান লোহানীর নেতৃত্বে অন্য একটি বাহিনী খান-ই-আযমকে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয়।[৭৬]

১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ ২০শে মার্চ খান-ই-আযম তেলিয়াগড় পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর আফগান ও অন্যান্য স্বাধীন জমিদারদের বিপুল পরিমাণ সৈন্য প্রত্যক্ষ করে তিনি এবং তার সৈন্যগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। খান-ই-আযম সম্রাট আকবরের নিকট আরো সৈন্য পাঠানোর জন্য আবেদন জানান। বাংলা উড়িষ্যার মিলিত বাহিনী এবং মোঘল বাহিনী উভয় পক্ষই তেলিয়াগড়ে সামনা-সামনি অবস্থান

---

[৭৪] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান-ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

[৭৫] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান-ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

[৭৬] যদুনাথ সরকার, হিস্টী অব বেঙ্গল ভল্যুম ২, ঢাবি ১৯৭৬, পৃ. ২০১

গ্রহণ করে। তবে ঐ ইতোমধ্যে খান-ই-আযম ঘোড়াঘাটের কাকশালদেরকে[৭৭] সম্রাট আকবরের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করাতে সমর্থন হন। ফলে মাসুম খান কাবুলী ও অন্যান্য স্বাধীন জমিদারদের সাথে কাকশালদের মতবিরোধ ঘটে। কাকশালদের উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য মাসুম খান কবুলী গোড়াঘাট আক্রমণ করেন। কিন্তু সেই মুহুর্তে মোঘল বাহিনীর চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য কাকশালদেরকে রক্ষা করেন।

মোঘলরা যখন কতলু খান লোহানী এবং মাসুম খান কাবুলীর সাথে বিভিন্ন ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এই সুযোগে ঈসা খানের নিজ শক্তি বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ ১৮ই মে সম্রাট আকবর মুবাহদার খান-ই-আযমকে হাজীপুরের[৭৮] বদলী করেন। খান-ই-আযম ইতোপূর্বে সম্রাট আকবরকে অনুরোধ করেছিলেন বাংলাদেশ থেকে অন্যত্র বদলী করার জন্য। কারণ বাংলার আবহাওয়া তার পছন্দ ছিল না। সম্রাট আকবর এ প্রেক্ষিতে পাটনার শাসনকর্তা শাহবাজ খানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। তার খান-ই-আযমকে হাজীপুরের শাসনকর্তা নিয়োগের সাথে সাথেই তিনি যেখানে চলে যান। কিন্তু শাহবাজ খান তখনও বাংলায় এসে পৌছেননি। ঐ সময় প্রায় পাঁচ মাস মোঘল কর্মকর্তা ওয়াজির খান বাংলার সুবাহদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৭৯]

বিষয়টি আরো সহজভাবে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক হাবিবা খাতুন, শাহনাজ হুসনে জাহান, তাদের 'ঈসা খাঁ: সমকালীন ইতিহাস' গ্রন্থে, সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ ৬ই এপ্রিল খান-ই-আযমকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আর ১৫৮০ হতে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোঘল আরাজকতাপূর্ণ সুদীর্ঘ সময়ের সদ্ব্যব্যবহার করেই ঈসা খান তার সু-অবস্থান সুদৃঢ় করেন। পুর্ববর্তী ঘটনা প্রবাহে দেখা যায় যে, মোঘল বিদ্রোহের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও মাসুম খান কাবুলীকে দমন করা সম্ভব হয়নি। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ পূর্বেই তিনি উড়িষ্যার কতলু খান লোহানী ও ঘোড়াঘাটের কাকশালদের সাথে মিলিত হয়ে পুনঃরায় মোঘল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বাংলার বিদ্রোহীদের দমনের নিমিত্তে খান-ই-আযম এলাহাবাদ অযোধ্যা ও বিহারের মোঘল বাহিনীসহ

---

[৭৭] বাংলার মুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজস্বকালের পারস্যের খোবাসান অঞ্চলের তুরাবতি বংশের কাকশাল গোত্রের লোকজন এসে ঘোড়াঘাটে আবাস্থল নির্ধারণ করেন। ঐ সময় বাংলার সুলতানের পক্ষ থেকে কাকশালরা ঐ অঞ্চলের জায়গীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ কাশালরা মোঘল সুবাদার মুজাফফর খান তোরাবতিকে হত্যা করেছিলো ঐ সময় কাকশালদের নেতৃত্বে ছিলেন বাবা কাকশালরা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কাকশলরা আবার মোঘলদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়।

[৭৮] ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনার কাছাকাছি হাজিপুর অবস্থিত। সম্রাট আকবরের সময় বিহারের প্রশাসনিক দপ্তর ছিল হাজিপুরে।

[৭৯] যদুনাথ সরকার, হিষ্টি অব বেঙ্গল, ভলুম, ২, ঢাবি, ৩য় মুদ্রণ, প্রাগুক্ত, ১৯৭৬, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রসর হয়ে ২৭ মার্চ, ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ কাটিগাঁওর (রাজমহলের নিকটস্থ একটি নব্য খাল) তীরে মাসুম খান কাবুলীর নেতৃত্বাধীন বিশাল আফগান বাহিনীর সম্মুখীন হন। তিনি আফগান বাহিনীর বিশালতা দেখে ভীত হয়ে সম্রাট আকবরের নিকট অতিরিক্ত সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরবর্তী প্রায় একমাস উভয় বাহিনী বেশ কিছু খন্ডযুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু এসকল খন্ডযুদ্ধে আফগান বাহিনীর দু'জন প্রধান নৌসেনাপতি কালাপাহাড় ও ফতেহবাদের কাজী জাদার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু, মাসুম খান কাবুলীর সাথে কাকশালদের বিরোধ এবং শাহ বাহিনীর চক্রান্তে খান-ই-আযমের পক্ষে বহু আফগান নেতার যোগাযোগ প্রভৃতি কারণে বিদ্রোহী আফগান শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অতএব উপায়ন্তর না দেখে মাসুম খান কাবুলী ভাটি অঞ্চলে ঈসা খানের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ ১৮ মে সম্রাট আকবর শাহবাজ খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তবে শাহবাজ খানকে পাঁচ মাস বিলম্বে যোগ দেওয়ার মাসুম খান কাবুলী পুনঃরায় সংগঠিত হবার সুযোগ পান। উড়িষ্যার কতলু খান লোহানী এ সময়ে বাংলার একাংশে গোলযোগ শুরু করায় ভান্ডা হতে একদল মোঘল সৈন্য উত্তরে ঘোড়াঘাটের দিকে এবং অপর একটি মোঘল বাহিনী দক্ষিণে বর্ধমান ও সাতগাঁও অভিমুখে প্রেরণ করেন। এমতাবস্থায় ভান্ডার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দুর্বলতার সুযোগে মাসুম খান পুনরায় রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন এবং শহরের ১৪ মাইল দূরবর্তী এলাকায় উপনীত হতে সক্ষম হন। অবস্থান সম্পূর্ণ বেগতিক দেখে কালক্ষেপণ না করে মোঘল সেনাপতি দ্রুত পাটনা হতে মাসুম খানের অবস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হন। মাসুম খান পশ্চাদপসরণ পূর্বক যমুনা নদীর পূর্বতীরে ঘাটি স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ১৫ নভেম্বর ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ শাহবাজ খান যুদ্ধে মাসুম খান কাবুলীকে পরাজিত করেন। এ অবস্থায় মাসুম খান কাবুলী পুনরায় ভাটি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুতরাং প্রশ্ন জাগে যে, ভাটি অঞ্চলে মোঘল কর্তৃত্বাধীনে থাকলে মাসুম খান কাবুলী পুনঃপুন সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন কি করে? [৮০]

এ প্রসংগে স্পষ্ট করে বলেছেন, মোশাররফ হোসেন শাহজাহান তার ঈসা খান নামক গ্রন্থে, ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ ১৮ই মে সম্রাট আকবর সুবাহদার খান-ই-আযমকে হাজীপুরে[৮১] বদলী করেন। খান-ই-আযম ইতোপূর্বে সম্রাট আকবরকে অনুরোধ করেছিলেন বাংলাদেশ থেকে অন্যত্র বদলী করার জন্য। কারণ বাংলার আবহাওয়া তার পছন্দ ছিল না। সম্রাট আকবর এ প্রেক্ষিতে পাটনার শাসনকর্তা শাহবাজ খানকে বাংলার সুবাহদার নিযুক্ত করেন। আর খান-ই-আযমকে হাজীপুরের শাসনকর্তা

---

[৮০] অধ্যাপক হাবিবা খানম ও শাহনাজ হুসনে নেওয়াজ-ঈসা খাঁ; সমকালীন ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

[৮১] ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনার কাছাকাছি হাজিপুর অবস্থিত। সম্রাট আকবরের সময় বিহারের প্রশাসনিক দপ্তর ছিল হাজিরপুরে।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগের সাথে সাথেই তিনি সেখানে চলে যান। কিন্তু শাহবাজ খান তখনও বাংলায় এসে পৌছেননি। এ সময় ৫ মাস মোঘল শাসনকর্তা ওয়াজির খান বাংলার সুবাহদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৮২] সম্রাট আকবরের পক্ষ থেকে বাংলার প্রশাসনিক কার্যক্রমে এই পরিবর্তনের ফলে উড়িষ্যার নায়েব সুলতান কতলু খান লোহানী বিভিন্ন আফগান শক্তিকে একত্রিত করে মোঘল বাহিনীর অবস্থানগুলোর উপর আক্রমণ করতে থাকে। এদিকে মাসুম খান কাবুলী ভান্ডা অবরোধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। শাহবাজ খান এই পরিস্থিতিতে সর্ব প্রথম ভান্ডা তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সচেষ্ট হন। এই অবস্থায় উড়িষ্যায় অবস্থানরত মোঘল বাহিনীর একটি অংশকে তার সাথে মিলিত হতে নির্দেশ দিলে তারা অতিসত্ত্বর শাহবাজ খানের সাথে এসে মিলিত হয়। শাহবাজ খান গঙ্গানদী অতিক্রম করে ভান্ডায় মাসুম খানের অবস্থানের দিকে ধাবিত হন। ১৫ই নভেম্বর ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধের পর মাসুম খান কাবুলী পরাজিত হন। এরপর শাহবাজ খান ঘোড়াঘাটের এক অংশ অধিকার করে এবং বগুড়ার নিকট শেরপুর অধিকার করেন। যেখানে আফগান নেতা বাহাদুরকে পরাজিত করেন ও কয়েকটি আফগান পরিবারের সদস্যদেরকে বন্দী করেন।

এদিকে ঈসা খান তার একটি বাহিনী নিয়ে ঘোড়াঘাটের দিকে যাত্রা করেন এবং দশকাহনীয়া শেরপুরে[৮৩] এসে শিবির স্থাপন করেন। মাসুম খান কাবুলী ও ভান্ডা থেকে পরাজিত হয়ে দশকাহনীয়া এসে ঈসা খানের সাথে মিলিত হন এবং ঈসা খানের আশ্রয় কামনা করেন। সামরিক সহায়তার প্রয়োজনে ঈসা খান মাসুম খান কাবুলীকে আশ্রয় দান করেন।

এরপর সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ঈসা খান আর সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে সোনারগাঁয়ে ফিরে আসার মনস্থ করেন। ইতোমধ্যে শাহবাজ খান মাসুম খান কাবুলীকে তার হাতে সমর্পন করার জন্য ঈসা খানকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ঈসা খান এ বিষয়ে কোন উত্তর না দিয়ে মাসুম খান কাবুলীসহ অন্যান্য আফগান নেতাদের নিয়ে সোনারগাঁয়ে তার নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী নগরী কাতরাবোতে ফিরে আসেন। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ নভেম্বর মাসে সুবাহদার শাহবাজ খাঁন খিজিরপুরের নিকট বুড়িগঙ্গার তীরে এসে শিবির স্থাপন করেন। ঐ সময় নদীর তীরে ঈসা খান যে সকল সুরক্ষিত

---

[৮২] যদুনাথ সরকার, হিষ্টি অব বেঙ্গল-ভলুম-২, ঢাবি, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৭৬- প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

[৮৩] দশকাহনিয়া বর্তমান শেরপুর জেলায় অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পাড়ে এই স্থানটি থেকে নদীর পশ্চিম পাড়ে যেতে মধ্য যুগে দশকাহন কড়ি ব্যয় হত। ফলে স্থানটি দশকাহনিয়া নামে আজও পরিচিত

Dhaka University Institutional Repository

দূর্গ ছিল ঐ দূর্গগুলোকে কেন্দ্র করে মোঘল বাহিনীর সাথে ঈসা খানের বাহিনী খন্ড খন্ড যুদ্ধ হতে থাকে।[৮৪]

এ প্রসঙ্গে আকবরনামায় বলা হয়েছে, নদীর দু'তীরে ঈসা খানের সুরক্ষিত দূর্গগুলো পদানত হলো খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। এরপর মোঘল বাহিনী সোনারগাঁও অধিকার করে ঈসা খানের রাজধানী নগরী কাতরাবোর দিকে এগিয়ে গেল। ঈসা খানের বসতবাটি কাতরাবো[৮৫] আক্রান্ত হলে নগরটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিধস্ত হয়।[৮৬] আকবর নামায় নগরটিকে ঐ সময়ের জনশূন্য নগরী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুদ্ধে ঈসা খান ও মাসুম খান কাবুলীর যৌথ বাহিনী মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে এগারসিন্দুরে প্রশ্চাদ গমন করেন। শাহবাজ খান ও শাহ বাহিনী নিয়ে এগারসিন্দুরের অপর তীর ব্রক্ষপুত্র নদের পাড়ে টোক নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করেন।[৮৭]

শাহবাজ খান টোকে[৮৮] অবস্থান গ্রহন করে বিভিন্ন কৌশলে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি তার সেনাপতি তারসুন খানকে ব্রক্ষপুত্র নদের পশ্চিম তীরের রাস্তা দিয়ে উত্তর দিকে প্রেরণ করেন বাংলার বাহিনীর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য।[৮৯] মোঘল বাহিনী গফরগাঁও থানার নিকটবর্তী কোন স্থান দিয়ে নদী অতিক্রম করে। এক রকম বিনা বাধায় ঈসা খানের রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ দূর্গ বোকাই নগর[৯০] ও তাজপুর[৯১] দখল করে ফেলে। বোকাইনগর ও তাজপুরে ঐ সময় দু'জন আফগান জমিদার শাসন করতেন। তারা ঈসা খানের সাথে মৈত্রী জোটেও অংশগ্রহন করেছিল।

---

[৮৪] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[৮৫] ঈসা খানের এককালের রাজধানী এবং দূর্গনগরী কাতরাবো কালের পরিক্রমায় বর্তমানে মাছুমাবাদ নামে পরিচিত। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার বারোক মৌজায় অবস্থিত। শীতলক্ষা নদীর পূর্বতীরে এবং বাহাদুর খা বিলের পাশে কাতরাবো ঈসা খানের রাজধানী শহরের জমকপ্রদ অঙ্কন এবং গুরুত্বপূর্ণ পত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আজও সকলের দৃষ্টি আকষর্ণ করে।

[৮৬] আবুল ফজল আকবার নামায়, ৩য় খন্ড বেভারিজ কর্তৃক ফারসীভাষা থেকে অনূদিত, ১৯৮৯ পৃ. ৬৪৯-৪৯

[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৯

[৮৮] বর্তমান গাজীপুর জেলা কাপাসিয়া থানার প্রাচীন স্থানটি তোফক নামে পরিচিত ছিল। তোফক থেকে তুক-তুক থেকে টুক নামে বিবর্তন ঘটেছে।

[৮৯] আব্দুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৯

[৯০] ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দ সেলজুকী সালতানাতের শাহজাদা সুলতান কমরউদ্দীন রুমী (র.) যখন (বর্তমান) নেত্রকোনায় মদনপুরে আসেন তখন কামরূপ সামন্ত কোকাই কোচ (বর্তমান) ফোকাই নগরে রাজত্ব করতেন। তিনি হযরত শাহ সুলতান কমর উদ্দীন রুমী (র.)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বোকই রাজা যে দূর্গটি নির্মাণ

Dhaka University Institutional Repository

মোঘল সেনাপতি তারমুন খান তাজপুর ও বোকাইনগর দখল করে নেয়ার পর আফগান জমিদারগণ উপায়ান্তর না দেখে ঈসা খানের আশ্রয়ে চলে আসেন। ঐ সময় শাহবাজ খান বিপুল পরিমান সৈন্য নিয়ে ভাওয়াল পরগনার দিকে যাত্রা করেন।[৯২] ঈসা খান তখন দু'দিক থেকে মোঘল বাহিনীর আক্রমনের সম্মুখীন হলেন। তারসুন খান নাসিরুজ্জিয়াল পরগনার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হবার সময় রোয়াইল বাড়ীতে[৯৩] শিবির স্থাপন করেন। রোয়াইল বাড়ির আফগান জমিদার মজলিশ জালালের মধ্যস্থ্যতার তারমুন খান ঈসা খানের নিকট এই মর্মে প্রস্তাব করেন যে, বিদ্রোহী মাসুম খান কাবুলীকে যদি তাদের হাতে তুলে দেয়া হয় তাহলে ঈসা খানের সাথে তাদের আপাতত কোন বিরোধ থাকবে না এবং শাহান শাহ আকবরের নিকট ঈসা খানকে একজন বন্ধু হিসেবেই মর্যাদাবান করা হবে।

একজন আশ্রয়দাতা হিসেবে মাসুম খান কাবুলীকে কোন অবস্থাতাই তারমুন খানের হাতে তুলে দেয়া অমানবিক কাজ বিবেচনা করে ঈসা খান কৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি তারমুন খানের কাছে দূত প্রেরণ করে সন্ধির প্রস্তাব করেন এবং প্রচুর উপঢৌকন প্রেরণ করেন। কিন্তু তারমুন খান ঈসা খানের সাথে অন্য যে কোন আলোচনা প্রত্যাখান করে এগারসিন্দুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং বাজিতপুরে[৯৪] এসে শিবির স্থাপন করেন।[৯৫]

করেছিলেন পরবর্তী সময়ে এই দূর্গটি বোকাইনগর কেল্লা নামে পরিচিতি লাভ করে। বোকাইনগর স্থানটি বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার সদর শহরের ১২ মাইল পূর্ব থেকে অবস্থিত একটি গ্রামে।

[৯১] সুলতান সাইফ উদ্দিন ফিরোজ সাহেব পূর্বাঞ্চলের রাজ্য রক্ষক মজলিশ খা হুমায়ুন বৃহত্তর ময়মনসিংহের বেশ কয়েকটি স্থানে যে কয়েকটি দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন তার মধ্যে তাজপুরের দূর্গ অন্যতম। গৌরীপুর থানার ৫ মাইল পশ্চিমে তাজপুর অবস্থিত।

[৯২] আবুল ফজল আকবরনামা, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত-১৯৮৯, পৃ. ৬৫০

[৯৩] ঈসা খানের অন্যতম আফগান সভাসদ মজলিশ জালালের আবাস্থল ছিল। নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানায় রোয়াইল বাড়ী দূর্গটি অবস্থিত। অতি সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে মাটি খনন করে একটি প্রসাদ বাটি ও বারে দুয়ারী মসজিদ আবিস্কার করা হয়েছে। রোয়াইল বাড়ি দূর্গটি আঠারবাড়ি রেলওয়ে ষ্টেশণ থেকে প্রায় ৫ কি.মি. পূর্ব দিকে। কথিত আছে যে, এই দূর্গটি নাসির উদ্দিন নূসরত শাহ যখন এই অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন তখন তিনি নির্মাণ করেছিলেন।

[৯৪] বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার একটি থানা। মসলিন কাপড় উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। আকবর নামায় বাজিতপুরকে বাজাত্রাপুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে বেতারিজ এবং ব্রখম্যান বাজাত্রাপুরকে বাজিতপুরের সাথে অভিন্ন মনে করেন।

[৯৫] আব্দুল ফজল আকবরনামা, ৩য় খন্ড বেভারিজ-কর্তৃক ফরাসী ভাষা থেকে অনুদিত-লোপাই, পৃ. ৬৫০

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খান মোঘলদের সাথে সমঝোতার আশা ত্যাগ করে প্রথমত তারমুন খানকে প্রতিহত করার জন্য মাসুন খান কাবুলীকে বাজিতপুরের দিকে প্রেরণ করেন সেখানেই উভয় বাহিনী মুখিমুখি অবস্থান গ্রহন করে।

এ প্রসংঙ্গে আকবরনামায় বলা হয়েছে যে, শাহবাজ খান এ সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মহিব আলী খান ও রাজা গোপালসহ আরো অনেককে তারমুন খানের সাহার্যার্থে বাজিতপুরে প্রেরণ করেন। সহায্যকারী সেনাদল না পৌছা পর্যন্ত দৃঢ় স্থানে আশ্রয় নেয়ার জন্য শাহবাজ খান তারমুন খানকে নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তারমুন খান এই সংবাদে বিশ্বাস না করে শাহবাজ খানকে অবস্থানস্থল ভাওয়ালের দিকে ফিরে যাবার মনস্থ করেন।[৯৬] কারণ ইতোমধ্যে মাসুন খান কাবুলী যে সৈন্য সমাবেশ করেছে তাতে এই স্থানে অবস্থানরত মোঘল বাহিনীর স্পর্শতার বিষয়টি বিবেচনা করে তারসুন খান এই সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে মাসুন খান কাবুলী এই সংবাদ পেয়ে তারসুন খান যেন কোন ভাবেই ভাওয়ালের দিকে ফিরে যেতে না পারে তার জন্য তিনি উৎপেতে থাকেন এবং তার সাথে অবস্থানরত একটি ক্ষুদ্র দলকে অন্যদিকে দিয়ে তারমুন খানের অবস্থানের দিকে প্রেরণ করেন তারমুন খান এই পর্যায়ে একটা ভ্রান্ত ধারনা অনুধাবন করেন এবং তার মনে হলো যে ঐ দলটি সম্ভবত শাহী বাহিনীর অংশ হবে। তারমুন খান তাদেরকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত হলে তিনি পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে দলটি তাদের শত্রু বাহিনী। তারমুন খানের তখন আর কিছুই করার ছিলনা। তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আকবরনামায় বলা হয়েছে, এই সেনাপতি বাজিতপুরের যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সাথেই নড়েছিলেন। যদিও তার সাথে অবস্থানরত অনেকেই নিরর্থক প্রাণ দিতে চাইলো না। আবার অনেকেই যুদ্ধাস্ত্র আনার জন্য তাবুতে ফিরে গিয়ে যুদ্ধের ময়দানে না আসার কারণে মাত্র ১৫জন লোক নিয়ে তারমুন খান যুদ্ধটি চালিয়ে যান।[৯৭] কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং আহত অবস্থায় মাসুম খান কাবুলীর হাতে বন্দী হন। বাজিতপুরের এই যুদ্ধে মোঘল বাহিনীর অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। তারমুন খানের আত্নীয় বিজ্ঞ সেনাপতি ফরিদুল হোসাইন এবং আলী ইয়ার এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। মাসুম খান কাবুলী তারমুন খানকে সম্রাট আকবরের অনুগত্য অস্বীকার করার শর্তে প্রাণ ভিক্ষা দেয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতি তারমুন খান এই প্রস্তাবে রাজী হননি। সম্রাট আকবরের প্রতি চরম আনুগত্যশীল বৃদ্ধ এই সেনানায়ক মাসুম খান কাবুলীকে এই জঘন্য প্রস্তাব

[৯৬] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫০-৬৫১.

[৯৭] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫১

Dhaka University Institutional Repository

রাখার জন্য ভৎসনা করেন এবং বিভিন্ন উপদেশ দেন। মাসুম খান কাবুলী তারমুন খানের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে আহত অবস্থায় তাকে হত্যা করেন।[৯৮]

এ সংবাদ প্রাপ্তির পর ভাওয়ালের গহীন বনে অবস্থানরত সুবাহদার শাহবাজ খান তিনি তার স্থল ও নৌবাহিনী নিয়ে এগারসিন্দুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই শাহবাজ খান তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ব্রহ্মপুত্রর শাখা বানার নদীর তীরে এসে আবার ও শিবির স্থাপন করেন। জায়গাটি বর্তমানে টোক[৯৯] নামে প্রসিদ্ধ।

এদিকে ঈসা খান তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য মৈত্রী জোটের অর্ন্তভুক্ত জমিদারদেরকে সামর্থানুযায়ী সৈন্য প্রেরণের অনুরোধ করেন। তিনি ত্রিপুরার মহারাজের নিকট সৈন্য চেয়েও আবেদন জানালেন। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বপাড় এলাকার সকল আফগান জমিদারগণ ঈসা খানের আহবানে সাড়া দিয়ে নিজেরা এগারসিন্দুরে এসে জামায়েত হতে থাকেন। অন্যদিকে ত্রিপুরার মহারাজা সৈন্য প্রেরণ করে ঈসা খানকে সাহায্য করেন। ত্রিপুরার রাজা অমরমানিক্যের সাথে পূর্ব থেকেই ঈসা খানের সুসম্পর্ক ছিল। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দ ত্রিপুরার রাজা যখন তরফের জমিদার ফতেহ খানের বিরুদ্ধে সাময়িক অভিযান প্রেরণ করেন তখন ঈসা খান ত্রিপুরার রাজার পক্ষ হয়ে ঐ যুদ্ধে গমন করেছিলেন। এছাড়া ইতোপুর্বে কাস্তুলের যুদ্ধের পরেও ঈসা খানকে ত্রিপুরার রাজা সৈন্যসাহায্য দিয়েছিলেন যা ইতোপুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এ জন্যই এবার ও ঈসা খানের আহবানে সাড়া দিয়ে সৈন্য সাহায্যের জন্য ত্রিপুরার মহারাজা এগিয়ে আসেন।[১০০]

ঈসা খানের এই বিশাল সামরিক ব্যবস্থাপনার সংবাদ অবগত হয়ে শাহবাজখান বিশেষভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হন। কারণ ইতোপূর্বে খান-ই-আযম শাহবরদী ও তারমুন খানের যে পরিণতি হয়েছিল সেই পরিণতি যদি শাহবাজ খানের ভাগ্যে ঘটে তাহলে মোঘল সামরিক বাহিনীর বিজয় ঘটনার আর সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় শাহবাজ খান ঈসা খানের নিকট প্রস্তাব করেন 'হয় আপনি

---

[৯৮] আবুল ফজল, প্রাগুপ্ত পৃ. ৬৫৮

[৯৯] লোহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদ এই জায়গাটিতে এসে একটি নদী উৎপন্ন করেছে যা শীতলক্ষা নামে পরিচিত। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রমতে শীতলক্ষ্যা যেহেতু ব্রহ্মপুত্রের কন্যা সেহেতু এই সঙ্গম অবৈধ। ফলে এই স্থান থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে যে স্থানটিতে শীতলক্ষ্যা বাক সৃষ্টি করে দক্ষিণে প্রবাহিত আছে সেই স্থান পর্যন্ত নদীটিকে বাবার নামে অভিহিত করা হয়। এমতাবস্থায় বানার এবং ব্রহ্মপুত্র ও দুয়ের সঙ্গম স্থলের উত্তর পাড়ে এগারসিন্দুর এবং ঠিক দক্ষিণ পাড়ে টোক অবস্থিত। বর্তমান গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার অধীনে একটি বাজার এবং ঢাকা থেকে ৭৫ মাইল দূরে কিশোরগঞ্জ সীমান্ত টোক বাজারটি। বাহারিস্থানই গাইবীতে বলা হয়েছে এই স্থানটি মেঘলদের নৌঘাটি রূপে ব্যবহৃত।

[১০০] মোহাম্মদ হোসেন শাহজাহান ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহীদেরকে আমার হাতে তুলে দিন অন্যথায় তাদেরকে আপনার আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দিন।'[১০১] কিন্তু ঈসা খান হ্যাঁ বা না কিছুই না বলে সময় কাটাতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে মাসুম খান কাবুলীকে মোঘলদের হাতে সমর্পণ করা বা স্বীয় এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার কোন ইচ্ছা ঈসা খানের ছিল না।

আবুল ফজল আকবরনামা গ্রন্থে বলেছেন যে, এইভাবে দীর্ঘ সাত মাস যাবত শাহবাজ খান টোকে অবস্থান করেও ঈসা খানের সাথে কোন প্রকার আপোষ মীমাংসায় আসতে ব্যর্থ হন। অবশেষে যুদ্ধ করার মনস্থ করেন এবং প্রতিদিনই বিক্ষিপ্তভাবে তাদের মধ্যে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ হতে থাকে। সময় ছিল তখন বর্ষাকাল। এদিকে বর্ষা অন্যদিকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ফলে মোঘল শিবিরে দেখা দিল বিপর্যস্থ অবস্থা। এছাড়া সুবাহদার শাহবাজ খান ছিলেন একজন কড়া মেজাজের লোক। ফলে সৈন্যরা এই বিপর্যস্থ অবস্থায় কোন সঠিক ব্যবস্থা না পেয়ে শাহবাজ খানের প্রতি মারাত্মক বিরক্ত হয়ে ওঠে।[১০২] প্রবল বর্ষণের ফলে মোঘল শিবির প্লাবিত হবার উপক্রম হয়। এ সময় মোঘলদের দ্বারা নির্মিত মৃন্ময়ময় দূর্গ ভেঙ্গে যায়। ফলে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় চতুর্দিকে বাঁধ দিয়ে অতিদ্রুত একটি সামরিক দূর্গ নির্মাণ করে সেখানেই তারা অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু এর পরেও মহাপ্লাবন ও বিপজ্জনক আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে মোঘল শিবির বিপর্যয় রোধ করা কোন ভাবেই সম্ভব হল না। ঈসা খান এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি একটি বাহিনীকে সেনাপতি বীর করিমের নেতৃত্বে টোকে প্রেরণ করেন। তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মোঘলদের সদ্য নির্মিত মৃন্ময়ময় দূর্গের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে সাথে আক্রমন পরিচালনা করে। অন্যদিকে মাসুম খান কাবুলীর নেতৃত্বে একশত রণতরী বানার নদীর মোহনায় অবস্থানের জন্য প্রেরণ করা হয়। ঈসা খান ও রাজা শ্রীমন্ত রায়[১০৩]এক বিরাট বাহনীসহ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এগারসিন্দুরে অপেক্ষা করতে থাকেন।

রাতের দ্বিপ্রহরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল মোঘল শিবিরে সৈন্যরা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সেই সময় বীর করিমের নেতৃত্বে প্রেরিত ঈসা খানের বাহিনীর মোঘল শিবির রক্ষাকারী বাঁধের ১৫টি জায়গা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হয়। আর সাথে সাথে ভীষণ শব্দে স্ফীত জলরাশি মোঘল শিবির প্লাবিত

---

[১০১] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৮

[১০২] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৮

[১০৩] কিশোরগঞ্জের অতিন নিকটে যশোদলের সীমান্তরাজা শ্রীমন্ত রায় ঈসা খানের সাথে মৈত্রীজোটের অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং ঈসা খানের অমাত্য পদ গ্রহণ করেছিলেন। অনেকের মতে শ্রীমন্ত রায় বিক্রমপুরের রাজা চাঁদরায় ও কেদার রায়ের আত্মীয় ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ও রসদাদি ভাসিয়ে নিয়ে যায়।[১০৪] বানার নদীর মোহনায় অবস্থানরত মাসুম খান কাবুলীর নেতৃত্বে অসংখ্য নৌসৈন্য বীর কাসিমের বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে মোঘলদের উপর বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে তুলে।

আকবরনামার বিবরণ অনুযায়ী ঐ সময় সম্ভবত ঈসা খানের সেনাপতি বীর করিম নিহত হয়েছিলেন। আকবরনামায় বলা হয়েছে, উভয় পক্ষের মধ্যে কামান ও বন্দুকের গুলি বিনিময়ে আরম্ভ হবার পর বাদশাহী সৈন্যরা বিচলিত হয়ে পড়লো। এখন সময় হঠাৎ করে একটি গুলি শত্রু সেনাপতির গায়ে লাগার পর তিনি নিহত হন।[১০৫] এখানে শত্রুর সেনাপতি বলতে আবুলফজল সম্ভবত ঈসা খানের সেনাপতি বীর করিমের কথাই বুঝিয়েছেন। এরপরেও মোঘল বাহিনী এই প্রচন্ড আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে অসহায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকে। আর শাহবাজ খান কোন প্রকারে নিজেকে রক্ষা করে শীতলক্ষ্যা নদী অতিক্রম পূর্বক ভাওয়ালের গহীনবনে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন।[১০৬] ঢাকায় নিযুক্ত মোঘল সুবাদার সৈয়দ হোসেন বেশ কয়েকটি কামান ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রচুর সৈন্যসহ বাংলার বাহিনীর হাতে বন্দী হন। ইতোপূর্বে সুবাহদার খান ঈসা খানের সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজধানী কাতরাবো দখল করার পর তার প্রসাদবাটি লুণ্ঠন করে যে ক্ষতি সাধন করেছিল ঈসা খান তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। কিন্তু বন্দী মোঘল থানাদার সৈয়দ হোসেন ঈসা খানের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে এই মর্মে আবেদন পেশ করেন যে, যদি তাকে মুক্তি দেয়া হয় তাহলে শাহবাজ খার নিকট থেকে সাকুল্য লুণ্ঠিত দ্রব্য উদ্ধার করে দেবে এবং শাহবাজ খানের সাথে একটি সন্ধির ব্যবস্থা করে শান্তিপূর্ণ অবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করবে। উল্লেখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মোঘল হানাদার সৈয়দ হোসেন মুক্তিলাভ করে ভাওয়াল গমন করেন এবং শাহবাজ খানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি আলোচনার জন্য সম্মত হন।[১০৭] অবশেষে ঈসা খানের সাথে শাহবাজ খানের সন্ধি হয়।

সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ঈসা খান মোঘলদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবেন বলে সাব্যস্ত হয় এবং মোঘলদের পক্ষে থেকে একজন দারোগা সোনারগাঁওয়ে অবস্থান করবে এবং লুণ্ঠিত মালামাল শাহবাজ খান ফেরৎ দেবেন আর মাসুম খান কাবুলী হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় চলে

---

[১০৪] আবুল ফজল আকবর নামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

[১০৫] আবুল ফজল আকবর নামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৮

[১০৬] আবুল ফজল আকবর নামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৯

[১০৭] যদুনাথ সরকার, হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল–১৯৭৬, পৃ. ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

যাবেন।[১০৮] ঈসা খানের সাথে সন্ধির পর শাহবাজ খান ভাওয়ালেই অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সন্ধির কিছু শর্ত পালন বিষয়ে শাহবাজ খানের সাথে ঈসা খানের মতবিরোধের সৃষ্টি হয়।

এ প্রসংগে আকবরনামায়[১০৯] বলা হয়েছে, শাহবাজ খানের অধীনস্ত কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি অসংগত কথাবার্তায় ঈসা খানের বিরূপ ধারণার উদ্রেক হয়। কারণ ইতোপূর্বে যে সকল বিষয়ের উপর সন্ধির শর্ত নিরোপিত হয়েছিল ঐ শর্তগুলো মোঘলদের পক্ষ থেকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ঈসা খানের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। ফলে মোঘলদের সাথে কোমল আচরণ ত্যাগ করে ঈসা খান আরো কিছু নতুন শর্ত আরোপ করেন।[১১০] ফলে শাহবাজ খানের সাথে ঈসা খানের সম্পর্কের অবণতি ঘটে।

এ প্রসংগে আকবরনামায় বলা হয়েছে, এমতাবস্থায় শাহী সেনাপতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ঈসা খানকে বললেন, 'এভাবে নতুন নতুন শর্ত যোগ করা নীতিবান লোকদের কাজ নয়'।[১১১]

ফলে আবারও মসবিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে উভয় পক্ষই। ঈসা খান সম্ভাব্য মোঘল আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য তার নৌ ও পদাতিক বাহিনীকে চারটি ভাগে ভাগ করে ভাওয়ালের দিকে প্রেরণ করেন। ঐ সময় ইতোপূর্বে মোঘলদের নিকট আত্মসমর্পনকারী বেশ কিছু জমিদার তাদের ভুল বুঝতে পেরে ঈসা খানের সাথে এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করে।

ভাওয়ালের গাজীবংশের তিলাগাজী মহেশ্বরদী ও বক্তারপুরের জমিদার করিম দাদ, মুসাজাই ও ইব্রাহিম নাড়াল এবং চন্দ্রপ্রতাপের জমিদার চাঁদ প্রভাদ প্রমুখ জমিদারগণ সামাজিকভাবে মোঘল সেনাপতিদের মিষ্ট কথায় তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিলো। কিন্তু কিছু দিনের ব্যবধানে মোঘলদের আগ্রাসী চরিত্র যখন প্রত্যেক্ষ করলো তখনি তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে ঈসা খানের সাথে আবার একাত্ম ঘোষণা করেন।[১১২]

হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হোসনে জাহান বলেন, ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ মাসুম খান কাবুলীকে সম্পূর্ণ দমনের উদ্দেশ্যে শাহবাজ খান ভাটিতে গমন করেন এবং ঈসা খানের অধীনস্ত সোনারগাঁও, কতরাবো ও এগারসিন্দুর দখল করে এগারসিন্দুরের বিপরীত দিকে টোকে শিবির স্থাপন করেন। ঈসা

---

[১০৮] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৮

[১০৯] আবুল ফজল প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৯

[১১০] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৯

[১১১] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৯

[১১২] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান-প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

খান যে সময়ে কুচবিহারের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। শাহবাজ খানের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তিনি বিরাট এক বাহিনীসহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলে মাসুম খান কাবলী তার সাথে যোগ দেন এবং উভয়ই শাহী বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে জলে স্থলে আক্রমণ শুরু করেন। বাজিতপুরের নিকট এক যুদ্ধে শাহবাজ খান কিছুটা অনমনীয় সুর অবলম্বন করে ঈসা খানের নিকট মাসুম খান কাবলীকে প্রত্যাবর্তন করে তার আশ্রয় হতে বিতাড়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করেন।

কিন্তু ভাটির শাসক ঈসা খান কেবল মিষ্টি বাক্যে কালক্ষেপন করতে থাকেন। কিছুদিন পর একরাতে ঈসা খান ব্রহ্মপুত্রের বাধের পনেরটি স্থান কেটে দিলে নদীর পানিতে শাহবাজের শিবির তলিয়ে যায়। ফলে উভয় পক্ষে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ ৩০ সেপ্টেম্বর ভাওয়ালের নিকট এক যুদ্ধে শাহবাজ খান পরাজিত হন এবং সেখান থেকে দ্রুত ভান্ডার দিকে পলায়ন করেন।[১১৩]

এই বিষয়টির আরো পরিস্কারভাবে আলোচনা করেন মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান তার ঈসা খান গ্রন্থে, ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ ৩০ শে সেপ্টেম্বর ঈসা খান তার বাহিনী নিয়ে ভাওয়ালের গহীন বনে মোঘল সুবাহদার শাহবাজ খানের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ঈসা খানের সকল বাহিনী মোঘল অবস্থানের চার দিক থেকে কামানের সাহায্যে প্রচন্ড গোলাবর্ষন করতে অগ্রসর হতে দেখে মোঘল সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শাহবাজ খান অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে এই প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শাহবাজ খানের ভাগ্যে তার বিপরীত গ্রহে অবস্থান করায় তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মোঘল সৈন্যরা শাহবাজ খানকে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। কিন্তু শাহবাজ খান তার অধীনস্তদের কথায় কর্ণপাত না করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মনস্থ করেন।[১১৪]

শাহবাজ খানের একতরফা সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানাতে না পেরে সেনাপতি মুহিব আলী খান যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করেন। এরপর আরো অনেকেই নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে থাকে। একমাত্র মোঘল সেনাপতি শাহআলী কুলী মোহরম আন্তরিকতার সাথে শাহবাজ খানের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু সাহায্যের অভাবে তিনিও আহত হয়ে ভাওয়াল ত্যাগ করেন। শাহবাজ খান ঐ সময় তার শোচনীয় পরিণতির কথা অনুধাবন করেন এবং তার অধীনস্তদের পতি প্রীতিপূর্ণভাব বজায় রাখতে এবং তাদেরকে একত্রিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি দেখে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। এমতাবস্থায় সম্পদের মায়া ত্যাগ করে শাহবাজ খান ভান্ডার দিকে রওনা হয়ে যান। ঈসা খানের হাতে প্রচুর সম্পদ ও মোঘল বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মীল্ব আদিলাওরের পুত্রগণ

---

[১১৩] হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

[১১৪] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৯

Dhaka University Institutional Repository

বন্দী হন। এবং সাইয়েদ মুহাম্মদ গজনভীসহ বেশ কয়েকজন উচ্চ পদস্থ মোঘল কর্মকর্তা নিহত হন।[১১৫]

এ প্রসংগে আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, শাহবাজ খানসহ মোঘল সৈন্যরা ঈসা খানের নিকট পরাজিত হয়ে আট দিন পর শেরপুরে পৌছেন। মাসুম খান কাবুলীও তাদেরকে ধাওয়া করতে করতে শেরপুর পর্যন্ত অগ্রসর হন। শাহবাজ খান ঐ সময় তার সেনা বাহিনীকে পুন:গঠন করে আবার ভাটির দিকে সামরিক অভিযানের মনস্থ করেন। কিন্তু ইতোপূর্বে তার দুর্ব্যবহারে বিরক্ত মোঘল সৈন্যগণ তার যে কোন নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে। অবশেষে শাহবাজ খান ও মোঘল সৈন্যগণ ভান্ডায় পৌছে। যেখানে ওয়াজিব খানের সহায়তায় আবারও ভাটির দিকে যুদ্ধযাত্রার জন্য সৈন্যদেরকে অনুরোধ করে। কিন্তু তারা ঐ বিষয়ে কোনভাবেই রাজি হয়নি।[১১৬]

মোঘল সৈন্যদের পক্ষ থেকে শাহবাজ খানের পতি বিরোধিতা যখন চরম পর্যায়ে পৌছেছিল তখন সম্রাট আকবরের পক্ষ থেকে ফরমান আসে যে, সেনাপতি সাদিক খান বাংলা বিহার ও অন্যান্য এলাকার জায়গীরদারকে সাথে নিয়ে ঈসা খানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করবে এবং পেশরাও খান, খাজাঞ্চী ফতেহ উল্লাহ, রামদাস কাচ্ছাহা ও মুজাহিদ কাম্বুসহ মোঘল কর্মচারীগণ ভান্ডাতেই অবস্থান করেন।[১১৭]

সম্রাট আকবরের এই নির্দেশের পরেও একমাত্র মহিব আলী খান ছাড়া আর সকলেই নিজ নিজ জায়গীরেই অবস্থান করতে লাগল এদিকে বাংলার এবং উড়িষ্যার জমিদারগণ মোঘলদেরকে প্রতিহত ও বিতাড়িত করার জন্য আবারও সচেষ্ট হন। ইতোমধ্যে কয়েকজন জমিদার তাদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে মালদহ পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং মাসুম খান কাবুলীর শেরপুর অবস্থান করতে থাকেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ ২৬শে ডিসেম্বর শাহবাজ খান ভাটির দিকে আবারও অগ্রসর হলে এক পর্যায়ে তিনি পুনরায় শেরপুর দখল করেন। মাসুম খান মোঘলদের ব্যাপক আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে ফতেহাবাদের দিকে চলে আসেন।[১১৮]

এমতাবস্থায় ভান্ডা অরক্ষিত রেখে প্রতিপক্ষের পশ্চাদধাবন করা সংগত হবে না বিবেচনা করে শাহবাজ খান, সাদিক খান ও অপর কয়েকজন কর্মচারীকে ভান্ডায় রেখে যেতে চাইলে এ নিয়েও মতবিরোধ দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শাহবাজ খান, শাহকুলী খান ও মহরম

---

[১১৫] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬০

[১১৬] আবুল ফজল, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬৬০

[১১৭] আবুল ফজল আকবরনামা, ১৯৮৯, পৃ. ৬৬০

[১১৮] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রমুখ সেখানেই রয়ে যান এবং ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ ১৭ জানুয়ারী মোঘল কর্মকর্তা সাইয়েদ খান, সাদিক খান ওয়াজির খান, মহিব আলী খান, রামদাস কাচ্ছাহা ও খাজা ফতেহ উল্লাহ ঈসা খানের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন।[১১৯]

নতুন করে মোঘল সামরিক অভিযানের এই সংবাদ প্রাপ্তির পর বাংলার মৈত্রী জোট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ঈসা খান রাজধানীতেই অবস্থান করবেন। আর মাসুম খান কাবুলীসহ অন্যরা মোঘল বাহিনীর অবস্থানের দিকে এগিয়ে যাবে এ প্রসংগে আকবারনামায় বলা হয়েছে, মাসুম খান শেরপুর [১২০] পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। কয়েকজন বিদ্রোহী [১২১] মালদাহ [১২২] পর্যন্ত সমগ্র জনপদ অধিকার করে রাখল [১২৩]।

মাসুম খান কাবুলী ইতোমধ্যে বিক্রমপুরের শেরপুর ফিরিঙ্গি থেকে অগ্রসর হয়ে শাহবাদপুরে [১২৪] পৌছে দাস্তাম কাকশালের [১২৫] নেতৃত্বে একটি বাহিনী শাহজাদপুরে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়ে অপর একটি বাহিনী নিয়ে তিনি ফতেহাবাদের[১২৬] দিকে যাবার মনস্থ করেন। মাসুম খান কাবুলী ফতেহাবাদের দিকে চলে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মোঘলবাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যাতে করে কোন দিকেই তারা সফলকাম হতে না পারে। কিন্তু ইতোমধ্যে সংবাদ আসে যে, শাহবাজ খান মোঘল কর্মকর্তা রামদাস, কাচ্ছাহা ও খাজা ফতেহ উল্লাহ যমুনা নদীর তীরে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। মাসুম খান কাবুলী মোঘল বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হলে তাদের মধ্যে সংঘঠিত যুদ্ধে

---

[১১৯] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬০

[১২০] এইচ বেভারিজ মতে এই স্থানটি শেরপুর ফিরিঙ্গি। যার অবস্থান বিক্রমপুরে ছিল বলে জেমস টেইলর বলেছেন। বর্তমান কীর্তিনাশা নদীর ভাঙ্গনে জায়গাটি বিলুপ্ত হয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে আবুল ফজলের বর্ণনায় আরো দুটি শেরপুর লক্ষ্য করেছি।(১) শেরপুর মুর্ছা যা বগুড়ার একটি থানা সদর(২) বর্তমান জেলা শেরপুর।

[১২১] আবুল ফজল ঈসা খানের সাথে মৈত্রী জোটের অংশ গ্রহণকারী ভূস্বামীদেরকে ফেলে সবসময় বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[১২২] বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের একটি জেলা সদর। গৌড় নগরী থেকে ১২ মাইল উত্তর দিকে আর ভান্ডা থেকে মালদহের দূরত্ব প্রায় ২৪ মাইল।

[১২৩] আবুল ফজল আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭২

[১২৪] বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার একটি থানা সদর। এইস্থানে হযরত মাখদুম শাহ দৌলা (র.)-এর মাজার অবস্থিত। করতোয়া নদীর তীরে এই স্থানটি একটি প্রাচীন জনপদ। ষোড়শ শতকে রাজা রায় নামে একজন সামন্তরাজার আবাস ছিল এই স্থানটি। স্থানটিকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কাচারী বাড়িও রয়েছে।

[১২৫] ঘোড়ঘাটের কাকশাল বংশের একজন বীরপুরুষ মাসুম খান কাবুলীর একজন বিশ্বস্ত সহচর।

[১২৬] বর্তমান ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল সরকার ফাতেহাবাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

মাসুম খান কাবুলী পরাজিত হলে আবার তিনি ফতেহাবাদের দিকে চলে যান। মোঘল বাহিনীও তাদের পিছু পিছু যেকে থাকে। এ প্রসংগে আকবরনামায় বলা হয়েছে, মোঘল অধিকৃত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে রাখার স্বার্থে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারী মাসে সাইয়েদ খান, সাদিক খান, ওয়াজির খান, মহিব আলী রামদাস কাচ্ছাহা খাজা ফতেহ উল্লাহ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। কিন্তু বাংলার বাহিনী সন্ধান করতে ব্যর্থ হয়ে মোঘল বাহিনী শেরপুরের[১২৭] ফিরে যায়।[১২৮]

মোঘল বাহিনী শেরপুর ফিরে যাবার পর দাস্তাম কাকশাল ঘোড়াঘাটের দিকে অভিযান করেন। কিন্তু শেরপুর থেকে মোঘল বাহিনীর শাহকুলি খান, মোহরম, মহিব আলী খান, রাজা গোপাল দাস, মীরজাদা আলী খান, খাজা বকর দাস্তাম কাকশালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে দাস্তাম কাকশাল কোন সংঘর্ষে না জড়িয়ে পিছু হটে আসেন। শাহ বাহিনী দাস্তাম কাকশালকে শাহজাদপুর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে আসেন।

মাসুম খান কাবুলী এই পর্যায়ে হুগলীর দিকে ধাবিত হয়ে হুগলী জেলার ত্রিবেনীতে দু'টি মৃন্ময় দূর্গ নির্মাণ করে ঐ এলাকা পর্যন্ত ভাটিরাজ্যের অবস্থান দৃঢ় করেন এবং উলুজবেগমসহ কয়েকজনকে দূর্গ দুটির দায়িত্বে রেখে তিনি নিজে বিভিন্ন স্থানে মোঘলবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে থাকেন। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ ১৯ ফেব্রুয়ারী মোঘল বাহিনীর সাথে মাসুম খান কাবুলীর প্রচন্ড যুদ্ধে দূর্গ দু'টি পতন হয়।

এদিকে জমিদার তারখান দেওয়ান ও তাহের ইলস্কাক প্রথমদিকে ঈসা খানের আহবানে সংগ্রামে শরীক থাকলেও কিছুদিন নিরব ভূমিকা পালন করে। এই পরিস্থিতিতে তারা আবারও মোঘল বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হন। তাদের ইলস্কাক তাজপুরের[১২৯] অবস্থানরত মোঘল বাহিনীকে আক্রমণ করেন এবং তারখান দেওয়ান ভান্ডায় মোঘলদেরকে আক্রমণ করেন। তবে মোঘলরা এ দু'টি আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।[১৩০] ঈসা খান ও স্বাধীন জমিদারগণ যখন উপর্যপুরি আক্রমণে মোঘলদের অস্থির করে তুলছিল এমতাবস্থায় মোঘলদের অন্তবিরোধ প্রশমিত হবার লক্ষণ দেখা যায়নি। এক পর্যায়ে মোঘল সেনাপতি সাদিক খান ও সুবাহদার শাহবাজ খানের সাথে মত পার্থক্য

---

[১২৭] এইচ বেভারিজের মতে এই শেরপুরকে বগুড়ার শেরপুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আকবরনামায় এই শেরপুরকে শেরপুর মুর্ছা বলা হয়েছে।

[১২৮] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৩

[১২৯] তৎকালীন বাংলা ১৯টি সরকারের মধ্যে সরকার তাজপুর অন্যতম। তাজপুরের মহাল সংখ্যা ছিল ২৯টি। পশ্চিম দিনাজপুর এবং মহানন্দা নদীর পূর্বদিক, পুর্ণিমা জেলার পূর্বাঞ্চল নিয়ে সরকার তাজপুরের অবস্থান ছিল।

[১৩০] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০- ৯১

Dhaka University Institutional Repository

চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। সম্রাট আকবর ঐ সময় খাজা সোলায়মানকে বাংলায় প্রেরণ করেন, তাদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য। তিনি শাহবাজ খান এবং সাদিক খান এই দু'জনকে বাংলা বিহারের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয় যে, যিনি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন তিনি যেন অন্যজনকে বিহার ছেড়ে দেন। সাদিক খান, শাহবাজ খানের সাথে পরামর্শ না করেই অতিসত্ত্বর বাংলার সুবাদারী গ্রহণ করেন এবং নতুন করে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এদিকে শাহবাজ খান ক্রুদ্ধ হয়ে বিহারে চলে যান।[১৩১]

শাহবাজ খানের প্রত্যাবর্তনের পর নতুন করে সাদিক খানের নেতৃত্বে মোঘল বাহিনী আবারও বাংলায় সামরিক অভিযানের সংবাদ পেয়ে ঈসা খান বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ প্রসংগে আবুল ফজল আকবরনামায় বলেন যে, দূরদৃষ্টি বশতঃ ঈসা খান, সাদিক খান ও অন্যান্য মোঘল নেতাদের নিকট দূত প্রেরণ করে প্রস্তাব করেন যে, তিনি মাসুম খান কাবুলীকে মক্কায় পাঠিয়ে দেবেন এবং মোঘল কর্মকর্তাকে ঈসা খানের দরবারে স্থান দেবেন। ইতোপূর্বে শাহী বাহিনীর নিকট থেকে যা কিছু লুণ্ঠন করেছেন তা ফেরত দেবেন।[১৩২]

আবুলফজলের উল্লিখিত বিবরণগুলো থেকে অনুধাবন করা যায় যে, বিহার থেকে ভাটিরাজ্য পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি অঞ্চল আফগান ও বাংলার ভূস্বামীর তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টার পরেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃতকার্য হতে পারেননি। বিভিন্ন রণাঙ্গনে বার বার মোঘল সামরিক অভিযানকে প্রতিহত করলেও কোন স্থায়ী ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয় তারা। অন্যদিকে শাহবাজ খান বাংলার ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবর্তে তোষণ নীতি অবলম্বন ও উৎকোচ প্রদান দ্বারা পাঠান বিদ্রোহী নায়ককে বশিভূত করেন।[১৩৩] ফলে ঈসা খানের সাথে মৈত্রীজোটে অংশ গ্রহণকারী অনেকেই প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে মোঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে দিনের পর দিন বিভিন্ন রণাঙ্গনে অবস্থান করতে হয়েছে। মোঘল বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণে বাংলার ভূস্বামীদের ক্ষমতা খন্ড বিখন্ড হয়েছে। ঈসা খান ছিলেন ঐ সময়ের একজন প্রজ্ঞা ব্যক্তিত্ব। তিনি অনুধাবন করেছিলেন বন্যার প্লাবনের মত এগিয়ে আসা মোঘল বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণ রোধ করা আর বেশিদিন সম্ভব হবে না। কারণ ইতোমধ্যে মোঘল সেনানায়করা বহু আফগানকে তাদের কাছে

---

[১৩১] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, আকবরনামা, পৃ. ৬৯৬

[১৩২] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, আকবরনামা, পৃ. ৬৯৬

[১৩৩] রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশে ইতিহাস, মধ্যযুগ-২য় খন্ড, ৪র্থ সংস্করণ জেনারেল এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৯৮৭, পৃ. ১২৭

আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছেন। ঈসা খান ঐ বিষয়গুলো অনুধাবন করেই মূলত সাদিক খান ও অন্যান্য মোঘল নেতাদের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন সন্ধি করার জন্য।

মোঘল সামরিক কর্মকর্তারা ঈসা খান কর্তৃক প্রেরিত দূতের প্রস্তাব সমর্থন করেন। এরপর ঈসা খান বেশ কিছু সংখ্যক হাতী, বন্দুকসহ উপহার সামগ্রী সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন এবং কিছু দিনের জন্য হলেও শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু মোঘল সৈন্যরা বাংলা ত্যাগ করেনি। তবে ঈসা খান মোঘল সম্রাটের সাথে বন্ধুত্ব রাখার সর্বময় চেষ্টা করতে থাকেন।[১৩৪]

ঐ সময় সুলতান সুলায়মান কররাণীর[১৩৫] কিছু কর্মচারী আফগানদের সহায়তায় বর্তমানে মোঘলদের আক্রমণ করে। কিন্তু মোঘল বাহিনীর হাতে তারা পরাজিত হয়ে ভাটিরাজ্যে ঈসা খানের আশ্রয়ে চলে আসে। এ প্রসংগে আকবরনামায় বলা হয়েছে, ঈসা খান মোঘলদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন তা বাস্তবায়ন করার প্রেক্ষিতে শাহীবাহিনী উড়িষ্যায় আফগানদের সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। ঐ সময় বাংলার প্রাক্তন সুলতান সোলায়মান কররানীর কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা[১৩৬] যারা সুলতান দাউদ খানের মৃত্যুর পর পর বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করেছিল তারা মোঘল সুবাদার ওয়াজিবখানের পুত্র সালেহকে বর্ধমান জেলায় আক্রমণ করে। সালেহ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে অন্য একটি মোঘল বাহিনী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসলে সালেহ প্রাণে রক্ষা পান। মোঘল বাহিনী মহলকোট নামক স্থানে অজয় নদীর তীরে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ ১০ জুন মোঘল বাহিনী যখন নদী অতিক্রম করার মনস্থ করে বাংলার সৈন্যরা নদীর অপরতীর থেকে মোঘল সৈন্যদের প্রতি কামানের গোলা নিক্ষেপ করে ফলে মোঘলদের অসংখ্য ঘোড়া এবং সৈন্য নদীর স্রোতে ভেসে যায়। এরপরও মোঘল বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে নিয়ে মোঘল সেনানায়ক সাদেক খান নদীর অপর তীরে উঠে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বাংলার বাহিনীকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দান করে। এদিকে বাংলার বাহিনী দু'দলে বিভক্ত হয়ে একদল ওয়াজির খানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীকে অন্যদল মুহিব আলী ও সাদেক খানের নেতৃত্বে সেনা বাহিনীকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে ওয়াজির খান মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হলে মহিব আলী খানও সাদেক

---

[১৩৪] মোহাম্মদ মোশাররফ হেসেন শাহজাহান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৯২

[১৩৫] রিয়াজ-উস-সালাতীনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি প্রথম দিকে শেরশাহের অধীনে একজন আমীর ছিলেন। শেরশাহ তাকে বিহারের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি বাংরার সুলতান তাজখান করবানীর ভাই। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ তিনি বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

[১৩৬] এইচ বেভারিজের মতে তাদের নেতৃত্বে ছিলেন আওলীয়া কররানী নামে একজন। তবে সুলায়মান কররানীর সাথে আওলাবী কররানীর কি সম্পর্ক ছিল তা জানা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

খান তার সাহার্যার্থে এগিয়ে আসলে বাংলার বাহিনী পিছু হটে আসে। অতঃপর তারা ভাটিরাজ্যে ঈসা খানের আশ্রয় চলে আসে।[১৩৭]

আবুলফজলের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় ২৯ শে জানুয়ারী ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ সম্রাট আকবর শাহবাজ খানকে আবার বাংলায় প্রেরণ করেন। শাহবাজ খানের এবার বাংলায় আগমন ছিল একটু ভিন্ন চরিত্রে নিয়ে। প্রথমেই তিনি বন্ধুত্বের নীতি এবং উদারতা ভাব দ্বারা বেশ কিছু সংখ্যক স্বাধীন আফগান জমিদারদের মন জয় করেন এবং তাদেরকে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। মর্যাদা দিয়ে তার নেতৃত্বে মেনে নিয়েছিল। সুলতানী আমলের উত্তরাধিকারী হিসেবেই তিনি স্বদেশ ভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় তার গৌরবময় ভূমিকা রেখেছিলেন। এক্ষেত্রে তার অবদান উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবেই তিনি আলোচিত কিংবদন্তীর নায়ক। ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে এবং ইতিহাসের তথ্যের ভিত্তিতে তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রাম পুরুষ।

রালফ ফিচের ভাষ্য অনুযায়ী ঈসা খান একজন রাজা। রাজার মত তিনি রাজস্ব আদায় করতেন। খন্ডিত রাজশক্তির সময়ে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাবে রাজস্ব সংগ্রহের জন্যই তার পরিচয় সাধারণের কাছে দেওয়ান বা রাজস্ব আদায়কারী। পরাজিত রাজশক্তির ক্ষমতাহীনতা তাকে রাজস্ব সংগ্রহে উৎসাহিত করে। তার মত অন্যান্য স্থানীয় জমিদারেরা বা ভূঞারা রাজস্ব সংগ্রহ করত। আমাদের ইতিহাসের মোঘল পূর্ব যুগ এখনও জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত। তবে সাধারণ মানুষ মোঘল যুগে প্রচলিত প্রশাসনিক শব্দের সাথে পরিচিত। তাদের কাছে রাজস্ব সংগ্রহকারী জায়গীরদার বা জমিদার বা ভূঞা না হয়ে দিওয়ান নামক পরিচিত। তাই ঈসা খানের বাড়ী দিওয়ান বাড়ী হিসাবেই পরিচিত ছিল বা ভূঞা নেতার দূর্গ সুরক্ষিত বাড়ীটি একজন সংগ্রামী নেতার প্রথম রাজধানী হিসেবে মোঘল দলিলে পাওয়া গেলেও সাধারণের কাছে তা রাজস্ব সংগ্রহকারী দেওয়ান বাড়ী নামেই পরিচিত হয়েছে।[১৩৮]

১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ শেষদিকে ঈসা খান ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পার্শ্বের কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করেন। ঈসা খান প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলার হোসেন শাহী সালতানাতের শেষ সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের আইন সংগত উত্তরাধিকারী হিসেবে গৌড়ের সালতানাত পুনরায় অধিকার করা। আর এজন্যই তিনি গৌড় নগরীর আশপাশ সমস্ত আফগান ও বাংলার অন্যান্য ভূস্বামীদের সাথে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। প্রয়োজনে তাদেরকে আশ্রয়

---

[১৩৭] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭-৯৮

[১৩৮] অধ্যাপক হাবিবা ও হোসনে জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১- ১৩

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছিলেন। তাদের সাথে যুদ্ধ করে মোঘল সামরিক অভিযান প্রতিহত করেছেন। বিভিন্ন রণাঙ্গণে তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে তাদের সহায়তা করেছেন। অর্থাৎ মহানন্দা নদীর তীরে থেকে মেঘনা নদী পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ জনপদের আফগান ও স্থানীয় ভুস্বামীদের সাথে এমনকি ত্রিপুরায় রাজাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকলেও কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের সাথে কোন সম্পর্কই গড়ে তুলতে পারেননি। ঈসা খান এই পর্যায়ে গৌড়ের সালতানাতে পুনরায় অধিকারের জন্য রাজা নরনারায়ণের সমর্থন আদায়ের জন্য কুচবিহারে গমন করেন।

ইতোমধ্যে উড়িষ্যাসহ এই অঞ্চলের আফগানদেরকে দমন করার জন্য সম্রাট আকবরের পক্ষ থেকে আযোধ্যার রাজা মানসিংহ সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে উড়িষ্যায় আগমন করেন। ফলে উড়িষ্যায় অবস্থানরত আফগানদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। কিছু সংখ্যক আফগান নেতা মানসিংহের ডাকে সাড়া দিয়ে মোঘলদের সাথে একত্মতা ঘোষণা করে। রাজা মানসিংহ তাদের মধ্য থেকে খাজা সোলায়মান, খাজা ওসমান, শরখান ও হযরত খানতে [১৩৯] সরকার খলিফাতাবাদের[১৪০] জায়গীর প্রদান করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আবার তাদের জায়গীর কেড়ে নেন এবং সবাইকে তার নিকট তলব করেন। এ প্রেক্ষিতে আফগানরা আতঙ্কিত হয়ে মোঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় মানসিংহ খাজা ওসমান, খাজা সোলায়মানসহ অন্যান্য স্বাধীন জমিদার ও জায়গীরদারদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ফলে খাজা সোলায়মান, খাজা ওসমানসহ অন্যান্য আফগান পূর্ববঙ্গের দিকে চলে আসেন। রাজা মানসিংহ তাদের বিরুদ্ধে নিজে অগ্রসর না হয়ে হিম্মত সিংহের অধীনে বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু হিম্মত সিংহ বেশিদূর অগ্রসর না হয়ে মোঘল শিবিরে ফেরৎ আসেন। এদিকে খাজা ওসমান ও খাজা সোলায়মান তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে ভূষণার[১৪১] দূর্গে আশ্রয় নেন।

---

[১৩৯] তারা সবাই সুলতান সোলায়মান খান কররানী ও দাউদ খান কররানীর দরবারের কর্মকর্তা ছিলেন। দাউদ খানের মৃত্যুর পর তারা উড়িষ্যার কতলু খানের আশ্রয়ে চলে আসেন।

[১৪০] যশোর জেলার দক্ষিণে এবং বরিশাল জেলার পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে সরকার খলিফাবাদ গঠিত হয়েছিল। হযরত খান জাহান আলীকে খলিফাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাগেরহাটের হাভেলী পরগনার খলিফাবাদের নামে এই সরকারের নামকরণ করা হয়েছিল।

[১৪১] ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানা সদর দপ্তর থেকে ৩ মাইল এবং ফরিদপুর জেলা শহর থেকে প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে নোয়াপাড়া ইউনিয়নের কিল্লাবাড়ি নামক স্থানে ভূষণার দূর্গ অবস্থিত। জৈনক ক্ষত্রিত রাজা বৈনুকর্ণ এর পুত্র কণ্ঠহার এর উপাধি ছিল বঙ্গভূষণা। তিনি যখন এই অঞ্চল অধিকার করেন তখন তার নামে স্থানটির নামকরণ করা হয় ভূষণ

Dhaka University Institutional Repository

আবুলফজলের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, চাঁদরায় ও কেদাররায় তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে হত্যা করতেও মনস্থ করেছিলেন। এ প্রসংগে আকবরনামায় বলা হয়েছে যে, চাঁদরায় একদিন খাজা সোলায়মান ও খাজা ওসমানকে দাওয়াত করেন। ফলে তারা চাঁদরায়ের প্রাসাদ বাটিতে উপস্থিত হন।

খাজা সোলায়মান ও খাজা ওসমানের সাথে দিলওয়ার খান নামে একজন আফগান ও উক্ত দাওয়াত উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু একটি বিশেষ কাজে দেলওয়ার খান প্রসাদ বাটির বাইরে আসলে চাঁদরায়ের সৈন্যগণ তাকে বন্দী করে। ফলে খাজা সোলায়মান সাথে সাথে তরবারী বের করে চাঁদরায়ের কয়েকজন সৈন্যকে হত্যা করে এবং অন্যান্যদের ছত্র ভঙ্গ করে দিয়ে তড়িৎ গতিতে সেখান থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হন।[১৪২]

ইতোমধ্যে সোলায়মান খান ও ওসমানের অনুগত আফগান সৈন্যরা এই সংবাদ পেয়ে খাজা সোলায়মান ও ওসমানের সাহাযার্থে চলে আসেন এবং চাঁদরায়কে হত্যা করে ভূর্ষনার দূর্গ দখল করেন।

এই সংবাদ প্রাপ্তির পর ঈসা খান অতি দ্রুত কুচবিহারে থেকে সোনারগাঁওয়ে ফিরে এসে বিক্রমপুরে গমন করেন। তিনি বিক্রমপুরে রাজ্যের সাথে আফগানদের বিরোধ মীমাংসায় মধ্যস্থতা করেন।

বিষয়টি লক্ষনীয় যে, মোঘলদের সাথে ঈসা খানের সম্পর্ক যতবার খারাপ হয়েছে তার মূলে ছিল আফগানদেরকে ঈসা খানের সহযোগিতা। যখনই ঈসা খান আফগানদের আশ্রয় দিয়েছে বা তাদের সাহায্যের জন্য ঈসা খান ছুটে গিয়েছেন। এর পরেই মোঘল সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়েছে ঈসা খানের বিরুদ্ধে। যাহোক শেষ পর্যন্ত ঈসা খান এই বিরোধের মীমাংসা করেন। সোলায়মান খানকে কেদার রায়ের নিয়ন্ত্রণে থাকার ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে খাজা ওসমান খানকে কিছুদিন এগারসিন্দুরে অবস্থান করার অনুমতি দিয়ে অতঃপর বোকাইনগরে ভূমিদান করে বাংলায় এই পাঠান বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

পরবর্তী কয়েক বছরের ইতিহাসের গতিধারা মোঘলদের পক্ষে প্রবাহিত হবার ক্ষেত্রে যে নামটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তিনি হলেন রাজা মানসিংহ। তিনি ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলেও এতদস্থলের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরোক্ষভাবে তার আবির্ভাব ঘটে ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারী মাসে উড়িষ্যা বিজয়ের পর মানসিংহ যে অঞ্চলে আফগান নেতা সুলায়মান খান এবং ওসমান খানসহ আরও তিন জনকে ফরিদপুর জেলায় জায়গীর প্রদান করেন।

---

[১৪২] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬৯

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত প্রদানের অব্যবহিত পরেই তিনি অনুধাবন করেন যে, উড়িষ্যা আফগানদের একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি হাওয়ায় ফরিদপুরের জায়গীর দেয়া সমীচীন হয়নি। অতএব তিনি তৎক্ষনাৎ তাঁদের জায়গীর বাতিল করে শিবিরে আহবান করেন। মানসিংহের এরূপ আহবানে আফগানগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে সাতগাঁও পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা লুন্ঠন করে অবশেষে ভূষণার দিকে ধাবিত হয়। সে সময় ভুষণা শ্রীপুরের চাঁদরায় ও কেদাররায়ের দখলে ছিল। চাঁদরায় আফগান নেতৃবৃন্দকে কৌশলে বন্দী করার নিমিত্তে সোলায়মান খান, ওসমান খান ও দিলাওয়ার খানকে ভূষণার দূর্গে আহবান করলে, সুলায়মান খান চাঁদরায়ের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারেন এবং তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই রক্তক্ষয়ূ যুদ্ধে ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ ১১ ফেব্রুয়ারী চাঁদরায় নিহত হলে আফগানগণ সহজেই ভূষণার দূর্গ হস্তগত করেন। কিন্তু ঈসা খান সুকৌশলে আফগান নেতৃবৃন্দকে তার আশ্রয়ে গ্রহণে বাধ্য করেন এবং ভূষণার দূর্গ রাজ্য কেদাররায়ের নিকট হস্তান্তরের নির্দেশ দেন। এভাবে কেদাররায় পুনঃরায় ভূষণার কর্তৃত্ব লাভ করেন। ঈসা খান আফগান নেতা সোলায়মানকে কেদাররায়ের সেনাপতিরূপে নিয়োগ করেন এবং ওসমান খান লোহানীকে ময়মনসিংহের বুকাইনগর এলাকায় একটি জমিদারী প্রদান করেন। উল্লেখিত তথ্যটি ঈসা খানের বিচক্ষণতা প্রভূত্ব ও প্রতাপের ঐতিহাসিক সমর্থন দান করে।

১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ ১৭ মার্চ আকবরের পুত্র যুবরাজ সেলিমের নির্দেশে রাজা মানসিংহ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। রাজা মানসিংহ বাংলায় আসার সময় তার পুত্র জগতসিংহ, শক্তিসিংহ ও রাজা রামচন্দ্র দেবসহ বেশ কিছু সংখ্যক মোঘল অমত্য বাংলায় আগমন করে।

আবুলফজলের বর্ণনায় দেখা যায় যে, এর পরের বছর অর্থাৎ ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ ২৮ আগষ্ট ঈসা খান মসনদ-ই-আলা সম্রাট আকবরের নিকট তার যায় যে, ১৫৮৬ হতে ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ঈসা খান শান্তিপূর্ণ ভাবেই তার রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন।

১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ ৭ ডিসেম্বর রাজা মানসিংহ আকমহল[১৪৩] থেকে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন উত্তরবঙ্গের দিকে।

রাজা মানসিংহ কর্তৃক প্রেরিত বাহিনী ঐ অঞ্চলের সমস্ত আফগানদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে আসলে সবাই ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করে ঈসা খানের রাজ্যে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ সময় বর্ষা

---

[১৪৩] এই স্থানে রাজা মানসিংহ বাংলার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। মালদন জেলার গৌড় নগরী থেকে প্রায় ২০ মাইল উত্তর পশ্চিমে গঙ্গার পশ্চিম তীরে এই স্থানটি অবস্থিত। বেভারিজের মতে 'আকমহল' তুর্কী শব্দ। অর্থ শ্বেত প্রসাদ।

শুরু হবার ফলে রাজা মানসিংহ শেরপুর এবং পরে ময়মনসিংহের হারুয়া নামক স্থানে সেলিমগড় নামে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন।[১৪৪]

আবুলফজলের বিবরণী অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শ জুনের দিকে রাজা মানসিংহ তার পুত্র দু'জন সিংহের নেতৃত্বে ভূষণার দূর্গ অধিকার করার জন্য কেদাররায়ের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনা বাহিনী প্রেরণ করেন। কারণ আফগানদের অনেকেই তখন কেদাররায়ের আশ্রয়ে ছিল। খাজা সোলায়মান খান ও কেদাররায় প্রাণপণে যুদ্ধ করেও ভূষণার দূর্গ রক্ষা করতে পারেনি। খাজা সোলায়মানসহ অনেক আফগান নিহত হয়, কেদাররায় আহত অবস্থায় ঈসা খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১৪৫]

১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ জুলাই মাসে রাজা মানসিংহ শেরপুর থেকে ফিরে এসে ঘোড়াঘাটে অবস্থান নেন। ঐ সময় তিনি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসকরা তার জীবন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন।[১৪৬] ঈসা খান এ সুযোগে মাসুম খান কাবরী, ওয়াহেদ খান, মহব্বত খান[১৪৭] এর নেতৃত্বে এক বিশাল নৌবহর ঘোড়াঘাটে অবস্থানরত রাজা মানসিংহের শিবিরের কাছাকাছি কয়েক মাইলের মধ্যে পৌছে যান। ঐ সময় ঈসা খানের বাহিনীকে প্রতিরোধ করার মত সামরিক শক্তি মোঘলদের ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে বর্ষার পানি কমে যেতে শুরু করলে ঈসা খানের বিশাল নৌবহর শুকনায় আটকে যায় ফলে অতিদ্রুত তারা পিছনের দিকে চলে আসে। এই অবস্থায় মোঘল সৈন্যরা ঈসা খানের নৌবহরের উপর ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে কিন্তু কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। ঈসা খান তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে এগারসিন্দুরে চলে আসতে সক্ষম হন।

রাজা মানসিংহ অসুস্থ থেকে আরোগ্য লাভ করার পর সামগ্রিক অবস্থা নিরূপণ করে তার পুত্র হিম্মতসিংহের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী ঈসা খানের বিরুদ্ধে এগারসিন্দুরের দিকে প্রেরণ করেন।[১৪৮] হিম্মতসিংহ তার বাহিনী নিয়ে সরাসরি এগারসিন্দুরে উপস্থিত না হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীর এবং এগারসিন্দুরের অপর পাড় রণভাওয়াল পরগনার দত্যের বাজারে এসে শিবির স্থাপন

---

[১৪৪] আবুল ফজল, আবকরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪৩

[১৪৫] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

[১৪৬] যদুনাথ সরকার হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল ভল্যুম, ঢাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

[১৪৭] ওয়াহেদ খান এবং মহব্বত খান এই দু'জন রণভাওয়ালের জমিদার ছিলেন। ঈসা খানের সাথে মৈত্রী জোটে যে সকল জমিদার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ় ছিলেন তাদের মধ্যে ওয়াহেদ খান এবং মহব্বত খান অনত্যম।

[১৪৮] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৩

করেন। কিন্তু হিম্মতসিংহ ঈসা খানের বিপুল সামরিক শক্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ঘোড়াঘাটে ফিরে যাবার মনস্থ করেন। যাবার সময় রণভাওয়াল অঞ্চলে ব্যাপক লুটতরাজ ও অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। হিম্মত সিংহের এই অমানবিক কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে ঈসা খান তাকে উচিত শিক্ষা দিবার মনস্থ করেন। এই পর্যায়ে তিনি ওয়াহেদ খার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী হিম্মতসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ঈসা খানের বাহিনী মোঘলদেরকে ধাওয়া করতে করতে মোমেনশাহী পরগনার হাউড়া নামক স্থানে আক্রমণ করে। প্রচন্ড যুদ্ধে পর হিম্মতসিংহ লুটতরাজকৃত ধন সম্পদ ও অস্ত্রসস্ত্র ফেলে রেখেই ঘোড়াঘাটের দিকে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন।

রাজা মানসিংহ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসার পর ঈসা খানের সামরিক কৌশল পরিবর্তন করেন। কারণ রাজা মানসিংহ ছিলেন সম্রাট আকবরের প্রতিভাবান রাজপুত সেনাপতি। রাজা মানসিংহ অনুধাবন করেছিলেন শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরে বাংলাদেশে মোঘল শাসন স্থায়ী করা যাবে না। এমতাবস্থায় হিন্দুদের সমর্থন আদায় করে মোঘল শাসন ব্যবস্থা কায়েমের একটি পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন। এই পর্যায়ে তিনি যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, কুচবিহারের রাজা লক্ষীনারায়ণ, শাহজাদপুরের রাজা রাজনারায়ণ এবং সুসং এর রাজা রঘু সিংহের বশ্যতার বিনিময়ে তাদের নিজ এলাকা শাসন করার অধিকার প্রদান করেন এবং বাংলার মৈত্রী জোটের যে কোন আক্রমণে মোঘল সামরিক বাহিনীর সাহায্যেরও আশ্বাস দেন। শুধু তাই নয় রাজা মানসিংহ কুচবিহারের রাজা লক্ষীনারায়ণের বোনকে বিয়ে করেন এবং প্রতাপাদিত্যের কন্যাকেও বিয়ে করেন। বিশেষ করে তারা ছিলেন বাংলা হিন্দু সমাজের মুখপাত্র। ফলে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে রাজা মানসিংহ বাংলাদেশের হিন্দু জনগণকে মোঘল বিরোধী আন্দোলন থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালান। তাছাড়াও রাজা মানসিংহ সবচেয়ে ক্ষতিকারক যে কাজটি করেছিলেন তাহল বার ভূঞাদের মধ্যে ঐক্যের ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় ঈসা খান রাজা মানসিংহকে সফল অবস্থায় প্রতিহত করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন।

ঐ সময় কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের মৃত্যু হলে তার পুত্র লক্ষী নারায়ণ এবং ভাতুস্পুত্র রঘুদেবের (পাটকুমার) সাথে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ ঘটে। কারণ লক্ষী নরনারায়ণ যখন অপত্রক ছিলেন তখন ভাতুস্পুত্র রঘুদেবকে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি পুত্র সন্তানের জনক হন এবং ঐ পুত্রের নাম রাখেন লক্ষীনারায়ণ। পিতার মৃত্যুর পর কুচবিহার রাজার অমাত্যদেব তার সহযোগী লক্ষীনারায়ণ সিংহাসনে বসলে রঘুদেব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ঈসা খান এই সুযোগ গ্রহণ করে রঘুদেবের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেন এবং সাহায্যের আশ্বাস প্রদান

করেন।[১৪৯] কারণ ইতোপূর্বে গৌড়ের সালতানাত অধিকার করার জন্য ঈসা খান লক্ষ্ণীনারায়ণের সাহায্যে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আকবরনামায় রঘুদেবকে পাঠ কুমার বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৫০]

ঈসা খান রঘুদেকে সাহায্য করার জন্য কুচবিহার গমন করেন এবং এক পর্যায়ে লক্ষ্ণীনারায়ণকে আক্রমণ করেন।[১৫১] লক্ষীনারায়ণ আক্রমন প্রতিহত করতে না পেরে সম্রাট আকবরের অধীনতা স্বীকার করে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ ২৩ ডিসেম্বর রাজা মানসিংহ সেলিমগড় থেকে আনন্দপুরে আগমন করেন। লক্ষীনারায়ণ মানসিংহের সাথে সেখানেই সাক্ষাৎ করেন। আকবরনামায় বলা হয়েছে যে, তারা উভয়েই অশ্বপৃষ্ঠে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। অতএব রাজা লক্ষীনারায়ণ রাজা মানসিংহের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলার লক্ষ্যে তার বোনকে মানসিংহের হাতে তুলে দেন।[১৫২]

ইতিমধ্যে কোচ বিহারের সিংহাসনে রঘুদেব আরোহন করেন এবং ঈসা খানের সহযোগিতায় তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেন। এদিকে লক্ষ্ণীনারায়ণ রাজা মানসিংহের সহযোগিতায় রঘুদেবকে আক্রমণ করেন। ঈসা খান ঐ সময় রঘুদেবের সাহাযার্থে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ফলে লক্ষ্ণীনারায়ণ আবারও কোচবিহারের সিংহাসন অধিকার করেন। কোচবিহারের সিংহাসনে লক্ষ্ণীনারায়ণকে প্রতিষ্ঠিত করে রাজা মানসিংহ ফিরে যাবার পর রঘুদেব ঈসা খানের সাহায্যে আবারও কুচবিহার আক্রমণ করেন এবং রাজা লক্ষ্ণীনারায়ণকে একটি পুরাতন দূর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন।

১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ ৩রা মে রাজা মানসিংহ রগুদেব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুচবিহারে আবার সৈন্য প্রেরণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধে রঘুদেব পরাজিত হন। ঈসা খান যাতে করে আবারও রঘুদেবের সাহায্য এগিয়ে না আসতে পারেন সেজন্য রাজা মানসিংহ এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন। রাজা মানসিংহ তার পুত্র দুর্জন সিংহের[১৫৩] নেতৃত্বে বিশাল নৌবহরসহ একটি পদাতিক বাহিনী সোনারগাঁয়ের দিকে প্রেরণ করেন। ঐ সময় ঈসা খান রঘুদেবের সাহায্যের জন্য কুচবিহারে অবস্থান করেছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন মোঘল বাহিনী সোনারগাঁয়ের দিক যাত্রা করেছে তখন অতিদ্রুত গতিতে রাজধানীর দিকে বাধিত হন। কিন্তু ইতোমধ্যে দুর্জন সিংহ কাতরাবো আক্রমণ

---

[১৪৯] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৮

[১৫০] যদুনাথ সরকার, হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

[১৫১] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৭

[১৫২] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৮

[১৫৩] দুর্জনসিংহ রাজা মানসিংহের পুত্র রাজা মানসিংহের সাথে যারা বাংলায় এসেছে তাদের মধ্যে দুর্জনসিংহ অন্যতম।

করেন। ঈসা খান তখন বিক্রমপুরের ১২ মাইল দূরে অবস্থান গ্রহণ করেন। পাকতুনওয়ার ও সেই স্থানে ঈসা খানের সাথে মিলিত হন। কারণ ঈসা খান যখন কুচবিহার সামরিক অভিযানের নেতৃত্বে দিচ্ছিলেন তখন পাতকুনওয়ার রাজধানীর নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিলেন। এরমধ্যে দুর্জনসিংহ তার বাহিনী নিয়ে অতিদ্রুত বেগে ঈসা খানের অবস্থানের অতি নিকটে উপস্থিত হয়। ঈসা খান ঐ সময় মাসুম খান কাবুলীকে সাথে নিয়ে দুর্জন সিংহের নৌবহর ঘিরে ফেলে। এ প্রসংগে আকবরনামায় বলা হয়েছে যে, ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ ৫ সেপ্টেম্বর শাহী নৌবহর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হল। ঘোরতর যুদ্ধের পর বহু সৈন্যসহ দুর্জনসিংহ নিহত হন।[১৫৪]

একদিকে মোঘল সৈন্যদের বিপর্যয় অন্যদিকে দুর্জনসিংহের মৃত্যু এই অবস্থায় রাজা মানসিংহ নৌ পদাতিক সৈন্যদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সোনারগাঁওয়ের দিকে যাত্রা করেন। মানসিংহ তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে মধুপুরে উপনীত হলে ফজলগাজীর নেতৃত্বে ঈসা খানের সৈন্যগণ মোঘল বাহিনীর গতিরোধ করে। ফলে সংগঠিত যুদ্ধে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশী মোঘল সৈন্য নিহত হয়।[১৫৫] কিন্তু ইতোমধ্যে মানসিংহের সাহাযার্থে আরো নতুন সৈন্য এসে তার সাথে যোগদান করে। ফলে বাংলার বাহিনী ভাওয়ালের গহীন বনের দিকে পশ্চাদাপসারণ করতে থাকে। রাজা মানসিংহ তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতিদ্রুত সোনারগাঁওয়ের দিকে যাত্রা করেন। এ সময়ে ঈসা খানের শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে প্রাচীন এক ডালা দূর্গে অবস্থান করেছিলেন। রাজা মানসিংহ সোনারগাঁও আক্রমন করেন এবং দখল করেন। এরপর রাজা মানসিংহ তার বাহিনী নিয়ে শীতলক্ষ্যা নদী দিয়ে এক ডালা দূর্গের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর ঈসা খান এগারসিন্দুরে চলে আসেন।[১৫৬]

এ প্রসংঙ্গে এফ, বি, ব্রাউলী বার্ট বলেন, লক্ষ্যানদী দিয়ে অগ্রসর হয়ে মানসিংহ ডেমরায় শিবির স্থাপন করেন। মানসিংহ যে জায়গায়টিতে শিবির স্থাপন করেছিলেন তার কাছেই গঙ্গাসাগর নামে একটি দীঘি আজও অস্তিত্বমান। নদী ধরে এগুতে এগুতে মানসিংহ ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত ঈসা খানের দূর্গ এগারসিন্দুর এসে পৌছেন। দূর্গ প্রাচীরের বাইরে গুরুতর যুদ্ধ হল, সাতদিন ধরে অবিরাম চলে সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।[১৫৭]

---

[১৫৪] আবুল ফজল, আকবরনামা, গ্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৩

[১৫৫] মোশাররফ হোসেন, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[১৫৬] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[১৫৭] এফ, বি ব্রাউলি বার্ট, দি রোমান্স অব এন ইষ্টার্ন ক্যাপিটাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়টির উপর অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান তাদের গ্রন্থ 'ঈসা খাঁ: সমকালীন ইতিহাসে' বলেন, ঈসা খান কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের জ্ঞাতী ভ্রাতা রঘুদেবের সাথে এক যোগে কুচবিহার আক্রমণ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তখন রাজা মানসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

বছরের শেষ নাগাদ মানসিংহ তার সৈন্য বাহিনীসহ অগ্রসর হলে ঈসা খান পলায়ন করেন। কিন্তু মোঘল সৈন্য প্রতাবত্যান করলে ঈসা খানের রঘুদেব পুনরায় কুচবিহার আক্রমণ করেন। মানসিংহ পাল্টা ব্যবস্থা স্বরূপ তার পুত্র দুর্জনসিংহের অধীনে ঈসা খানের বাসস্থান কাতরাবো দখলের নিমিত্তে স্থল ও জল উভয় পথেই সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ ৫ সেপ্টেম্বর ঈসা খান ও মাসুম কাবুলীর সমবেত বিপুল বাহিনী মোঘল রণতরী আক্রমণ করে। ফলস্বরূপ বিক্রমপুরের বার মাইল দূরে সংগঠিত এক নৌযুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জনসিংহ নিহত হন এবং বহু মোঘল সৈন্য বন্দী হয়। কিন্তু সম্মুখে আসন্ন বিপদের আশংকার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন করেন।

অপরদিকে মানসিংহের পক্ষে ঈসা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। কেননা মাত্র ছয় মাসের ব্যবধান তার দুই পুত্রের মৃত্যু ঘটে হিম্মত সিংহ কলেরায় (মার্চ ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ)এবং দুর্জনসিংহ যুদ্ধে (সেপ্টম্বর ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ) মানসিংহ অত:পর ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ তার জৈষ্ঠ পুত্র জগৎ সিংহের নিকট দায়িত্ব অর্পণ করে বিশ্রামের উদ্দেশ্য আজমীর গমন করেন। কিন্তু পরের বছর (৬ অক্টোবর ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ) জগৎ সিংহের মৃত্যু হলে তদীয় পুত্র নাবালক মহাসিংহ বাংলার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।[১৫৮]

এই ঘটনাটি ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ ফেব্রুয়ারী মাসে ঘটেছিল বলে আকবরনামায় বলা হয়েছে। কিন্তু মানসিংহ কর্তৃক এগারসিন্দুর আক্রমণের বিষয়টি আকবরনামায় বিধৃত হয়নি। আকবরনামায় বলা হয়েছে যে, ঘোরতর যুদ্ধের পর বহু সৈন্যসহ দুর্জনসিংহ নিহত হন। কিছু সৈন্য বন্দী অন্যরা পালিয়ে যায় অতএব ঈসা খানের দূরদৃষ্টিতে মনভূলানো মিষ্টি কথা বলা বন্দীদের ফেরৎ পাঠানো হলো।[১৫৯]

আকবরনামায় বক্তব্য অনুযায়ী স্পষ্ট অনুমান করা যাচ্ছে যে, মানসিংহ কর্তৃক সোনারগাঁও আক্রমেণের পর ঈসা খান মোঘলদের সাথে আর কোন সংঘর্ষে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি

[১৫৮] অধ্যাপক হাবিবা ও শাহনাজ, ঈসা খা: সমকালীন ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

[১৫৯] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৪

Dhaka University Institutional Repository

যখন দুর্জনসিংহের সাথে যুদ্ধ করেন ঐ যুদ্ধে যে সকল মোঘল সৈন্য বন্দী হয়েছিলেন সেই বন্দীদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বন্দী মুক্তি বিষয়টি প্রমাণ করে যে, ঐ সময় ঈসা খান মানসিংহের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং মোঘলদের সাথে আর কোন যুদ্ধ করতে না হয় তার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

কিন্তু ব্রাউলী বার্টের বক্তব্য অনুযায়ী রাজা মানসিংহ সোনারগাঁও আক্রমণ করে যখন যুদ্ধরত ছিলেন তখন এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ঈসা খান এক দূত মারফত মানসিংহকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিজে অবতীর্ন না হয়ে তার জামাতাকে প্রেরণ করেন। মানসিংহের জামাতা অচিরেই ধরাশায়ী হলেন এবং সাথেই প্রাণ ত্যাগ করেন। এবার রাজপুত্র সেনাপতি রাজা মানসিংহ ঈসা খানের সাথে যুদ্ধে নামলেন। প্রথমে অশ্বপৃষ্ঠে দুই বীরের চলল লড়াই কিন্তু মানসিংহ তার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ঈসা খান অশ্ব থেকে তাড়াতাড়ি নেমে ভূপতিত সেনাপতিকে মাটি থেকে ধরে তুলে দিলেন। ঈসা খানের শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে সেনাপতি তাকে আলিঙ্গন করলেন। আকস্মাৎ ঝড়ের বেগে ছুটে এলেন যেখানে মানসিংহের পত্নী তিনি শিবির থেকে দৃশ্য অবলোকন করেছিলেন।

ব্রাইলী বার্ট এই বিবরণটি কোথায় পেয়েছেন এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। কারণ আকবরনামায় কোথাও এই বর্ণনা নেই। আইন-ই-আকবরীর মূল ফারসী ভাষা থেকে অনুবাদকারী ব্লাখম্যান বলেছেন, আবুলফজল মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৬০২ খ্রিস্টাব্দ আর মানসিংহের সাথে ঈসা খানের শেষ যুদ্ধ হযেছিল ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ ফেব্রুয়ারী মাসে। ঐ বছরের অনেক ঘটনাই আবুলফজল বর্ণনা করেছেন ঈসা খানের সাথে মানসিংহের দ্বন্দ্ব যুদ্ধটি যদি সত্যিকারভাবে সংঘঠিত হত তাহলে অবশ্যই আবুলফজল তার আকবরনামা গ্রন্থে উপস্থাপন করতেন।

স্থানীয় লেখকগণ ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্নভাবে ঈসা খানের গৌরবময় গাঁথার জন্য কিছু কিছু কাল্পনিক কাহিনীরও অবতারণা করেছেন। যেহেতু জনশ্রুতি, বিষয়টি উপেক্ষার বস্তু নয় কেননা জনশ্রুতির মাধ্যমে ইতিহাসের অনেক উপাদান বের হয়ে আসে।

এ প্রসংগে ডঃ এম আবুল কাদের বলেন, আকবরনামায় রাজা মানসিংহ ও ঈসা খানের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আভাষ মাত্র নেই। তবে স্বরূপচন্দ্র রায়ের সোনারগাঁওয়ের ইতিহাস ময়মনসিংহের ইতিহাস গ্রন্থে কেদার নাথ মজুমদার, শ্রী রসিকচন্দ্র বসুর 'পুণ্যচিত্র' পুস্তকে এবং খান সাহেব এম আবদুল্লাহ মোমেনশাহীর 'নতুন ইতিহাস' গ্রন্থেও এই বিবরণটি উপস্থাপিত হয়েছে। ঈসা খানের বর্তমান অধঃস্তনগণ এই বিবরণটির সত্যতা স্বীকার করেন। তারা বংশ পরম্পরায় এই বিবরণটি তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে শুনে আসছেন বলে জানিয়েছেন।[১৬০]

ঈসা খান বার বার মোঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুন্য রাখার জন্য চেষ্টাই করেছেন। বাংলার পরাধীন হউক তিনি কখনও চাননি। সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালা (র.) যে ইসলামী কৃষ্টি-কালচার রেখে যান, সে চেতনা নিয়ে একই পথে এগোতে থাকেন ঈসা খান ও তার বাহিনী। বর্তমানে চলমান ইসলামী সংস্কৃতি ও স্বাধীন বাংলা তারই প্রমাণ।

[১৬০] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

পৃ. ১৩৩-১৫৩

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ঈসা খান ও রায়নন্দিনী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) ঈসা খান ও মানসিংহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ) সম্রাট সমীপে ঈসা খান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঘ) জীবন সন্ধ্যা

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খান ও রায়নন্দিনী

পর্তুগীজ বণিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে উপনীত হয়। কিছুদিন পরে তারা আরাকানের মগ জলদস্যুগণের সাথে মিলিত হয়ে নিম্নবঙ্গে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করে। আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত অর্ণবপোতে আরোহণ করে এ বণিকরা অসভ্য দুর্দান্ত মগ জলদস্যুদের সংগে মিলে সমুদ্র ও নদীর তীরস্থ নগর গ্রামসমূহ লুন্ঠন ও এর অধিবাসীগণকে বন্দী করে নিয়ে যেতে লাগল। মোঘল রাজশক্তি তখনও বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হয়নি। হিন্দু ও পাঠান ভূমধ্যকারিগণের সঙ্গে মোঘল রাজশক্তির বুঝাপড়া হতে ছিল। সুতরাং দুর্দান্ত মগ ও পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে নিম্ন বঙ্গ উৎসর্গ হতে ছিল।[১]

১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম থেকেই বাংলার নিম্নাঞ্চল মগ দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ঐ সময় চট্টগ্রামের দিকে অবস্থানরত পর্তুগীজ বণিকগণ মগ জলদস্যুদের সাথে মিলিত হয়ে ব্যাপক দস্যুবৃত্তি শুরু করে। স্থানীয় জমিদারগণ এর প্রতিকার প্রার্থনা করে ঈসা খানের নিকট।ঈসা খান ঐ সময় বিক্রমপুরের স্বাধীন জমিদার চাঁদরায়ের সাহায্য কামনা করেন।[২]

মগ ও ফিরঙ্গিদিগকে দমন করার উপায় নির্ধারণের পরামর্শের জন্য একদা ঈসা খান বিক্রম পুরাধিপতি চাঁদরায়ের রাজধানী শ্রীপুরে উপনীত হলেন। চাঁদরায় ঈসা খানকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।[৩]

বিষয়টি আলোচনা করা যায় এইভাবে, বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত শ্রীপুরে ছিল চাঁদরায়ের প্রাসাদ বাটি। চাঁদরায় ছিলেন নিমরায় নামের একজন সামন্ত রাজার অধঃস্তন বংশধর। জেমস ওয়াইজের মতে নিমরায় সম্রাট আকররের রাজত্বের প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে কর্ণাট থেকে এখানে আগমন করেছিলেন।[৪] নিখিলনাথ রায় অনুমান করেন যে, সে সময় সেন রাজাগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করছিলেন ঐ সময় নিমরায় কর্ণাট থেকে আগমন করেন।

এখানে একটি বিষয় বিক্রমপুরের চাঁদরায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পাশাপাশি কেদাররায়ের কথাও বলা হয়েছে। শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কেদাররায়ের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন।

---

[১] মোহাম্মদ মতিউর রহমান, দেওয়ান ঈসা খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[২] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

[৩] মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান, দেওয়ান ঈসা খা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[৪] জেমস ওয়াইল, বার ভূইয়া, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ

ঐতিহাসিক আনন্দনাথ রায় বলেছেন, কেদাররায়, চাঁদরায়ের পুত্র ছিল। একই সময়ে চাঁদরায় ও কেদাররায় বিক্রমপুরে পরগনার ক্ষমতাসীন ছিলেন বলে বিভিন্ন বিবরণে ঐতিহাসিকরা এই দু'জনের নাম একই সাথে উল্লেখ করেন।

ঈসা খান উত্তরে কৈর বাড়ি থেকে দক্ষিণে মেঘনা নদী পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ জনপদের অধীশ্বর হবার পর শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার অধীনস্থ এলাকার বাহিরের সকল জমিদারের সাথে ও সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এই সময় সমুদ্র উপকুলবর্তী অঞ্চলে ফিরিংগি জল দস্যুগণ ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন ও অত্যাচার নির্যাতন শুরু করলে ঈসা খানের চাঁদরায়ের সাথে পরামর্শ করার জন্য বিক্রমপুরের শ্রীপুরে গমন করেন। ঈসা খান শ্রীপুরে অবস্থানকালে একটি রোমান্টিক কাহিনীর জন্ম হয়।[৫]

কথিত আছে, চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা স্বর্ণমীয় বা সোনামণি চাঁদ মঞ্জিলের ত্রিতল ছাদ হতে ঈসা খানকে দর্শন করে রূপজমোহে অভিভূত হন। অতঃপর গভীর রজনীতে চাঁদ মঞ্জিলের যে প্রকোষ্ঠে ঈসা খান অবস্থান করছিলেন তার পশ্চাদদিকস্থ দ্বার উন্মোচিত করে জনৈক সহচরসহ রায়নন্দিনী সোনামনি ঈসা খানের নিকট উপনীত হন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও তার নিকট আত্ম বিক্রয়ের অভিলাষ জানান্তে বিদায় গ্রহণ করেন।[৬] পরদিন দস্যুদলের দমন বিষয়ে পরামর্শ স্থির করে বিদায় গ্রহণকালে ঈসা খান চাঁদরায়ের নিকট রাজকুমারী সোনামনির পাণিপ্রার্থী হলেন। বৈধব্যের অজুহাত প্রদর্শন করে চাঁদরায় ঈসা খানকে তার এ স্থির ধারণা পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ঈসা খান এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন নি। ফলে তাদের উভয়ের মিত্রতা ঘোর শত্রুতায় পরিণত হল। চাঁদরায় ও তৎপুত্র কেদাররায় বীর বিক্রমে শ্রীপুরের নিকটবর্তী ঈসা খানের অধিকারভূক্ত কলাগাছিরা দূর্গে[৭] ও বর্তমান নরায়ণগঞ্জের অদূরে অবস্থিত খিজিরপুর আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ চলতে লাগল। এদিকে রাজকুমারী সোনামণি অতি সংগোপনে ঈসা খানের নিকট সশস্ত্র রক্ষীসহ কতক দুতগ্রামী নৌকা প্রেরণের অনুরোধ করে বিশ্বস্তরাজ অমাত্য শ্রীমন্ত খাঁকে প্রেরণ করেন। তদনুসারে নির্ধারিত সময়ে ঈসা খানের কয়েকটি নৌকা রজনী যোগে শ্রীপুরে উপনীত হল। রায়নন্দিনী সোনামণি শ্রীমন্ত খানের সংগে 'কোটিশ্বরের' মন্দিরে পুজা দেওয়ার ছলে অন্তঃপুর হতে বের হয়ে ঈসা খানের প্রেরিত নৌকায় আরোহণ করেন। নৌকা চালকগণ রায়নন্দিনীকে নিয়ে

---

[৫] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

[৬] কোহিনুর ২য় বর্ষ ১৩১৯ সাল ২য় সংখ্যা, পৃ. ৫৩

[৭] শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত "বার ভূঞা" প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষীপ্রগতিতে প্রথমত সোনারগাঁয়ে পরে তথা হতে এগারসিন্দুরে দূর্গে উপনীত হল। যুদ্ধে চাঁদরায় ও কেদাররায়ের নৌবাহিনী পরাভূত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। রায়নন্দিনী সোনামণির অন্তর্ধান ও যুদ্ধের পরাজয় জনিত ক্ষোভে ও ভগ্নহৃদয়ে চাঁদরায় "কোটিশ্বরের" দেবমূর্তির পদতলে "হত্যা" দিয়া (অন্নজল পরিত্যাগ পূর্বক ভুলুণ্ঠিত অবস্থায় পতিত হয়ে) প্রাণ বিসর্জন করেন।[৮]

বিষয়টির উপর আরও পরিস্কার আলোচনার প্রয়োজন, চাঁদরায়ের সুভদ্রানামে এক পরমা সুন্দরী বাল্যবিধবা কন্যা ছিল। বিক্রমপুরের ইতিহাসের লেখক গোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন, তার নাম ছিল সোনামনি। বাল্যবিধবা হেতু বৈধব্য জীবন নিয়ে তিনি পিতৃগৃহে অবস্থান করছিলেন। কথিত আছে যে, ঈসা খান একদিন চাঁদরায়ের প্রসাদ বাটিতে অবস্থান করার সময় চাঁদ মঞ্জিলের ত্রিতল চাঁদ থেকে ঈসা খানকে তার রূপজমোহে অভিভূত হন। অতএব ঈসা খান যে কক্ষে অবস্থান করছিলেন সেই কক্ষে সোনামনি তার এক সহচরসহ গভীর রাতে আগমন করে তার করুন বৈধব্য জীবনের কথা বর্ণনা করেন।[৯]

এই প্রসংগে কলিকাতায় প্রকাশিত কৌহিনুর পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, সোনামণি চাঁদ মঞ্জিলের ত্রিতল ছাদ থেকে ঈসা খানকে দর্শন করে রুপজমোহে অভিভূত হন। অত:পর গভীর রজনীতে চাঁদ মঞ্জিলের যে প্রকোষ্ঠে ঈসা খান অবস্থান করছিলেন তার পশ্চাদিকস্থ দ্বার উন্মোজিত করে জনৈকা সহচরসহ রায়নন্দিনী ঈসা খানের নিকট উপনীত হন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও তার নিকট আত্ম বিক্রয়ের অভিলাষ জানান্তে বিদায় গ্রহণ করেন।[১০]

'বিক্রমপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে শ্রী যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত বর্ণনা করেছেন একটু ভিন্নভাবে। সেখানে বলা হয়েছে, একদিন ঈসা খান মিত্ররাজ কেদাররায়ের বাটিতে আগমন করেন কেদাররায়ও এই রাজ অতিথির উপযুক্তরূপ সম্বর্ধনা করতে আবৃত্ত হলেন। কিন্তু এ আনন্দ কোলাহল নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই উভয় পক্ষের প্রীতির বন্ধন বিচ্ছিন্ন চির বিদ্রোহের ও মনান্তরের সৃষ্টি হল। কেদাররায়ের এক অপরূপ লাবণ্যবর্তী যুবতী বিধবা ভাগ্নি ছিল, সোনা বা সোনামণি। এই বাল্যবিধবা বৈধব্যের দারুন যন্ত্রনার মধ্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের আশ্রয়ে থেকে জীবন কেটেছিল। ঈসা খান যখন কেদাররায়ের অতিথিরূপে শ্রীপুরে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি কোনরূপে এই লালনার ত্বক দেখে একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। ঈসা খান সোনামণির রূপ লাবণ্য এতদূর মোহিত হয়েছিলেন যে, তিনি খিজিরপুরে গমন করে

---

[৮] মোহাম্মদ মতিউর রাহমান, দেওয়ান ঈসা খা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৯] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

[১০] কোহিনুর ২য় বর্ষ ১৩১৯ সাল, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৫৩

সোনামণিকে পাওয়ার জন্য একজন দূত প্রেরণ করেন। তিনি জানতেন না যে, বীরশ্রেষ্ঠ কেদাররায়ের মনে দারুন ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হবে। কেদার দূতকে বিদায় দিয়ে যুদ্ধ করত। ঈসা খানের অধিকৃত কলাগাছির দূর্গ আক্রমণ করে তা ধ্বংশ করেন ও ঈসা খান আত্মরক্ষার জন্য ত্রিবেণীর দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে কেদাররায় উক্ত দূর্গ আক্রমণ করে খিজিরপুর লুণ্ঠন করেন। এদিকে যখন কেদাররায় স্বীয় অসিম শক্তি প্রভাবে ঈসা খানের দূর্গ বিধবস্ত করে মুসলমানদের ঘৃণিত প্রার্থনার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়েছেন মনে করে কিঞ্চিত আরাম অনুভব করছিলেন ঈসা খানও এক বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় কেদাররায়ের সর্বনাশ সাধনে ব্রতী হলেন। শ্রীমন্ত খান[১১] কেদাররায়ের অমাত্য ছিলেন। কিন্তু তাকে উপেক্ষা করে এক সময় কেদাররায় কোটিশ্বরের দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতিত্ব প্রদান করেন। শ্রীমন্ত এর প্রতিকুলতা চরণ করে, কিন্তু পরিশেষে রাজজ্ঞায় ঐ দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতি বলে মানতে বাধ্য হন।

এই ঘটনা হতেই শ্রীমন্ত খাঁ হৃদয় মধ্যে এ রাজপরিবারে অনিষ্ট চিন্তা করে আসছিলেন। সুযোগ বুঝে শ্রীমন্ত গোপনে ঈসা খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঈসা খান শ্রীমন্তকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন ও বহু অর্থ পরিতোষিক প্রদানে শ্রীমন্ত খাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যে, উপায়ই হোক সোনামণিকে আনিয়া আমার অস্কশায়িনী, করে দিতে হবে। শ্রীমন্ত খাঁ এতে স্বীকৃত হয় এবং অল্পকালের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্পর্ণময়ীকে ঈসা খানের হস্তে সমর্পণ করে। এতদূর কৌশলের সহিত এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়ে ছিল যে, চাঁদরায় ও কেদাররায় এর বিন্দু মাত্র জানতে পারেন নি। কথিত আছে যে, চাঁদরায় ঈসা খান কর্তৃক সোনামণির এরূপে অপহরণ ব্যাপারে অবগত হয়ে লজ্জায় ও অপমানে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং অল্পকালের মধ্যেই কোটিশ্বরের পদমূলে স্বীয় নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করে জগতের সর্ব প্রকার গ্লানি হতে উদ্ধার লাভ করেন।[১২]

উল্লেখিত আলোচনায় দু'টি বর্ণনায় যে সত্যটি পাওয়া যায় তা হল, ঈসা খান স্বর্ণময়ীকে বিয়ে করেছিলেন। অন্যদিকে কোহিনুরের প্রবন্ধে বলা হয়েছে স্বর্ণময়ী বা সোনামণিই প্রথম ঈসা খানের নিকট প্রেম নিবেদন করছিলেন। আর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বলেছেন, ঈসা খান স্বর্ণময়ীর প্রেমে বিমুগ্ধ হন।

---

[১১] যশোদলের সীমন্ত রাজা শ্রমন্ত খান ঈসা খার একজন বিশ্বস্ত অমাত্য ছিলেন। এখানে তার কথাই আলোচিত হচ্ছে। অনেকের মতে শ্রীমন্ত চাঁদরায় ও কেদাররায় রাজ পরিবারের সাথে বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। যোগন্দ্রনাথ বিদ্বেষ বশতঃ তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে উল্লেখ করেছেন। যশোদল কিশোরগঞ্জ শহর থেকে মাত্র দুই কি.মি. দূরে অবস্থিত। রাজা শ্রীমন্ত রায়ের বসতবাটির চিহ্ন বিগত শতাব্দির মাঝামাঝি সময়েও পরিদৃষ্ট হত।

[১২] শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিক্রমপুরের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯১

Dhaka University Institutional Repository

তবে বিষয়টিকে আরো তথ্যভিত্তিক করে উপস্থাপন করেছেন "ঈসা খান" নামে গ্রন্থে মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান বলেন, স্বর্ণময়ী গর্ভে জন্ম গ্রহণকৃত ঈসা খানের পুত্র আদম খানের অধঃস্তন পুরুষদের বংশ পরম্পর লালিত বর্ণনাটিতে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। ঈসা খানের সতেরতম বংশধর চৌধুরী হারুন আকবর নামায় 'দেওয়ান আদম খা' পুস্তকে বলেছেন যে, চাঁদরায় ছিলেন বার ভূইয়ার অন্যতম। ঈসা খান এই সুবাদে চাঁদরায়ের বাড়িতে বিভিন্ন শলাপরামর্শের জন্য যেতেন । বিধবা যুবতী স্বর্ণময়ীকে রাজকার্যে পরামর্শ সভায় অংশ নিতেন।

যার দরুণ ঈসা খানের প্রতি আকৃষ্ঠ হন তিনি। ঈসা খানের ও স্বর্ণময়ীর প্রবল অনুরক্ত হয়ে পড়েন। ফলে তিনি চাঁদরায়ের কাছে বিয়ের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠান। চাঁদরায় এতে অপমান বোধক্রমে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। এদিকে স্বর্ণময়ী পিতার অমত সত্ত্বেও বিশ্বস্ত রাজ অমাত্য শ্রীমন্ত রায়ের সহযোগিতায় শ্রীপুর থেকে নৌকাযোগে গোপনে ঈসা খানের সমীপে খিজিরপুরে চলে আসেন। অন্যমতে লাঙ্গলবন্দের মেলা থেকে পালিয়ে আসেন। এগারসিন্দুর দূর্গে মহাধুমধামের সাথে তাদের বিবাহ হয়। স্বর্ণময়ী দেবী ইসলাম ধর্ম গ্রহণে 'অলিনেয়ামত খানম' আখ্যা প্রাপ্ত হন।[১৩]

চাঁদরায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী বা সোনামণিকে ঈসা খানের বিবাহ বিষয়ে কোন মতানৈক্য উল্লিখিত বিবরণগুলোতে নেই। স্বর্ণময়ী বৈধব্য জীবনের প্রতি অনুকম্পা বশত ঈসা খান সোনামণিকে বিবাহ করার মত যে মহৎ কাজটি করছিলেন তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। তবে চাঁদরায় এই যাতনায় দেব মন্দিরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন একথা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ আবুল ফজলের আকবর নামায় প্রদত্ত বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দ আফগান সরদার খাজা সোলায়মান খান ও ওসমান খান উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে তাদের সৈন্য সামন্তসহ ভূষণায় চলে আসেন। তখন চাঁদরায় ও কেদাররায় তাদেরকে আশ্রয় দেন। আবুল ফজলের মতে চাঁদরায় ঐ সময় আফগানদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করতে মনস্থ করেন। কিন্তু আফগানরা ঐ ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে চাঁদরায়কে হত্যা করেন।[১৪]

এমতাবস্থায় বিবিধ ঐতিহাসিকদের লেখায় ঈসা খানের সাথে স্বর্ণময়ীর বিবাহ সম্পাদনের পর লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে কোটীশ্বরের পদমূলে স্বীয় নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করেন। এ বর্ণনাটি সত্য নয় বলে মনে হয়। ঈসা খান স্বর্ণময়ীকে বিয়ে করছিলেন ১৫৮৬ অথবা ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ দিকে। অথচ চাঁদরায় ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

---

[১৩] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[১৪] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১১

তবে এ বিষয়টি সত্য যে, ঈসা খানের নিকট স্বর্ণময়ী চলে আসার পর এগারসিন্দুর দূর্গে তাদের বিবাহ কার্য সম্পাদন হওয়ার পর চাঁদরায় ও কেদাররায়ের সাথে ঈসা খানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং এ পর্যায়ে ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দ দিকে চাঁদরায় ও কেদাররায় ঈসা খানকে আক্রমণ করে কালাগাছিয়া দূর্গ সাময়িকভাবে অধিকার করলেও ঈসা খানের সাথে সাথেই এ দূর্গটি পুনরাধিকার করেন।

উল্লেখ্য যে, ঈসা খান প্রথম বিয়ে করেছিলেন সিলেট বিজয়ী সৈয়দ নাসিরউদ্দিন সিপাহসালার (র.)-এর তৃতীয় অধঃস্তন পুরুষ সৈয়দ ঈব্রাহিম মলিকুল-উল-উলামা (র.)-এর কন্যা সৈয়দা ফাতেমা খাতুনকে। স্বর্ণময়ী বিবাহ করার পর তার নাম রাখা হয় আলিনেয়ামত খানম।

এ প্রসংগে মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান দেওয়ান "ঈসা খাঁ" নামক গ্রন্থে বলেন-ঈসা খান প্রথমতঃ শ্রীহট্ট বিজয়ী নাসিরউদ্দিন সিপাহসালার পৌত্র সৈয়দ ইব্রাহিম মালেকুল-উল-উলামা (র.)এর কন্যা বঙ্গের স্বাধীন সুলতান সৈয়দ হুসেন শাহের দৌহিতা ফাতেমা খাতুন কে[১৫] বিবাহ করেছিলেন। এখন রায় নন্দিনী সোনামণিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করত এগারসিন্দুর দূর্গে মহাধুমধামে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। অতঃপর রায়নন্দিনী আলী নেয়ামত খানম আখ্যা প্রাপ্ত হলেন।[১৬]

সৈয়দা ফাতেমা খাতুন ও আলিনেয়ামত খানমের গর্ভে জন্ম নেয়া ঈসা খানের সন্তানদের বংশ লতিফা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঈসা খানের অধঃস্তন পুরুষদের মধ্যে যারা হয়বতনগর জঙ্গলবাড়ি এবং ভাগলপুরসহ অন্যান্য স্থানে অবস্থান করছেন তাদের কর্তৃক সংরক্ষিত বংশলতিকায় আলিনেয়ামত খানমের গর্ভে জন্মগ্রহণকৃত সন্তানদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কেবলমাত্র সৈয়দা ফাতেমা খাতুনের গর্ভে যারা জন্ম গ্রহণ করছিলেন বংশ লতিকায় তাদের নামই উল্লেখ করা হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে, আলিনেয়ামত খানমের গর্ভে আদম খান ও বিরহিম খান নামে দু'জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করছিলেন। স্বরূপ চন্দ্র রায় 'সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে ঐ বংশের যে বংশ লতিকা প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তিন সন্তানের নাম আদম খান, বিরহিম খান এবং আবদুল্লাহ খান। অন্যদিকে সৈয়দা ফাতেমা খাতুনের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী পুত্র সন্তানের নাম

---

[১৫] এই ঘটনা উপলক্ষে আনন্দ নাথ রায় "বার ভূঞা" গ্রন্থের, পৃ.৭৭-৭৮, ফরিদপুরের ইতিহাস, ১ম খন্ডে, পৃ. ৪৫-৪৬ পৃ.

[১৬] মোহাম্মদ মতিউর রহমান, দেওয়ান ঈসা খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

জঙ্গলবাড়ি ও হয়বত নগরের দেওয়ান সাহেবের নিকট সংরক্ষিত বংশ লতিকায় মুসা খান ও মুহাম্মদ খানের উল্লেখ রয়েছে।

সমসাময়িককালে ইতিহাস লেখক মির্জা নাথান, যিনি ঈসা খানের পুত্র মুসা খান মসনদ-ই-আলার সাথে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন এবং ঐ সকল যুদ্ধের বিবরণ তা নিজের লিখা 'বাহরিস্থান-ই-গায়বী' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই গ্রন্থে ঈসা খানের পুত্র এবং ভ্রাতৃস্পুত্রের নামসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। মির্জা নাথান ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের একজন সেনাপতি। মির্জা নাথান তার গ্রন্থে এক জায়গায় মুসা খানের কণিষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে আবদুল্লাহ খানের নাম[১৭] এবং ঐ গ্রন্থের অন্যত্র ইলিয়াস খানের নাম উল্লেখ করেছেন।

মির্জা নাথান ঈসা খানের এই দুই সন্তানের নাম উল্লেখ করে যে, বিবরণী উপস্থাপন করেছেন তাতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, আবদুল্লাহ খান ও ইলিয়াস খান সৈয়দা ফাতেমা খাতুনের গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। জঙ্গলবাড়ী এবং হয়বত নগরের দেওয়ান সাহেবের নিকট রক্ষিত বংশ লতিকা কেন তাদের নাম সংরক্ষিত হল না তা বোধগম্য হচ্ছে না।

অবশেষে ঈসা খান যে শুধু বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুন্য রাখার জন্যই চেষ্টা করেন, তাই না বরং তিনি একজন শক্তিশালি ঈমানদার বীর ছিলেন। যেই কারণে আমরা দেখি ঈসা খানের নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য রায়নন্দিনী অনুরোধ করেন এবং ইসলাম গ্রহণের পরে বিবাহ করেন।

[১৭] মির্জা নাথান, বাহারিস্তান–ই–গায়বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের ও মানসিংহ

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দিতে ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁকে এগারসিন্দুর[১৮] একটি উন্নত বন্দর ছিল। দেশ দেশান্তর হতে সমাগত বণিকগণের বাণিজ্যতরী মাস্তুল সমূহ নদীবক্ষে শাখা পল্লববিহনী অরণ্যানীর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হত। আমির ওমরাহ ও বণিকগণের প্রাসাদোপম সুন্দর সুন্দর আবাম বাড়িসমূহ নয়ন-মনের তৃপ্তি সাধর করত। এবং বন্দরের সম্মুখে ব্রহ্মপুত্র হতে তদীয় শাখা বানার নদী পশ্চিমাভিমুখে কিয়দূর প্রবাহিত হয়ে শীতলক্ষা নদীর সহিত মিলিত হয়েছে। ঈসা খান এই এগারসিন্দুরে দূর্গ নির্মাণ করে তিন দিক হতে আগত জলপথ নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন।

মোঘল সুবাদার শাহবাজ খাঁর পরাজয়ের পর প্রায় নয় বৎসরকাল অতিবাহিত হল। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে বাদশাহী সৈন্য কাশ্মীর, বেলুচিস্তান, কান্দাহার, সিন্ধু ও উড়িষ্যার বিজয় কার্য ব্যাপক থাকায় নদীবহুল পূর্ববঙ্গের দিকে সম্রাটের মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয় নি। তদানীন্তন সুবাদার উজির খাঁ বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের শান্তি স্থাপন কার্যেই ব্যাস্ত ছিলেন। সুতরাং এই নিস্তব্দতাকে প্রবল ঝড়ের পূর্বলক্ষণ মনে করে ঈসা খান যথাশক্তি প্রস্তুত করলেন। তিনি পূর্বের ন্যায় এগারসিন্দুরকেই শত্রুর বল পরীক্ষার উপযুক্ত স্থান মনে করে দূর্গের চতুর্দিকে পরিখা খনন ও মৃন্ময় প্রাচীর নির্মাণ করে তাকে ব্যাঘ্র মুখ কামানসমূহ স্থাপন করেন। নদীবক্ষে অসংখ্য ছিপ, কোষা, ভাওয়ালিয়া, বজরা রণ সাজে সজ্জিত হয়ে ভাসমান রইল। দূর্গের পশ্চাদভাগে শঙ্খনদী ও বিলভরায় বন্দরের বাণিজ্যতরী সমূহ যথা সময়ে স্থানান্তরিত করার বন্দোবস্ত করা হল। সৈন্য ও নাগরিকগণ শত্রু আক্রমণ প্রতীক্ষায় সতর্কভাগে কাল যাপন করতে লাগল। ঈসা খান বিভিন্ন দূর্গ ও ঘাটিসমূহের রণসজ্জা পরিদর্শন করে বেড়াতে লাগলেন।[১৯]

---

[১৮] ঈসা খানের মুত্যুর পর এগারসিন্দুরের গৌরব হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালে আসামে রাজা ৫০০ রণতরী নিয়ে জলপথে ব্রক্ষপুত্রের তীরস্থ নগর রাজাবন্দী লুণ্ঠন করতে করতে এগারসিন্দুর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন বর্তমানে নিরখিন শাহ শাহ গরীবুল্লাহ ও কয়েকজন অজ্ঞান লোকের পাকা সমাধি ও দু'ইটি সমসজিদ অক্ষুন্ন'রেখে এর সাক্ষ্যদান করতেছে বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত

[১৯] মুহাম্মদ মতিউর রহমান দেওয়ান, ঈসা খা, প্রাগুক্ত,পৃ. ২০-২৩

Dhaka University Institutional Repository

১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ জয়পুররাজ মানসিংহ বঙ্গবিহারের সুবাদার পদপ্রাপ্ত হয়ে গঙ্গার তীরবর্তী রাজমহলে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। বিহারে শান্তিস্থাপন করে মানসিংহ উড়িষ্যার বিদ্রোহী নেতা কৎলু খার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কিন্তু কতলুখান ও তার মৃত্যুর পর তৎপুত্র বায়েজিদ খাঁ, নাসির খাঁ, জামাল খাঁ ও ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমান খাঁকে[২০] পরাভূত করে তদঞ্চলে শক্তি স্থাপন করতে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হল। অবশেষে ১০,০০০ মোঘল ও রাজপুত সৈন্য ও ৫০টি কামান নিয়ে[২১] রাজা মানসিংহ ঈসা খানের রাজ্যের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত তাজপূর্ব দূর্গ[২২] অধিকার করেন। এই অভিযানে মোঘল বাহিনী রসদ সরবরাহের ভার সম্রাট সাঈদ খান পন্নিকে[২৩] (বর্তমান করটিয়ার জমিদার বংশের পূর্বপুরষকে) অর্পণ করেন। এই কাজের জন্য সাঈদ খান আটিয়া পরগনা জায়গীর লাভ করেন।[২৪]

১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ ১৭ই মার্চ সম্রাট জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের পুত্র যুবরাজ সেলিমের নির্দেশে রাজা মানসিংহ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। রাজা মানসিংহ বাংলায় আসার সময় তার পুত্র দুর্জনসিংহ ও হিম্মতসিংহসহ জগতসিংহ, শক্তিসিংহ ও রাজা রামচন্দ্র দেব ও বেশ কিছু সংখ্যক মোঘল আমত্য বাংলায় আগমন করেন।[২৫]

মানসিংহ মধুপুরে উপনীত হলে ফজলগাজীর নেতৃত্বে ঈসা খানের সৈন্যগণ মোঘল বাহিনীর গতিরোধ করে। যুদ্ধে পাঁচ সহস্র মোঘল সৈন্য হতাহত হল।[২৬] মানসিংহ কিছুদিন তথায় অপেক্ষা করেন। ইতোমধ্যে তার সাহায্যার্থে আরও নতুন সেনাদল এসে পৌছি। তিনি ঈসা খানের রাজধানী সোনারগাঁও আক্রমণ করলেন ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

এক দল দূর্গে অবস্থান করে ঈসা খান তার রাজধানীর পতন সংবাদ প্রাপ্ত পেলেন। কিন্তু তিনি মোঘল বাহিনীর সম্মুখীন না হয়ে এগারসিন্দুর দূর্গে প্রস্থান করেন। গুপ্তচরমুখে সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে

---

[২০] পরাজিত ওসমান খাঁ ঈসা খানের শরণাপন্ন হলে ঈসা খান তাকে বর্তমান মোমেনশাহী জেলার বোকাইনগর নামক স্থানে বাস করতে অনুমতি দান করেন এবং মোমেনশাহীর উত্তর পূর্বাংশ ও শ্রীহট্ট জেলার ইসলাম খানের সঙ্গে যুদ্ধে (১০২১ হিজরীর নর্থ মহরম) ওসমান খা নিহত হন।

[২১] উহা বর্তমানে দিনাজপুর টাউনের দক্ষিণে অবস্থিত

[২২] সাইদ খাঁ পন্নি বংশ তালিকা গবেষণার শেষদিকে প্রদত্ত হল

[২৩] (সাউলাতী, পাগায়ী) পৃ. ৫৩৭

[২৪] কোহিনুর ২য় বর্ষ, ১৩১৯ সাল, ৩য় সংখ্যা

[২৫] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

[২৬] মোঃ আবদুল কাদের বি.সি.এস. কৃত মোসলেম কীর্তি ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

রাজা মানসিংহ লক্ষ্যা নদীর উজান পথে যাত্রা করে ক্রমে বানার নদীর বাম তীরে তোটকের (টোঁক) প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিলেন। দশ বছর পূর্বে এই টোকের প্রান্তরে ঈসা খান অপুর্ব রণকৌশলে সুবাদার শাহবাজ খাঁ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। মানসিংহ পুর্বপরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পুনরায় টোকের প্রান্তরে যুদ্ধে জন্য প্রস্তুতি নিলেন।

একদিন ঈসা খানের দূত মোঘল শিবিরে উপনীত হয়ে রাজা মানসিংহের নিকট একপত্র প্রদান করলেন।[২৭] পত্রে লেখা ছিল "মহারাজ আপনি বঙ্গেদেশ জয় করিতে আসিয়াছেন, আর আমি মাতৃভুমির স্বাধীনতা রক্ষায় কৃতসংকল্প। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। তাহাদের কৃতকার্যতার উপর আপনার বা আমার বাহাদুরী নির্ভর করিতেছে। যদি তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে আপনার বা আমার বীরত্বের কোনই মূল্য থাকিবে না। আমরা দুইজনের মধ্যে যেই মারা যাই, তৎপক্ষীয় সৈন্যগণ নিশ্চয়ই ছত্রভংগ হইয়া পলায়ন করিবে। অপরের ছেলের মস্তকের বিণিময়ে গৌরব অর্জন করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। অতএব, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, আপনার সঙ্গে প্রাচীন কালীন রণনীতি অনুযায়ী মল্লযুদ্ধ দ্বারা আমাদের শক্তির পরীক্ষা হউক। আপনি জয়ী হইলে, আমাকে বন্দী বা হত্যা করিয়া পুর্ববঙ্গ অধিকার করিবেন, আর যদি আপনি পরাভূত হন তবে আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকিবে। এই প্রস্তাবে আপনি সম্মত হইলে আগামীকাল্য ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরবর্তী চাঁদপুরের[২৮] প্রান্তরে আমাদের শক্তি পরীক্ষিত হইবে। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নিরস্ত্র ও যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিয়া আমাদের মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন করিবে মাত্র। এখন আপনার মতামত জ্ঞাপন করবেন।"[২৯]

ঈসা খানের এইরূপ প্রস্তাবে রাজা মানসিংহ বিস্মিত হয়ে দূতের নিকট স্বীয় স্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। পরদিন উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নিরস্ত্রভাবে প্রান্তরের দুই পার্শ্বে দর্শকরূপে সমবেত হল। ঈসা খান অশ্বারোহণে রণস্থলে উপনীত হয়ে মানসিংহের প্রতীক্ষায় দন্ডায়মান হলেন। কিন্তু রাজপুতরাজ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত না হয়ে তদীয় জামাতা দুর্জন (দুর্জয়) সিংহকে প্রেরণ করেন। যা হোক, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর রাজ জামাতা ঈসা খানের তরবারির আঘাতে দ্বিখন্ডিত হয়ে ভুপাতিত

---

[২৭] এগারসিন্দুরের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের ত্রিমোহনা অর্থাৎ পূর্ব উত্তর তীরে এগারসিন্দুর দক্ষিণ তীরে তোটক, পশ্চিম উত্তর তীরে চান্দপুরে অবস্থিত। ঈসা খানের ছাউনি এগারসিন্দুর এবং রাজা মানসিংহের শিবির তোটকে অবস্থিত ছিল।

[২৮] কামান বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে মল্ল যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ কাহার পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছিল সঠিক জানা যায় না। হিন্দু লেখকগণ মানসিংহের পক্ষে দায়ী করে বাস্তবকার্যে দেখা যায় ঈসা খানের পক্ষে।

[২৯] ময়মনসিংহের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬, বার ভূঞা, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭০, এই যুদ্ধের জন্য ব্রহ্মপুত্র নদেও পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগ কাভাওয়াল নামে পরিচিত।

হলে পাঠান শিবিরে বিপুল জয় ধ্বনি উত্থিত হল। জামাতার নিধন-সংবাদে মানসিংহ কাল বিলম্ব না করে পাঠান বীরের সম্মুখীন হলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয়ে অদ্ভুত রণ-কোশীল প্রদর্শন করলেন বটে, কিন্তু জয় পরাজয় নির্ধারিত হল না। সুর্যসিংহ আস্তাচলে গৃহাশায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় বীর স্ব-স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল। কিন্তু জয় পরাজয় পূর্ববৎ অনিশ্চিত রইল। তৃতীয় দিন যুদ্ধক্ষেত্রে ঈসা খানের অস্ত্রাঘাতে মানসিংহের একমাত্র তরবারি খন্ড খন্ড হয়ে গেল।[৩০] রণশ্রান্ত ও নিরস্ত্র মানসিংহ কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণপূর্বক দন্ডায়মান রইলেন। রাজাকে নিরস্ত্র দেখে ঈসা খান স্বীয় কোষ হতে অপর একটি তরবারি মানসিংহের হস্তে তুলে দিয়া বলেন, 'মহারাজ আমি নিরস্ত্র শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করি না। নিন এই তরবারির দ্বারা আমার সংগে যুদ্ধ করুন'। ঈসা খান এরূপ সৌজন্য ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে মানসিংহ তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন এবং তাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেন। তৎমুতুর্তে উভয়ের মানসিক বৈরীভাব গাঢ় মিত্রতার পরিণত হল। এই অপুর্ভ মিলন দৃশ্য দেখে রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের আনন্দ-কোলাহলে দিগমন্ডল মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।[৩১]

এ বিষয়টির উপর আরো আলোচনা করা প্রয়োজন, ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ ৭ই ডিসেম্বর রাজা মানসিংহ ঈসা খানের রাজস্ব আক্রমণের জন্য ভাটি অঞ্চলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু রাজা মানসিংহ বগুড়া জেলার শেরপুর পৌছার পরই প্রবল বর্ষা শুরু হয়ে যায়। ফলে তিনি সেখানে শিবিরে স্থাপন করে অবস্থান করতে থাকেন। মানসিংহ সেখান থেকে তার পুত্র দুর্জনসিংহকে এক বিশাল বাহিনীসহ ভূষণার দূর্গ অধিকারের জন্য প্রেরণ করেন। খাজা সোলায়মান খান লোহানী ও কেদাররায় ঐ সময় ভূষণার দূর্গকে মোঘল আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য তাদের সৈন্য সামন্তসহ প্রাণপণ যুদ্ধ করেও দুর্জয়সিংহকে প্রতিহত করতে না পেরে সোলায়মান খান লোহানী নিহত হন এবং রাজা কেদাররায় আহত অবস্থায় ঈসা খানের নিকট চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৩২] আর দুর্জয়সিংহ ভুষণার দূর্গ অধিকার করেন।

১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ জুলাই মাসে রাজা মানসিংহ শেরপুর থেকে রংপুরের গোড়াঘাটে এসে অবস্থান নেন। ঐ সময় তিনি হঠাৎ করে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে যাবার প্রেক্ষিতে রাজকীয় চিকিৎসকরা তার জীবন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। ঈসা খানের নিকট এই সংবাদ পৌছার পর মাসুম খান

---

[৩০] মোঃ মতিউর রহমান, দেওয়ান ঈসা খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৩১] মোহাম্মদ মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[৩২] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৯

Dhaka University Institutional Repository

কাবুলী ওয়াহেদ খান ও বীর করিমের নেতৃত্বে এক বিশাল নৌবহর মোঘল সৈন্যদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য অতিদ্রুত তাদের অবস্থানের ২৪ মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌছেন। ঐ সময় ঈসা খানের বাহিনীকে প্রতিরোধ করার মত সামরিক শক্তি মোঘলদের ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে বর্ষার পানি কমে যেতে শুরু করলে ঈসা খানের নৌবহরগুলো গুপ্তকনায় আটকে যাবার ফলে অতিদ্রুত তাদের নৌবহর ও সৈন্য সামন্ত নিয়ে পিছনের দিকে চলে আসতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় মোঘল সৈন্যগণ ব্যাপকভাবে তাদেরকে আক্রমণ করলেও কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। ঈসা খান তার নৌবহর ও সৈন্যদেরকে নিয়ে নিরাপদে এগারসিন্দুরে চলে আসেন।[৩৩]

এরিমধ্যে রাজা মানসিংহ তার অসুস্থ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সামগ্রিক অবস্থা নিরূপণ পূর্বক তার পুত্র হিম্মতসিংহের নেতৃত্বে এক বিশাল সামরিক বাহিনী ঈসা খানের বিরুদ্ধে এগারসিন্দুরে প্রেরণ করেন। হিম্মতসিংহ ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীর এগারসিন্দুরের অপর পাড়ে এসে শিবির স্থাপন করেন। ঈসা খানের বিপুল পরিমাণ নৌবহর সামরিক সরঞ্জাম ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে হিম্মতসিংহ ঘোড়াঘাটে ফিরে যাবারই সিদ্ধান্ত নেন। তবে যাবার সময় ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পাড় এলাকা জুড়ে লুটতরাজের মাধ্যমে ত্রসের রাজত্ব কায়েম করেন।[৩৪] হিম্মতসিংহের এই অমানবিক কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে ঈসা খান তাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য বীব করিম ও ওয়েহেদ খার নেতৃত্বে বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য মোঘল অবস্থানের দিকে প্রেরণ করেন। ঈসা খানের বাহিনী মোঘলদেরকে ধাওয়া করতে করতে ময়মনসিংহের নিকট হাউড়ায় আক্রমণ করে নাস্তানাবুদ করে তুলে। এমতাবস্থায় হিম্মতসিংহ লুটতরাজ কৃত ধনসম্পদ ও অস্ত্রসস্ত্র ফেলে রেখেই ঘোড়াঘাটের দিকে পলায়ন করে। ঘোড়াঘাটে ঈসা খানের অভিযান ব্যর্থ হবার পর তিনি অন্য উপায়ে মোঘলদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখার চিন্তা করেন। কারণ ইতোপূর্বে বাংলায় নিযুক্ত মোঘল সুবাহদার মানসিংহের ন্যায় গুরুত্ব দিয়ে ঈসা খানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়নি। রাজা মানসিংহই একমাত্র সুবাহদার যিনি ক্ষমতা প্রাপ্তির পরপরই বাংলার স্বাধীন বার ভূঞাদেরকে সম্রাট আকবরের অধীনস্থ করার সর্বোপরি চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বার ভূঞাদের মধ্যে ঐক্যের ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। মোঘল সাম্রাজ্য বাংলার এই অঞ্চলে সম্প্রসারনের ক্ষেত্র তৈরী করে তার সামরিক অভিযান সফল করার জন্য একটি ব্যতিক্রমধর্মী নীতিও গ্রহণ করেন। তিনি বাংলার বেশ কয়েকটি প্রাচীন হিন্দু রাজ পরিবারের কন্যাদেরকে বিবাহ করেন রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে। বেসামরিক চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে

---

[৩৩] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁ: মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬

[৩৪] স্যার যদুনাথ সরকার, দি হিষ্টী অব বেঙ্গল, ভলুম-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

মোঘল শাসন ব্যবস্থা ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এলাকায় বিস্তার ঘটেছিল সেই সামরিক প্রকৃতি অক্ষুন্ন রেখেই মানসিংহ যখন বাংলার এই অঞ্চলকে মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, তখন ঈসা খান মসনদ-ই-আলা তার রাজত্বের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে সামরিক ও কুটনৈতিক আচরণ পরিবর্তন করেন। ফলে সামগ্রিকভাবে বার ভূঞাদের মধ্যে ও মোঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল পরিবর্তন হয়।

ঈসা খান মসনদ-ই-আলা যখন অনুভব করেন, রাজা মানসিংহের সামরিক অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রেই শুধু তা কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাংলার এই অঞ্চলে মোঘল প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে তিনি এখানে এসেছেন সেইক্ষেত্রে তাকে অন্যত্র ব্যতিব্যস্ত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ পর্যায়ে তিনি কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের জ্ঞাতি রঘুদেবের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। এদিকে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তার নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে মোঘলদের প্রতি অনুগত্য স্বীকার করে নেন। ফলে ঈসা খান রঘুদেবকে কোচ বিহারের রাজা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে লক্ষী নারায়ণকে আক্রমণ করেন। এই অবস্থায় রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ সম্রাট আকবরের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের এই বিপর্যয় সংবাদ যখন মানসিংহ জানতে পারলেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সাথে সলিমনগর থেকে রাজার সাহাযার্থে গোবিন্দপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ ২৩শে ডিসেম্বর মানসিংহ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সাথে গোবিন্দপুরে মিলিত হন। ঐ সময় রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মোঘলদের সাথে সম্পর্ক ঘণিষ্ট করার লক্ষ্যে তার বোনকে মানসিংহের নিকট বিয়ে দেন। অতএব রাজা মানসিংহ তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে নব প্রতিষ্ঠিত রাজা রঘুদেবকে কোচবিহারে আক্রমণ করেন। ঐ সময় রাজা রঘুদেবের সাহায্যার্থে ঈসা খান সর্বোপরি শক্তি নিয়োগ করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ফলে মানসিংহের সাহায্যে লক্ষ্মীনারায়ণ আবারও কোচবিহারের সিংহাসন লাভ করেন। রাজা মানসিংহ কোচবিহার অধিকার করে সেখান থেকে চলে আসার পর রঘুদেব ইসা খানকে সাথে নিয়ে আবারও কোচবিহারে আক্রমণ করেন এবং কিছু অংশ অধিকার করেন এবং রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে তার একটি পুরাতন দূর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন।

১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ ৩রা মে রাজা মানসিংহ আবারও রঘুদেবকে আক্রমণ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। ঈসা খান রঘুদেবের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসলে মানসিংহ একটি অভিনব কৌশল করেন। তিনি দুর্জনসিংহের নেতৃত্বে এক বিশাল নৌ ও স্থলবাহিনী পতকুন ওয়ারকে আক্রমণ করার জন্য সোনারগাঁয়ের দিকে প্রেরণ করেন। দুর্জনসিংহ প্রথমেই কাতরাবো আক্রমন করেন। ঈসা খান

Dhaka University Institutional Repository

অতিদ্রুত কোচবিহার থেকে প্রত্যাবর্তন করে পতকুন ওয়ারের সাহায্যের জন্য দুর্জয়সিংহকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিক্রমপুর থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থান গ্রহণ করেন। এর মধ্যে মোঘল বাহিনী অতিদ্রুত বেগে ঈসা খানের অবস্থানের উপর আক্রমণের নিমিত্তে সেখানে পৌছার সাথে সাথে ঈসা খান ও মাসুম খাঁর নৌবহর মোঘল বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ ৫ই সেপ্টেম্বর দুর্জনসিংহের সাথে ঈসা খানের প্রচন্ড যুদ্ধে মোঘল বাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হয়। প্রচুর মোঘল সৈন্য নিহত ও বন্দী হয়। স্বয়ং দুর্জনসিংহ ও নিহত হন।[৩৫]

একদিকে মোঘল সৈন্যদের বিপর্যয় অন্যদিকে দুর্জনসিংহের মৃত্যুর এই অবস্থায় রাজা মানসিংহ নৌ ও পদাতিক সৈন্যদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সোনারগাঁয়ের দিকে যাত্রা করেন। মানসিংহ তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে মধুপুরে উপনীত হলে ফজলগাজীর নেতৃত্বে ঈসা খানের সৈন্যগণ মোঘল বাহিনীর গতিরোধ করে। ফলে সংঘটিত যুদ্ধে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক মোঘল সৈন্য নিহত হয়।[৩৬] ইতোমধ্যে মানসিংহের সাহায্যার্থে আরও নতুন সৈন্য এসে যোগ দেয়।

রাজা মানসিংহ তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতিদ্রুত সোনারগাঁয়ের দিকে যাত্রা করেন। ঐ সময় ঈসা খান শ্রীতলক্ষ্যা নদীর তীরে একডালা দূর্গে অবস্থান করছিলেন। রাজা মানসিংহ এই সুযোগে সোনারগাঁও আক্রমণ না করার মনস্থ করেন। তিনি মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তার নিকট বন্দী মোঘল সৈন্যদেরকে মুক্তি দেন। কিন্তু মানসিংহ ঈসা খানের সাথে যে কোন সন্ধি প্রত্যাখান করে শীতলক্ষ্যার তীরে একডালা দূর্গের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর ঈসা খান এগারসিন্দুর চলে আসেন এবং সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন।[৩৭]

এ প্রসংগে মিঃ এফ বি ব্রাউলী বর্টি বলেন, লক্ষ্যা নদী দিয়ে অগ্রসর হয়ে মানসিংহ ডেমরায় শিবির স্থাপন করেন। মানসিংহ সেখানে শিবির স্থাপন করছিলেন তার কাছে গঙ্গাসাগর নামে একটি দীঘি আজও অস্তিত্বমান। নদী ধরে এগুতে এগুতে মানসিংহ ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত ঈসা খানের দূর্গ এগারসিন্দুরে এসে পৌছলেন। দূর্গ প্রাকারের বহির্দেশে গুরুতর যুদ্ধ শুরু হল সাত দিন ধরে অবিরাম চলল সেই রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধ। রাত নেমে এল। পরদিন আবার যুদ্ধ হবে বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এটা ছিল ঈসা খানের রাজ্যের প্রাথমিক অবস্থা। পরবর্তী সময়ে ঈসা খান যখন রাজা তোডরমল কর্তৃক রাজস্ব বন্দোবস্তের চিহ্নিত এলাকাসমূহের সরকার বাজুহার, সরকার ঘোড়াঘাটে ও সরকার

---

[৩৫] আবুল ফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯৩

[৩৬] কোহিনুর, ২য় বর্ষ (১৩১৯ বাং) ৩য় সংখ্যা

[৩৭] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁ: মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

সোনারগাঁয়ের ২টি পরগনার অধীশ্বর হন তখনই মূলত তিনি পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকায় শাহনশাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

এমনিভাবে আরোও আলোচনা করেছেন মোশাররফ হোসেন শাহজাহান তার গ্রন্থ ঈসা খান মসনদ-ই-আলাতে সরকার রাজুহার এবং সরকার ঘোড়াঘাটের অধীনে যে সমস্ত পরগনায় ঈসা খানের রাজস্ব প্রতিষ্ঠা করেন তন্মধ্যে আলেপশাহী, মোমেনশাহী, হোসেনশাহী, বাড়ি বাজু, মেরাউনা, হেরানা, খারানা, শেরআলী, ভাওয়াল বাজু, দশ কাহনীয়া বাজু, সায়ের জলকর, সিংধামৈন, নসরত উজিয়াল, দরজিবাজু ও হাজরাদী এই পনরটি পরগনা বা বর্তমান শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও কিশোরগঞ্জ জেলার সমগ্র অঞ্চল এবং নেত্রকোনা, ব্রাক্ষ্মণবাড়ীয়া ও সুনামগঞ্জ জেলার কিছু অংশ রয়েছে। জাফরশাহী পরগনাছিল বর্তমান গাইবান্ধা জেলার অংশবিশেষ। বরদাখাত, সোনারগাঁও, মহেশ্বরদি, পাইটকাড়া, কাটাবার, গঙ্গামন্ডল বর্তমান ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ জিলার বিভিন্ন এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল।

ঈসা খান মসনদ-ই-আলা তার অসাধারণ প্রজ্ঞা সাহস রণদক্ষতা ও কৌশলের সাহায্যে পূর্ব বাংলার যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল তার অধিকারভুক্ত করছিলেন ঐ অঞ্চলসমূহের শাসন ক্ষমতা পরিচালিত করার জন্য প্রথমত: নারায়ণগঞ্জের অদূরে কাতরাবোতে, রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর সোনারগাঁওয়ে তার রাজত্বের রাজধানী স্থানান্তর করেন। অতঃপর ভিন্নমুখী মোঘল আক্রমণের কবলে তার রাজত্বের সুষ্ঠু শাসন ক্ষমতা পরিচালনার স্বার্থে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং এগারসিন্দুরে এক বিরাট সেনা ছাউনি নির্মাণ করেন।

রাজা মানসিংহের সাথে এগারসিন্দুরে দ্বৈরথ যুদ্ধের পর ঈসা খান এবং মোঘলদের মধ্যে আর কোন যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায় না। এগারসিন্দুরের দৈরথ যুদ্ধে ঈসা খানের মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে রাজা মানসিংহ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন ঈসা খানের মৃত্যুর পর পূর্ব পর্যন্ত মোঘলদের সাথে ঐ সম্পর্কই বিদ্যমান ছিল বলে অনেকে মনে করেন। দীর্ঘ ২৭ বছর পর্যন্ত পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে বাংলার রাজণ্যবর্গের মধ্যে ঈসা খান শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। বিপুল শক্তি, বিশাল সামাজ, অজস্র সম্পদের অধিকারী মোঘল সম্রাট আকবরের অগণিত সৈন্য সামন্তকে বছরের পর ঈসা খান মসনদ-ই-আলা প্রতিহত করেছিলেন। ঈসা খানের শৌর্য প্রতাপে মোঘল সেনাপতিরা বিব্রতকর অবস্থাতেই শুধু পতিত হয়নি, তাদের সামরিক অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল প্রতিটি সমর ক্ষেত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

শাসন শৃংঙ্খলা রক্ষায় অসাধারণ দক্ষ অমায়ীক প্রজ্ঞা বৎসল প্রকৃতি বিশিষ্ট ঈসা খান এমন একটি জনকল্যাণমূলক রাজত্বের গোড়া পত্তন করেছিলেন যে রাজত্বের চতুর্দিকের স্বাধীন ভুস্বামীগণ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ সহাঅবস্থানের ভিত্তিতেই নিজেদের অধিকারভুক্ত এলাকাগুলো শাসন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সোনারগাঁও থেকে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত এই বিস্তির্ণ অঞ্চলের উন্নতি বিধানের জন্য সমস্ত বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত অবস্থাকে অল্প সময়ের মধ্যে দূর করে তার রাজত্বকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। রানী এলিজাবেথেরে দূত রালফ ফীচ তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, ঈসা খানের রাজত্বে জিনিষ পত্রের দাম খুবই সস্তা ছিল। টাকায় চার মন চাল পাওয়া যেত। কৃষি ও বস্ত্র শিল্পক্ষেত্রে ঈসা খান চরম উন্নতি সাধন করেছিলেন। ঐ সময় জঙ্গলবাড়ী, বাজিতপুর, এগারসিন্দুর ও সোনারগাঁয়ে মসলিন বস্ত্রের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল এবং সারা বিশ্ব জুড়ে মসলিন বস্ত্রের ব্যাপক পরিচিতি ঘটেছিল। ঈসা খান পর্তুগীজ বণিকদের অবাধ বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে বিদেশী বণিকদেরকে বাণিজ্য নীতির আওতায় এনে দেশীয় বণিকদের বাণিজ্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন।

ঈসা খান অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, আখড়া নির্মাণ করে এগুলো সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত থেকে জানা যায় যে, সে যুগে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সূচনা দেখা গিয়েছিল। দুই সম্প্রদায়ের লোকদের ভেতর গ্রাম সম্পর্কও স্থাপিত হতে শুরু হয়েছিল। বাংলার স্বাধীন রাজন্য বর্গের মধ্যে একমাত্র ঈসা খানই অতি অল্প হারে প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এক কানি (৩৫ শতাংশ) জমির খাজনার হার ছিল চৌদ্দবুড়ি বা সাড়ে তিন আনা।

১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ শেষ দিকে মোঘল সুবাদার রাজা মানসিংহ তার অধঃস্তন কর্মকর্তাদের নিকট দায়িত্ব অর্পণ করে বাংলা থেকে আজমীরের দিকে যাত্রা করে ঐ সময় মূলতঃ ঈসা খান অত্যন্ত শান্তি পূর্ণভাবে তার রাজত্ব পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন।[৩৮]

ঈসা খান বাংলায় ইসলামী কৃষ্টি কালচার, তাহযীব, তামাদ্দুন রক্ষার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন অব্যহত রেখে মোঘল সেনাপতিদের হাত হতে বাংলাকে মুক্ত রাখেন এবং বাংলাতে এক সতন্ত ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলার স্বাধীনতাকে রক্ষা করেন। যা পরবর্তী যুগের পর যুগ বাংলাকে স্বাধীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

---

[৩৮] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁ: মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট সমীপে ঈসা খান

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা মানসিংহ ঈসা খানের বীরত্বে ও মহত্বে মুগ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেন। আমোদ প্রমোদে কিছুদিন অতিবাহিত হল। মানসিংহের পরামর্শে ঈসা খান সম্রাটর সংগে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন। যথাসময়ে তিনি স্বীয় কোষা সজ্জিত করে মোঘল রাজধানী আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। মোঘল পাঠানের মুক্ত নৌবহর ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যার বক্ষে অপূর্ব শোভা বিস্তার করল।

আগ্রায় উপনীত হয়ে মানসিংহ ঈসা খানকে দরবারে উপস্থিত করেন। সম্রাট আকবর মানসিংহের নিকট ঈসা খানের বীরত্ব ও মহত্ত্বের বর্ণনা শ্রবণে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন এবং তার রাজ দরবারে সম্রাটের ডান পার্শ্বে পৃথক 'মসনদে' উপবেশন করার অনুমতি প্রদান করে সম্মানিত করেন।[৩৯]

গুণগ্রাহী সম্রাট সেই দরবারে ঈসা খানকে 'মসনদে আলী' ও 'মাজুবানে বাঙ্গাল' উপাধি বার্ষিক ৩৬০০০ টাকা আয়ের নিঃকর ভূসম্পত্তি জায়গীর ও নিম্নলিখিত ২২টি পরগনার শাসনভার প্রদান করেন। (১) আলেফশাহী (২) মোমেনশাহী (৩) হুসেন শাহী (৪) বড়রাজু (৫) মেরাউনা (৬) খরানা (৭) হেরানা (৮) শেরআলী বাজু (৯) ভাওয়াল বাজু (১০) দশকাহনিয়া (১১) সায়র জলকর (১২) সিংধা (১৩) নসিরৎ উজিয়াল (১৪) দরজি বাজু (১৫) হাজরাদী (১৬) জফরশাহী (১৭) বরদাখাৎ (১৮) সোনারগাঁও (১৯) মহেশ্বরদী (২০) কাটরাব (২১) পাইটকড়া (২২) গঙ্গামন্ডল।[৪০]

---

[৩৯] ঈসা খানকে প্রদত্ত ২২শ পরগনার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া বর্তমানে অসম্ভব। কারণ রাজা টোডরমলের বন্দোবস্তের সময় পরগনা সমূহ যেরূপে বিভাগ করা হয়েছিল ঈসা খানকে সেই বিভাগনুযায়ী উক্ত পরগনার শাসনভার প্রদান করা হয়েছিল। ঈসা খানের মৃত্যুর পর তার বংশধরগণের সময় ঐ পরগনা সমূহের অধিকাংশ হস্তান্তরিত হয়ে যায়। বিশেষতঃ শাহ সুজার শানসকালে ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দ ২য় বার ১৭২২ খ্রিস্টাব্দ মুর্শিদকুলি খাঁর সময় ৩য় বার ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দ সুজাউদ্দিনের সময় এই বার এবং ১৯৬৪-৬৬ খ্রিস্টাব্দ রেজা খাঁ কর্তৃক ৫ম বার বঙ্গের রাজস্ব বন্দোবস্ত ও পরগনা সমূহের পরিবর্তন সাধিত হয়। অতএব ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক জমিদারী সমূহ পুনঃপুনঃ যেভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে তাতে ঈসা খানের অধিকারভূক্ত পরগনা সমূহের পূর্ণ পরিচয় লাভ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

[৪০] কেদারনাথ মজুমদার, প্রণীত ময়মনসিংহের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত পরগনাসমূহের প্রথম ১৫টি সরকার বাজুহার অর্ন্তগত জফরশাহী সরকার ঘোড়াঘাটের অধীন এবং অবশিষ্ট ৬টি পরগনা সরকার সোনারগাঁয়ের অর্ন্তভূক্ত ছিল।[৪১]

মোঘল রাজধানী আগ্রা নগরীতে কিছুদিন অবস্থানের পর ঈসা খান তথা হতে দ্বাদশজন ওমরা মজলিশ ও গাজীকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[৪২]

বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে ঈসা খান শুধু নামই নয় একজন কিংবদন্তি বীর যুদ্ধা ছিল। আজীবন বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। যে কারণেই দেখা যায় মোঘল সম্রাট বহুবার বাংলা দখল করার জন্য সেনাপতি সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। কিন্তু ঈসা খানের দৃঢ় মনোবলের কারণে বাংলার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন করে অসংখ্য মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

---

[৪১] বিদ্রোহ ঘোষণার পূর্বে ঈসা খানের শাসনাধীন সরকার বাজুহা ও সরকার সোনারগাঁও উভয়, পশ্চিমে গোড়াঘাট হতে পূর্ব দক্ষিণে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন সম্রাটের নিকট হতে তিনি যে ভূ-ভাগের শাসনভার প্রাপ্ত হলেন। তা পূর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। সুদীর্ঘ বার বৎসর পর্যন্ত প্রবল প্রতাপ মোঘল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করে তার যথেষ্ট শক্তিক্ষয় হয়েছিল। মোঘল রাজদরবারে অবস্থান পূর্বক মোঘল রাজশক্তির পূর্বাঞ্চল তিনি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সুতরাং সম্রাট প্রদত্ত উচ্চ সম্মান ও জায়গীর লাভ করেই তিনি শান্তভাব ধারণ করলেন।

[৪২] মোহাম্মদ মতিউর রহমান, দেওয়ান ঈসা খা; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

জীবন সন্ধ্যা

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ঈসা খানের বাকী জীবনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে দেশের প্রচলিত ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তবে এ বিষয় নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, মোঘল রাজশক্তির পরাক্রম উপলব্ধি ও সম্রাটের নিকট হতে উচ্চ রাজ সম্মান লাভ করে তার অন্তর হতে বিদ্রোহের ভাব তিরোহিত হয়েছিল এবং জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি মোঘল সম্রাটের অনুগত থেকে অতিবাহিত কওে গিয়েছেন।[৪৩]

এই সময় ভুলুয়ার (বর্তমান নোয়াখালী) লক্ষণমানিক্য অর্থ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তার কণিষ্ঠ ভ্রাতার ষড়যন্ত্রে আরাকানের রাজা 'মৈং রাজগীর' (সেলিম সাহেব)[৪৪] মগ সৈন্যগণ লক্ষণমানিক্যের অধিকারভুক্ত সন্দ্বীপ অধিকার পূর্বক ভুলুয়া আক্রমণ করেন। যুদ্ধে লক্ষণমানিক্য পরাভূত হয়ে ঈসা খানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মগ দস্যুদের উৎপাত দমনের জন্য ঈসা খানের আহবানে মোঘল সুবাদার দেশের সমস্ত ভূমধ্যকারিগণকে সাহায্য করতে আদেশ প্রদান করেন। সুতরাং পারস্পরিক বিবাদ বিস্তৃত হয়ে দেশের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান ভৌমিকগণের সৈন্যদল মোঘল বাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ভূলুয়ার মগদের অন্যতম দূর্গ 'শহর কসবা' আক্রমণ করেন। যুদ্ধে পরাভূত হয়ে মগগণ ভূলুয়া পরিত্যাগ পূর্বক সন্দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৪৫] জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি শান্তিতে যাপন করে বীরে ঈসা খান তার প্রথম পত্নী ফাতেমা খানমের গর্ভজাত মুসা খান ও মুহাম্মদ খান নামক দুই পুত্র [৪৬] ও দ্বিতীয় স্ত্রী আলী নেয়ামত খানমকে (রায় নন্দিনী সোনামণি)

[৪৩] মোঃ মউিউর রহমান, দেওয়ান ঈসা খা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[৪৪] তদানীন্তন আরাকান রাজাগণ সালের সঙ্গে ইসলামী সামন্ত সংযোজিত করতেন।

[৪৫] বার ভূঞ্রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৩

[৪৬] ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তৎসংগৃহীত পল্লীগীতি সমূহের রায় নন্দিনী স্বর্ণময়ীর আদম খান ও বিরাম খান নামক দুই পুত্রের এবং মাসিক পত্র "নওবাহারে" প্রকাশিত "ঈসা খা" প্রবন্ধে জনাব করিম উদ্দিন সাহেব ঈসা খানের দাউদ খান নামক জনৈক পুত্রের নাম উল্লেখ করেন। কিন্তু ঈসা খানের শেষ বংশধর হয়বতনগর জমিদার বাড়ীতে তাদেরকে "কুরছিনামা" রক্ষিত আছে তাতে আদম খান বিরাম খান ও দাউদ খান নামে ঈসা খানের কোন পুত্রের দৃষ্ট হয় নি। সুতরাং উক্ত বর্ণনা ভেমবর্জিত নহে

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান রেখে ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে[৪৭] পরলোক গমন করেন। ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগনার অন্তর্গত বক্তারপুর নামক স্থানে তার সমাধি বর্তমান আছে।[৪৮]

আলী নেয়ামত খানম নিঃসন্তান ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সপত্নী পুত্রদ্বয়ের অভিভাবিকারূপে রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু এ সময় তার ভ্রাতা বিক্রমপুর রাজা কেদাররায় সুযোগ বুঝে ত্রিপুরার রাজা উদয়মানিক্য ও আরাকানের মগরাজা (মংরাজগীরের সেলিম শাহ) সঙ্গে মিলিত হয়ে ঈসা খানের রাজধানী সোনারগাঁও আক্রমণ করেন। ক্রমাগত এক বৎসর পর্যন্ত বীর বিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করে এ বীরজয়া সোনাকান্দা[৪৯] দূর্গে অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন করেন। বিজেতাগণ অতপর ঈসা খানের রাজ্যের কোন কোন অংশ অধিকার করেছিল এ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে বোধ হয় মেঘনা নদীর বাম তীরবর্তী ভূ-ভাগ (যা বর্তমানে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার অন্তর্ভূক্ত) বিজেতাগণের অধিকারর্ভুক্ত হয়।[৫০]

ঈসা খানের সুশাসনে তার রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ পরম সুখে কাল যাপন করত। তখন টাকায় ৪ মন চাউল পাওয়া যেত। দুর্ভিক্ষ যে কি তা ঈসা খানের প্রজাগণ কখনও বুঝতে পারে নি। অতি অল্প হারে প্রজার নিকট হতে কর আদায় হত। এ জন্য 'কাণিক্ষেত্রে লাগল চৌদ্দ বুড়ি' এই গান করে প্রজাগণ খান সাহেবের যশ ঘোষণা করেন। অর্থাৎ এক কাণি জমির বার্ষিক খাজনার নিরিখ ছিল চৌদ্দ বুড়ি বা সাড়ে তিন আনা (এখনকার হিসেবে ১৩ টাকা ২০ পয়সার সমান)[৫১] অন্ন বস্ত্রের জন্য কেউ কখনও কষ্ট অনুভব করে নি। মোঘল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহের সময়েই (১৫৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দ)

---

[৪৭] বাব ভূঞা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

[৪৮] কোহিনুর, ২য় বর্ষ (১৩১৯) ৩য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

[৪৯] নারায়ণগঞ্জ টাউনের পূর্বদিকে শীতলক্ষ্যা নদীর বামতীরে অবস্থিত 'সোনাকান্দা' অদ্যাপি রায়-নন্দিনীর স্মৃতি বহন করতেছে। উপেন্দ্রনাথা মখোপাধ্যায় প্রণীত 'চরিতাভিধান' পৃ. ২০০

[৫০] এই সমস্ত বিপ্লবের সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে বঙ্গের মোঘল সুবাহদার রাজা মানসিংহ ১৬০২ খ্রিস্টাব্দ কেদাররায়কে পরাভুত করে তাকে করদানে বাধ্য করেন। অতএব মোঘল নৌবাহিনী আরাকান রাজ্যের অধিকারভূক্ত সন্দীপ আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে কেদাররায় মোঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধেচারণ করে মগরাজের সঙ্গে মিলিত হন। এজন্য রাজা মানসিংহ কেদাররায়ের রাজধানী শ্রীপুর আক্রমণ করেন। অতএব ফতেহপুরের যুদ্ধে ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ কেদাররায় পরাজিত ও নিহত হন। কেদার রায়ের জন্য বর্তমান কার্তিকপুরের জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ সেনাপতি শেখ কাল নয়াপাড়া জমিদার বংশের পুর্বপুরুষ মন্ত্রী রঘুনন্দন, ইদিলপুরের জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ সেনানায়ক রঘুনন্দন, দেওবোগ ও মুলপাড়ার তালুকদার বংশের পূর্বপূরুষ কালীদাস ঢালী ও রাজরাজ্য সরদার প্রাপ্ত হন। পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীরে সাহায্য পৃষ্ট মগগণ বারংবার পরাভূত হয়ে পলায়ন করে।

[৫১] বার ভূঞা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ ভ্রমণকারী Rolf Ftch সোনারগাঁয়ে উপনীত হয়ে এদেশের যে সুখ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করেছে, তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এর যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।[৫২] সুতরাং দেশে যখন পুর্ণ শান্তি বিরাজমান ছিল, তখনকার অবস্থা যে সমধিক উন্নত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৫৩]

১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ শেষ দিকে মোঘল সুবাদার রাজা মানসিংহ তার অধঃস্তন কর্মকর্তার নিকট দায়িত্ব অর্পন করে বাংলা থেকে আজমীরের দিকে যাত্রা করেন, ঐ সময় মূলতঃ ঈসা খান অত্যান্ত শান্তিপূর্ণভাবে তার রাজস্ব পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন যাবত মোঘলদের সাথে তার অবিরাম যুদ্ধের ফলে জীবনের উচ্ছলতায় কিছু ভাটা পড়ে গেল। ফলে তার পুত্র মুসা খানকে রাজ্য পরিচালনায় সুযোগ্য উত্তরাধিকারী করে গড়ে তুলার ব্যবস্থা করেন। রাজত্বের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্র মুসা খানের যথেষ্ট দক্ষতা অনুধাবন করে তাকে মসনদ-ই-আলা উপাধিতে ভূষিত করেন। সোনারগাঁও থেকে করৈবাড়ি পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ঈসা খানের শাসন ক্ষমতা সৃষ্ট পরিচালনার স্বার্থে তার মজলিশ ও অমাত্যদেরকে নিয়োগ করেন।[৫৪]

১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ মাঝামাঝি সময় ঈসা খান কিছুদিনের বিশ্রামের জন্য সোনারগাঁও থেকে মহেশ্বরদী পরগনা বর্তমান গাজীপুরের কালীগঞ্জের নিকট বক্তারপুর দূর্গের প্রসাদ বাটিতে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে যান এবং অত্যন্ত দূর্বল হয়ে পরেন। রাজকীয় চিকিৎসকরা অবিরাম চেষ্টা করেও তাকে সুস্থ করে তুলতে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের দিকে সম্রাট আকবরের দরবারের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে আবুলফজল আকবরনামায় বলেন, ঐ সময়ের একটি ঘটনা হল ঈসা খান মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বাংলার একজন বড় ভূস্বামী ছিলেন।[৫৫]

স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, ঈসা খানের মৃত্যু হয় ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ সেপ্টেম্ব মাসে। স্থানীয় ঐতিহাসিকগণ বলেছেন ঈসা খানের মৃত্যু হয় ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ তারিখে। বক্তারপুরেই এই মহান বীরের সমাধি অবস্থিত।[৫৬] ঈসা খান বাংলাকে মোঘলদের হাত হতে রক্ষা করেন এবং বাংলার স্বাধীনতা প্রতিষ্টা করেন সাথে সাথে অসংখ্য মসজিদ সরাইখানা প্রতিষ্টা করেন।

---

[৫২] বার ভূঞা, প্রাগুক্ত,পৃ. ২২২

[৫৩] মোহাম্মদ মতিউর রহমান, দেওয়ান ঈসা খাঁ: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৫৪] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

[৫৫] আবুলফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪০

[৫৬] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁ: মসনদ-ই-আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

পঞ্চম অধ্যায়

পৃ.১৫৪-১৯৯

* প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ঈসা খান ও বারভুঁইয়াগণের পরিচয়

* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) ভাটিরাজ্যের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন

* তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ) ঈসা খানের সময় বাংলাভাষা সাহিত্য

* চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঘ) ঈসা খান ও রসায়ন শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খান ও বার ভুঞাদের পরিচয়

বাংলা মোঘল নওয়ারার বিপরীতে ঈসা খান গঠন করেন ভাটি নওয়ারা। অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল সমৃদ্ধ এই পূর্ব বাংলার প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম ছিল নদীপথ। এ নদীপথেই উত্তর প্রদেশ থেকে বন্যার মত ছুটে এসেছে মোঘল সৈন্যরা। অন্যদিকে ঈসা খান মসনদ-ই-আলা তার নাওয়ারার মাধ্যমে এই আগ্রাসন শক্তিকে প্রতিহত করেছে বছরের পর বছর অসাধারণ রণকৌশলের মাধ্যমে।[১]

ষোড়শ শতকের বাংলার ইতিহাসে ভাটি এলাকার বা বাংলার পূর্বাঞ্চলের নেতা তথা বারভূঞা প্রধান ঈসা খান একটি অবিস্মরণীয় তেজোদ্দীপ্ত সাহসী নাম। আবুলফজলকৃত আইন-ই-আকরবী গ্রন্থে, তিনি মারয-বান-ই-ভাটি বা ভাটির রাজা হিসেবে আখ্যায়িত। ইউরোপীয়দের কাছে তিনি বার ভূঞাদের নেতা বলে পরিচিত। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের বাইরে বাংলার ভাটি এলাকার সীমা বলতে পশ্চিমে ইছামতি নদী, দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য ও উত্তরে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সহ উত্তর-পূর্ব সিলেটের বানিয়াচং বুঝাত। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বিধৌত ভাটি এলাকার অন্তর্গত স্থানসমূহের মধ্যে বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরার পশ্চিমাংশ ও সিলেটের পুর্বাঞ্চলসহ ভূ-ভাগকে বুঝায়। বানায় ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এলাকাটি এ অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মোঘল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নদী তীরবর্তী এগারসিন্ধুর, খিজিরপুর ও সোনাকান্দা দূর্গগুলি কাজে লাগানো হয়েছিল। বানিয়াচং কান্তুল এলাকাসমূহ পারিয়ে যাওয়ার স্থান হিসেবে উৎকৃষ্ট ও দুর্ভেদ্য ছিল। ভাটি এলাকার ভূক্তাদের নেতা সম্পর্কে খুব বেশী ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু এই নেতা ঈসা খানের ভাটির সম্মিলিত শক্তির নেতা ছিলেন তাতে কারওই দ্বিমত বা সন্দেহ নেই। তার পরিচয়ের জন্য ইতিহাসের ঘটনা বিশ্লেষণ করা দরকার। বাংলার ইতিহাসের ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

---

[১] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান "ঈসা খাঁন" প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

আফগানদের বাংলা বিজয়ের সময় থেকে বাংলার বার ভূঞাদের প্রভাব ভাটি এলাকায় ছিল একথা জেমস ওয়াইজ, নলিনীকান্ত ভট্টাশালী, যদুনাথ সরকার ও আবদুল করিম প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন। সমসাময়িক লোককথায় বার ভূঞাদের যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করে ফরিদ খাঁ সুর (পরবর্তীতে শেরশাহ) নিজ নামে মুদ্রা জারী করেন। কিন্তু মোঘল সম্রাট হুসাইনের আগমনে তিনি গৌড় ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অবশ্য শ্রীঘ্র ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর নামে আবার শেরশাহ গৌড় দখল করেন। এবার শুধু বাংলা নয়, ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ বিলগ্রামের যুদ্ধে জয়ী হয়ে শেরশাহ দিল্লীর অধিপতি হন। কিন্তু তিনি বাংলার পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকার ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে কোন প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেন নি। বার ভূঞা নেতা ঈসা খানের মাতুলালয় ও তার পূর্বপুরুষদের মুলঘাটি সম্ভবত এখানেই ছিল। এ সম্ভাবনাকে সুদৃঢ় করার পক্ষে যুক্তি এই যে, এখানে হুমায়ুন শাহের পুত্র বারবাক শাহ স্বাধীন শাসকের মত রাজত্ব করেছেন ও মুদ্রা প্রচার করেছেন ১৫৪২-১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে। এ মুদ্রা প্রাপ্তির স্থান বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ জেলার যশোদল ও সিলেট জেলার সোনাঘিরা বা ব্রহ্মপুত্র নদ ও সুরমা নদীর মধ্যবর্তী এলাকা। মুদ্রা প্রাপ্তির স্থান কেন্দ্র করে এ অঞ্চলকে বারবাক শাহের স্বাধীন এলাকা বলে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত। যদিও এরপরে বারবাক শাহের বংশধরদের লিখিত বা প্রমাণিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। বরং এখানেই ঈসা খানের পিতা সুলায়মান খানকে পাওয়া যায়। এ অঞ্চল বিজিত শেরশাহের অধীনে ছিল না। পরাজিত শক্তি বা মাহমুদ শাহের বংশধরের বা সমর্থনকারীরা সেখানে অবস্থান নিতে পারে।

দিল্লীর সরকার পরিচালনার জন্য শেরশাহ ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে আফগান বংশীয় খিজির খানের হাতে বাংলার শাসনভার অর্পণ করে দিল্লী চলে যান। খিজির খান বাংলার শেষ স্বাধীন সালতানাতের সুলতান মাহমুদ শাহের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি প্রায় স্বাধীন সুলতানের মত উচু সিংহাসনে বসে শাসনকাজ চালাতেন। তার আচরণে বিদ্রোহীভাব লক্ষ্য করে শেরশাহ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং কাজী ফজিলতের হাতে বাংলার ভার দেন। প্রশাসনের সুবিধার জন্য শেরশাহ বাংলাকে অনেকগুলি ছোট ছোট জায়গীর বা প্রশাসনিক খন্ডে বিভক্ত করেন। যদুনাথ সরকার মতে এসব প্রশাসনিক খন্ড বা ভাগগুলো বার ভূঞাদের অধীনস্ত ভূমি খন্ডের

Dhaka University Institutional Repository

মত অনেক সংখ্যায় ছিল। বার ভূঞাদের সংখ্যা বার বলা হলেও আসলে অনেক বেশী ছিল। এসব বার ভূঞা নামে পরিচিত শক্তিসূমূহ সম্মিলিত ভাবে বার ভূঞা প্রধান ঈসা খাঁর নেতৃত্বে মোঘল আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল। অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, মোঘল আমলে ১৯টি সরকারের সাথে এসব বিভক্তি বা খন্ড সমূহের কোন মিল ছিলনা। আফগানদের ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে দেখা যায় যে, শেরশাহের পর ইসলাম শাহ সুর দিল্লীর সিংহাসন আরোহন করেন। তার সময়ে বিহারে চেরোদের প্রধান মহারাজ্যের মত বাংলার ভাটি অঞ্চলের স্বাধীন শাসকদের আবির্ভাব ঘটে।

বাংলার ভাটি এলাকায় ঢাকা জেলার উত্তর পূর্বাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব ও সিলেট সংলগ্ন স্থানে বাবরাক অনুমিত শাসিত এলাকায় এসময় সুলায়মান খান এক স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন।[১] এ সুলায়মান খান আফগান ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। সাহসী আফগান বীরের সাথেই মাহমুদ শাহের পারিবারিক সম্পর্ক হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, যেমন বাংলার শাসক খিজির খার সাথে হয়েছিল। তদুপরি বার ভূঞা নেতা ঈসা খানকে আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ইসা আফগান বলা হয়েছে। অতএব ঈসা খানের পিতা সুলায়মান খান আফগান ছিলেন বলাই যুক্তিযুক্ত। বহিরাগত আফগানদের মত তিনি মাহমুদ শাহের কন্যাকে বিয়ে করে সে বংশের রাজশক্তি বা পরাজিত শক্তিকে নবাগত শক্তির বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি উপরে উল্লিখিত বারবাক শাহের স্বাধীন এলাকায় দিল্লীর সুরবংশীয় শাসক ইসলাম শাহের রাজত্ব কালে (১৫৪৫-৫২ খ্রিস্টাব্দ) স্বাধীনভাবে শাসন চালাতে শুরু করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সুলায়মান খান ছাড়া বারবাক শাহ পরবর্তী আর কোন শাসকের নাম আলোচ্য এলাকায় পাওয়া যায় না। আরও পরে বার ভূঞাদের এলাকা বলে একই এলাকা চিহ্নিত করা যায়।

---

[১] লোককাহিনী সুত্রে জানাযায় যে, সুলায়মান খান এক সময় বইস গৌত্রীয় কালীদাস গজদানী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ব্রক্ষণ দিগকে স্বর্ণ হস্তী দান করে গজদানী উপাধি পেয়েছিলেন। তার সম্পর্কে দেওয়ান ঈছা খাঁর পালায় বলা আছে.. ..নিত্য নিত্যি সোনার হস্তী বামুনেরে করে দান ।
কালিদাস গজদানীতেই হইল তার নাম।।
ভাগ্যান্বেষণে কালিদাস গৌড়ে আগমন করে হোসেনশাহী সুলতানের অধীনে রাজস্ব বিভাগে যোগদান করেন। তিনি কালক্রমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সোলাইমান খান নাম ধরণ করেন। স্বীয় প্রতিভা বলে রাজস্ব উজিরের পদে তিনি সে সময় অধিষ্ঠিত হন।

পরাজিত সুলতানী শক্তির শেষ শাসক মাহমুদ শাহের কন্যা বিয়ে করে সুলায়মান খান একটি স্বাধীন এলাকার শাসক হওয়াতে দিল্লীর শাসনের কোপানলে পতিত হন। ঠিক যেমন হয়েছিল সুরবংশীয় আফগান বীর খিজির খান, মাহমুদ শাহের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত হয়েছিল বলে শেরশাহ খিজির খাঁর আচরণে ঔদ্ধত্য খুজে পান ও খিজির খাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। এই খিজির খাঁ ও সুলায়মান খান বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়। অতএব, বারভূঞা নেতা সুলায়মান খানের পুত্র ঈসা খান খিজির খাঁর আত্মীয়।[৩]

কররানী শাসনামলে ভাটি এলাকায় ঈসা খান আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন এবং উত্তর ভারত হতে আগত পলাতক বা বিদ্রোহী আফগানদের সহায়তা দান করেন। মোঘল দরবার হতে আগত মাসুম কাবুল ও দাউদ খাঁ কররানীর সহযোগী উসমান খাঁ বার ভূঞা প্রধান খাঁর সাথে একত্রে যুদ্ধ করেছিলেন। বাংলায় কররানী শাসন প্রতিষ্ঠাতা তাজখান কররানী শাসনামল থেকে (১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ) ঈসা খান কররানীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখেছিলেন ও মোঘল আক্রমণের গতিধারার প্রতি সক্রিয় দৃষ্টি রেখেছিলেন। অতএব কররানী শাসনামলেই যে জমিদার শ্রেণীর বা বার ভূঞাদের অস্তিত্ব ছিল একথা ঐতিহাসিক সত্য।

ঈসা খান কররানী সুলতানগণের অধীনস্থ জমিদার হিসেবে জীবন শুরু করলেও স্বীয় বৃদ্ধি ও বিচক্ষণতার দরুন শীঘ্রই সোনারগাঁ অঞ্চলের একজন ক্ষমতাশালী জমিদারে পরিণত হন। তিনি উত্তরোত্তর নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে পশ্চিম সিলেট, ত্রিপুরা, পূর্ব ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধিপতি হন। ধীরে ধীরে পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার কিছু অংশ ও তার জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত হয় এবং আবুল ফজল তার আকবরনামা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, Isa acquired Fame by his ripe judgement and delebarateness and made the 12 Zamindars of Bengal Subject to himself.

ঈসা খানের জমিদারী বাইশ পরগনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে প্রবল জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। এবং বলা হয়ে থাকে যে, এগারসিন্দুরেব নিকটে ঈসা খানের সাথে মানসিংহের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মানসিংহ পরাজিত হন এবং ঈসা খানের মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাকে সাথে নিয়ে দিল্লী গমন করেন। অত:পর সম্রাট আকবর সেখানে ঈসা খানের মহানুভবতার বিবরণ

---

[৩] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন, ঈসা খাঁ: সমকালীন ইতিহাস , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯

Dhaka University Institutional Repository

শুনে তাকে বাইশ পরগনার সনদ প্রদান করেন। কিন্তু আকবরনামায় ঈসা খানের মৃত্যু সম্পর্কিত এক বর্ণনায় স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে,

> On the occurrences was the death of Isa Khan. He was a great land holder of Bengal. He had some share of prudence, but from somnolence of fortune, he did not come to court.

সুতরাং তিনি যেখানে কখনওই দরবারে গমন করেননি সেখানে আকবরের নিকট হতে সনদ লাভের কাহিনী সম্পূর্ণ রূপে কল্পনা মাত্র। প্রকৃত পক্ষে, ঈসা খান স্বীয় ক্ষমতা ও দূরদর্শিতার দ্বারাই পূর্ববঙ্গের বিশাল জমিদারীর কর্তৃত্ব অর্জন করেন। বিভিন্ন পরগনায়[৪] বিভক্ত এসব এলাকা বিভিন্ন ভূঞাদের অধীনে পরিচালিত হত। বিভিন্ন যুদ্ধের সময় এসব এলাকায় যারা বারভূঞা নামে পরিচিত ছিলেন তারা একত্রে সম্মিলিতভাবে মোঘল শক্তি প্রতিহত করার লক্ষ্যে আফগান বীর বারভূঞা প্রধান ঈসা খানের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন। বিক্ষিপ্তভাবে প্রবল শক্তিধর মোঘল বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয় বিধায় বারভূঞা এক নেতার অধীনে চলে আসেন। প্রথমে ঈসা খান কাতরাবো দূর্গে অবস্থান করে মোঘলদের আক্রমণ প্রতিহত করেন।[৫]

ষোড়শ শতকের শেষার্ধে অবির্ভূত ভাটির সম্মিলিত বারভূঞা নেতা ঈসা খানের সাথে যে সব ভূঞা নেতা যোগদান করেন এবং তার নেতৃত্বে মেনে নেন তারা হলেনঃ অষ্টগ্রামের জোয়ানশাহী ও খালিয়াজুরির মজলিশ দেলওয়ার ও মজলিশ কতুব ঢাকার উত্তরাংশ ও ভাওয়ালের ফজলগাজী, বাহাদুরগাজী, চাঁদগাজী, সুলতানগাজী ও তালাগাজী, মানিকগঞ্জের খলসী ও সিন্দুরের মধু রায় বা মাধব রায়, সরাইল ও বানিয়াচঙ্গে আনোয়ার খান সিলেটের তরফ ও সরাইলের উত্তরে মাতঙ্গের সোনাগাজীর ও পাহলোয়ান: কাতরাবো-এর ঈসা খান বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কেদাররায়; ভুলুরায় লক্ষণমানিক্য: ও অনন্তমনিণকা; গৌরীপুরের (ময়মনসিংহ) বুকাইনগরের উসমান খান; ফতেহাবাদের মজলিশ কতুব এবং ভুষণার মুকুন্দ রায়। এসব ভূঞা নিজ নিজ ভূখন্ডের প্রধান ছিলেন, কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে ছিলেন না।

---

[৪] দীনেশ চন্দ্র সেন, 'দেওয়ান ঈসা খান মসনদ আলী' প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

[৫] হাবিবা খাতুন ও হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন সুলতানী আমলের অবসানের সুযোগে তারা স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা চালিয়ে ঈসা খানের অধীনে সাহসিকতা প্রদর্শন করে ইতিহাসে অমর হয়েছেন। এসব সাহসী ভূঞাদের সাথে ১৫৪১ সাল হতে তিনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন।[৬]

আফগান নেতা ঈসা খান বাংলায় শেষ স্বাধীন হোসেন শাহী সুলতান মাহমুদ শাহের দৌহিত্র ছিলেন। তার পিতা নিজ বাহুবলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কররানীদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তাই কররানীদের সাথে ঈসা খান সরাসরি মিত্রতা না করলেও গোলযোগ এড়াবার জন্য সকল আফগানদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। উসমান খাঁ তুকারই-এর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ঈসা খানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল ও মোঘলদের বিরুদ্ধে মুসা খানের সাথে একত্রে যুদ্ধ করেছিল। ঈসা খানের ভাটি এলাকায় শেষ স্বাধীন সুলতানের ও স্বাধীন শাসকের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বলেই সকল ভূঞা নেতা তাকে নেতা বলে সহজেই মেনে নিয়েছিল। স্বাধীন রাজ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে ঈসা খানের মধ্যে বীর সুলভ গুণের ও নেতৃত্বদানের মর্যাদা লাভ সম্ভব হয়েছিল। এই নেতৃত্ব জন্যই আইন-ই-আকবরীতে 'ভাটির রাজা' শব্দের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

ঈসা খানের উপরোল্লিখিত বংশ পরিচয় যদিও আধুনিক কালের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের নিকট গ্রহণীয় তথাপি এ সম্পর্কে আরও আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কেননা প্রথমত; আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ১১৭ পৃষ্ঠায় ঈসা খানকে ঈসা আকগান বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বাংলায় মোঘল বিরোধী সংগ্রামের মূল হোতা ছিলেন আফগান/পাঠানগণ যারা সকলেই প্রায় ঈসা খানের অনুগত্য স্বীকার করেন। তাছাড়া বাংলার আফগান সালতানাতের পতনের পর দাউদ খান কররানীর বিক্ষিপ্ত আফগান বাহিনী ঈসা খানের নেতৃত্বেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল বলে জেমস ওয়াইজ উল্লেখ করেছেন। এ থেকে অনুমিত হয় যে, ঈসা খান ছিলেন আফগান বংশোদ্ভূত কেননা, আফগানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা কখনই অপর কোন জাতির বা বর্ণের নেতৃত্ব স্বীকার করে না। তৃতীয়তঃ ঈসা

[৬] হাবিবা খাতুন ও হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

খান মসনদ-ই-আলা বা ঈসা খান মসনদ-ই-আলী হিসেবেও তিনি বেশ পরিচিত লাভ করেন।[৭]

জৌনপুরের শাসনকর্তা মিঞা জামান খান সুলতান মাহমুদের শ্বশুর আজম খান হুসাইন সেরওয়ানী ও সিরহিন্দের জায়গীরদের খাওয়াস খাঁর উপাধিও ছিল মসনদ-ই-আলা। সুলতান সিকান্দারের ওমরাহ খান জাহান লোদী বা হুমায়ুন খানও ঐ উপাধি ধারণ করেন।

তাছাড়া জনশ্রুতি রয়েছে যে, দ্বৈতযুদ্ধে রাজা মানসিংহকে পরাজিত করেও হত্যা না করায় গুণমুগ্ধ রাজারা সম্রাট আকবর তাঁকে বাইশ পরগনার জমিদারী ও মসনদ-ই-আলা (প্রকৃতপক্ষে) মসনদ-ই-আলা অর্থাৎ উচ্চ সিংহাসন এখানে উচ্চ সিংহাসনে আরুঢ় ব্যক্তি (উপাধী প্রদান করেন) কিন্তু পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে, ঈসা খান কখনও দরবারে গমন করেননি। সুতরাং সম্রাট কর্তৃক উপাধী প্রদানেরই প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া আকররের তালিকায় আর কারও বেলায়ই মসনদ-ই-আলার উল্লেখ পাওয়া যায় না। রাজমালার মতে, ত্রিপুরার রাজা অমরমানিক্য তাকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন। ভিন্ন মতে, দাউদখান কররানী তাকে মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদান করেন। উপরোল্লিখিত অভিমতগুলি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বাবু মহেন্দ্রনাথ ও খান বাহাদুর আওলাদ হুসায়ন। তাদের মতামত গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে শেরখান উপাধি নেন হজরত আলা এবং সুলায়মান কররানী (১৬৬৫-৭২) আলা হজরত। মসনদ-ই-আলার সাথে এগুলোর সথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বস্তুত সে যুগে মসনদ-ই-আলা তদরূপ পদবী ছিল আফগানদের সাধারণ উপাধি। তদানিন্তন বাংলার শিলালিপিতে এটি প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন রাজ্য গঠন করতে পারলেই হিন্দুরা যেমন রাজা উপাধী গ্রহণ করতেন। প্রতিপত্তিশালী আফগানগণ তেমনি মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করতেন। বাদশারা কখনও কাউকে এই উপাধী দেন বলে জানা যায় না। কাজেই ঈসা খানের বেলায় এর ব্যাতিক্রম ঘটতে পারে না। স্পষ্টতই তিনি তৎকালীন আফগান আমীরদের অনুকরণে এই উপাধি গ্রহণ করেন।

---

[৭] মসনদ-ই-আলাকে সংক্ষেপে মচন্দালী বা মুছলন্দরী বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে লোদী সুলতানদের আমল হতেই এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সুলতান বহলুল লোদীর উপদেষ্টা ওমর খান সারওয়ানী কালা কাপুরি এর উপাধি হল মসনদ-ই-আলা লাহোরের শাসনকর্তা মসনদ-ই-আলা তাতার খান মৃত্যুর পর বহলুল লোদী তাকে ঐ শূন্য পদে নিযুক্ত করেন। তার পুত্র হায়বৎ খান ও তৎপুত্র ঈসা খান এর উপাধী গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুসা খান পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তিনিও মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করেন। মুসা খানের রাজ্য বর্তমান ঢাকা জেলার অর্ধাংশ, ত্রিপুরা জেলার অর্ধাংশ প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ (সুসঙ্গ ব্যতিরেকে) খাজা ওসমানের পরিত্যক্ত অংশ এবং সম্ভবত রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দ কেদাররায়ের মৃত্যুর পর শ্রীপুর ও বিক্রমপুরে প্রকৃত পক্ষে পুত্র মুসা খানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূসা খানের অদম্য স্বাধীনতা সংগ্রামে অসংখ্য স্থানীয় ছোট বড় জমিদার অংশগ্রহণ করেন। অর্থাৎ পিতার ন্যায় বার ভূঞাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেন। বাহারিস্তান-ই-গাইবীতে মুসাখান ও তার বারজন জমিদার মিত্রের (Musa Khan and his 12 Zamindars allies) কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। তার মিত্র জমিদারগণের মধ্যে বাহাদুর গাজী, সোনাগাজী, আনোয়ার গাজী, শেখ পীর, মীর্জা মুমিন, মধুরায়, নিনোদন রায়, পাহলেয়ান, হাজী শামসুদ্দীন বাগদাদী, দরিয়া খান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মূসা খানের তিন ভাই যথাক্রমে দাউদ খান, মাহমুদ খান এবং আবদুল্লা খান; চাচাতো ভাই আলাওল খান, তার মন্ত্রী খাজা চাঁদ। নৌসেনাপতি আদিল খান, সৈন্যাধ্যক্ষ মাই লস্কর ও জানকী বল্লভ তাকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা দেন।[৮]

মুসা খান এতদঞ্চলের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মোঘল শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে অবশেষে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ মোঘল সুবেদার ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ ঢাকায় প্রাণ ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে মুসা খানের সমাধি বিদ্যমান। সমাধির পাশে অবিস্থত মসজিদটি মুসা খানের মসজিদ নামে পরিচিত।[৯] ঈসা খানের পিতার সময় বাংলা ছিল স্বাধীন, যেখানে ইসলামী কৃষ্টি কালচার সমৃদ্ধ অঞ্চল যা পরবর্তী বার ভূইয়ার নেতা ঈসা খান, মুসা খানসহ

---

[৮] এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করার মত তা হলো ঈসা খানের উপাধি নিজে গ্রহণ করেছেন একথাটি গ্রহণযোগ্য নয় কেননা, ঈসা খানকে সম্রাট আকবর নিয়ন্ত্রণ করে তার সাহসীকতায় জন্য মসনদ-ই-আলী বা মাজুবানে বাঙ্গলী উপাধি দিয়েছিলেন।

[৯] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন, ঈসা খাঁ: সমকালীন ইতিহাস , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী উত্তরাধিকারগণ বাংলায় এই পরিবেশ ঠিক রেখেই ইসলামী সংস্কৃতি উন্নয়ন কাজ করেছেন, যে কারণেই আজ বাংলাদেশ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র।

নিম্নে বার ভূঞা সম্পর্কে আলোচনা করব ঃ

▪*ইব্রাহীম নাড়াল ও কমিদাদ মুসাজাই ঃ*

আফগান নেতা ইব্রাহিম নাড়াল ও করিমদাদ মুসাজাই উভয়ই আফগান শাসনের পতনের পর মোঘল শক্তির নিরোধিতা করেন। আকবরনামাতে মোঘল সুবাদার খান-ই-জাহান ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ পূর্ব বাংলা দখলের উদ্দেশ্যে ভাওয়ালে শিবির স্থাপন করলে এ দুই নেতা মোঘল সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। এছাড়া তাদের সম্পর্কে আর কোন তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় নি। তবে ধারণা করা যেতে পারে যে, তারা ভাটিতে ভাওয়ালের নিকটবর্তী কোন পরগনার জমিদার ছিলেন। ভট্টশালীর মতে, তারা ছিলেন যথাক্রমে সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনার জমিদার।

▪*মজলিশ প্রতাপ এবং মজলিশ দেলওয়ার ঃ*

মজলিশ প্রতাপ ও মজলিশ দেলওয়ার সম্পর্কেও বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। আকবরনামায় কেবল মাত্র একটি বিবরণে উল্লেখ রয়েছে যে, ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ মোঘল বাহিনী সরাইল ও জোয়ান শাহীতে লুটতরাজ শুরু করলে মজলিশ প্রতাপ ও মজলিশ দেলওয়ার নৌপথে তাদের আক্রমণ করেন এবং বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। ধারণা করা যায় যে, তারা যথাক্রমে জোয়ানশাহী (বর্তমান ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম)-এর খালিজুয়াজুরী (বর্তমান নেত্রকোনায় অবস্থিত একটি গ্রাম) পরগনার জমিদার ছিলেন।

▪*মাসুম খান কাবুলী ও তৎপুত্র মিরযা মুমিন ঃ*

মাসুম খান কাবুলী ছিলেন মোঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি। পরবর্তীতে আকবরের বিরুদ্ধে বাংলা ও বিহারের মোঘল সামরিক কর্মকর্তাগণের বিদ্রোহ কালে মাসুম খান কাবুলী ছিলেন বিদ্রোহীদের একজন নেতা। ১৫৮০ সনে তিনি বিদ্রোহীদের পক্ষে মীর্জা হাকিমের রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে পাবনা শহর হতে উনিশ মাইল উত্তরে চাটমোহরে তার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। মাসুম খান কাবুল কর্তৃক ৯৪৯ হিজরীতে (১৫৮১ খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত চাটমোহর মসজিদের শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, তিনি নিজেকে 'সুলতান-উল-আজম' উপাধিতে

Dhaka University Institutional Repository

ভূষিত করেন। শিলালিপিতে তাকে একজন স্বাধীন সুলতান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার রাজত্বের দীর্ঘায়ূর জন্য খোদার আর্শিবাদ কামনা করা হয়েছে। আকবর যদিও এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন কিন্তু মাসুম খান কাবুলী আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেননি। ফলে মোঘল বাহিনী তার প্রশ্চাদ্ধাবন করলে তিনি ভাটিতে আশ্রয় নেন এবং সেখানে ঈসা খানের দলে যোগ দেন। এই বিদ্রোহী নেতা ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ ঈসা খানের বাসস্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্টেপ্লটন "Note on Seven six steenth century connons recently descovered in the Dacca district" শীর্ষক প্রবন্ধ উল্লেখ রয়েছে যে, কামান গুলির একটিতে ক্ষুদ্রাকারে ফারসী অনুলিপি দেখা যায় যার অনুবাদ স্টেপ্লটনের মতে 'সরকার মাবুদ খান'। কিন্তু ভট্টশালী মনে করেন যে, তার সঠিক অনুবাদ হবে 'সরকার মাসুম খান' এবং এটি নিঃসন্দেহে মাসুম খান কাবুলীর সরকারের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অতএব ভট্টশালীর মতে কামানটি স্পষ্টতই মাসুম খান কাবুলীর।

মাসুম খান কাবুলীর পুত্র মিরযা মুমিন ঈসা খানের পুত্র মুসা খানের সাথে এক যোগে মোঘল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মিরযা মুমিন সম্ভবতঃ তার পিতার জায়গীরে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। কেননা বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে একজন জমিদার হিসেবে তার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলতঃ মাসুম খান কাবুলী জমিদার ছিলেন না, ছিলেন একজন জায়গীরদার।

▪ *চাঁদরায় ও কেদাররায় ঃ*

চাঁদরায় ও কেদাররায় ছিলেন বিক্রমপুরের জমিদার। বিক্রমপুর গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত একটি বৃহত্তম পরগনা। একদা এ স্থানে সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন (শাসনকাল আনুমানিক ১১৫৯-৭৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং বহু রাঢ়িকুলীন ব্রাহ্মণদের বাস ছিল। প্রবাদ আছে যে, মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনের প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে নিমরায় নামক এক ব্যক্তি কর্ণাট হতে বিক্রমপুরস্থ আড়া ফুলবাড়িয়া নামক স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন। নিমরায় তৎকালীন বঙ্গ অধিপতির নিকট হতে বংশ পরম্পরায় 'ভূঞা' উপাধি ব্যবহারের অনুমতি লাভ করেন। নিমরায়ের পরবর্তী বংশধর সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। পাঠান রাজত্বের শেষভাগে এতদঞ্চলের চাঁদরায় ও কেদাররায় স্বাধীন নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁরা শ্রীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাদের আবাস ছিল আড়া ফুলবাড়িয়া নামক স্থানে। সেখানে এক খন্ড জমি এখনও কেদার বাড়ি নামে

পরিচিত। এই চাঁদরায় ও কেদাররায়ের নাম সর্বদা উচ্চারিত হতে দেখা যায়। কেউ কেউ এদেরকে নিমরায়ের সপ্তম অধঃস্তন পুরুষ বলে মনে করেন। তারা ছিলেন কায়স্থ এবং তাদের পদবী ছিল দে। চাঁদরায় ও কেদাররায়ের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে পন্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন পন্ডিতের মতে, তাদের মধ্যে পিতা পুত্র সম্পর্ক এবং কারও কারও মতে তারা ছিলেন দুই ভ্রাতা। তবে শেষোক্ত মতটিই অধিক প্রচলিত। ভূঞা হিসেবে চাঁদরায় অপেক্ষা কেদাররায় বীরত্বে ও শাসন কার্যে অধিক খ্যাতি অর্জন করেন।

অধিকাংশ লেখক চাঁদরায়কে বাদ দিয়ে কেবল কেদাররায়কেই ভূঞা শ্রেণীভূক্ত করেন। সন্দ্বীপ এক সময় তাদের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়। এছাড়া ফরিদপুরের একাংশে তাদের জমিদারি ছিল। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ মোঘল কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের পর সে অঞ্চলের কতিপয় আফগান নেতা ভূষণার দিকে ধাবিত হলে সেখানে চাঁদরায় ও কেদাররায়ের সাথে তাদের যুদ্ধ হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে ভূষণা চাঁদরায় ও কেদাররায়ের দখলে ছিল। তবে কিভাবে তারা এতদঞ্চলের অধিকার প্রাপ্ত হন সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ ১১ ফেব্রুয়ারী ভুষণায় আফগানদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে চাঁদরায় নিহত হন এবং কেদাররায় ঈসা খানের সহযোগিতায় পুনরায় ভুষণার দূর্গ ও রাজ্যে অধিকার লাভ করেন। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ মানসিংহের পুত্র দুর্জনসিংহের অধীনস্থ বাহিনীর সাথে সংঘটিত যুদ্ধে কেদাররায় আহত হয়ে ভুষণা হতে পলায়ন পূর্বক ঈসা খানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও কেদাররায়কে মুসা খানের পক্ষে মোঘল শক্তির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখা যায়। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দ বিক্রমপুরের নিকটে মোঘল বাহিনীর সাথে প্রচন্ড এক যুদ্ধে কেদাররায় প্রথমে আহত ও বন্দী হন এবং পরে মৃতুবরণ করেন। কেদাররায় ছিলেন একজন দুর্ধষ বীর ও সুদক্ষ সামরিক সংগঠক। বহু পর্তুগীজ জলদস্যুকে তিনি তার নৌবাহিনীতে নিযুক্ত করেছিলেন বলে জানা যায়।

- লক্ষণমানিক্য ও অমরমানিক্য ঃ

আকবরের শাসনামলে মেঘনার পূর্ববর্তী পরগনা ভুলুয়া (বর্তমান নোয়াখালী)-এর শাসনকর্তা রাজা লক্ষণমানিক্য। বর্তমানে ভুলুয়া মেঘনার ভাঙ্গনে বিলুপ্ত। এই ভুলুয়া পরগনার নামকরণ সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। সূর নামক নিম্নশ্রেনীর কায়স্থ

Dhaka University Institutional Repository

বংশীয় রাজা বিশ্বেস্বর রায় চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডে তীর্থ যাত্রা করেন। মেঘনা নদীর চরে একরাতে তার নৌকা নঙ্গর করা ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় সেখানে তিনি সপ্নে দেখেন যে, তিনি সে অঞ্চলের রাজা হিসেবে বসতি স্থাপন করেছেন। এ স্বপ্নটিকে তিনি দৈববানী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং সে প্রেক্ষিতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। সকালে নদীর বিশালতায় তার দিকভ্রম হয়। কাজেই তিনি স্থানটির নাম দেন ভুলুয়া। অবশ্য এ কাহিনীর উল্লেখকৃত তারিখ (১০ই মাঘ, ৬১০ বাংলা অর্থাৎ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দ) সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

ডঃ ওয়াইজের মতে, উল্লিখিত বিশ্বস্বেররায়ের সপ্তম অধঃস্তন পুরুষ হলেন রাজা লক্ষণমানিক্য। লক্ষণমানিক্য ছিলেন একজন স্বনামধন্য লেখক। তার লেখা একাধিক সংস্কৃত নাটকের মধ্যে একটি হল বিখ্যাত বিজয় কুবাল[১০]। এই বিদ্বান রাজা একই সাথে অসীম শারিরীক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে জানা যায়।

কৈলাস বাবুর মতে, ভুলুয়ার জমিদারগণ ত্রিপুরার রাজার সবচাইতে প্রভাবশালী সামন্ত ছিলেন এবং ত্রিপুরার নতুন রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে রাজার কপালে তিলক পড়োনোর অধিকার কেবল ভুলুয়ার জমিদারদেরই ছিল। জানা যায় যে, বলরাম সূর নামক ভুলুয়ার একজন জমিদার ত্রিপুরার রাজা অমরমানিক্যের নীচু বংশদ্ভুত জ্ঞান করে তার অধীনতা অস্বীকার করেন। ফলে অমরমানিক্য ভুলুয়ায় আক্রমণ করেন এবং বলরামকে দমন করেন। এই সূত্র ধরেই অনেকে লক্ষণমানিক্য কেও ত্রিপুরার সামন্ত রাজা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। লক্ষণমানিক্য ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণের সমসাময়িক। তাকে প্রায়ই মগ পর্তুগীজ এবং অন্যান্য প্রতিবেশী ভুঞাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

কন্দর্প নারায়ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামচন্দ্র রাজা লক্ষণমানিক্য[১১] সর্বদা তার সম্পর্কে অবজ্ঞা সূচক মন্তব্য প্রকাশ করেন।

---

[১০] ঐার একটি অনুলিপি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এ রক্ষিত আছে। হর প্রসাদ শস্ত্রী লক্ষণ মানিক্য রচিত অপর একটি নাটক কুবালয়াস্ব চরিত্রে এর কথা উল্লেখ করেছেন।

[১১] ভুলুয়া ও চন্দ্রদ্বীপ তখন কেবলমাত্র মেঘনা নদী দ্বারাই পৃথক ছিল। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র লক্ষণ মানিক্যের বিদ্রূপের কথা অবগত হলে একদিন লোক লস্কর ও রণতরীসহ মেঘনা নদী অতিক্রম করে ভুলুয়ার নিকটবর্তী এক স্থানে নোঙ্গর করেন। লক্ষণমানিক্য এ সংবাদে কোন কিছু বিবেচনা না করেই কোন রক্ষী ব্যতিরেকে রামচন্দ্রকে স্বাগত জানাতে আসেন। রামচন্দ্র তখন তাকে বন্দী করেন এবং চন্দ্রদ্বীপে নিয়ে গিয়ে হত্যার আদেশ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণমানিক্যের পর ভুলুয়ার রাজা হন অনন্তমানিক্য। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ তিনি মোঘল সুবাদার জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খান কর্তৃক প্রেরিত বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে সম্ভবত: আরাকানে পালিয়ে যান। এরপরে তার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

মুকুন্দ্র রামরায় ও তৎপুত্র সুত্রাজিৎ এবং মজলিশ কুতুব

আকবরনামা মতে, ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ ফতেহাবাদের মোঘল ফৌজদার মুরাদখানের মৃত্যুর পর ভূষণার মুকুন্দ রামরাম নামক জনৈক তার পুত্রগণকে আমন্ত্রণ করে এনে গুপ্ত হত্যা করেন এবং মুরাদখানের সমস্ত সম্পত্তি দখলে আনয়ন করে নিজেকে সে অঞ্চলের শাসনকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিতা করেন। মুকুন্দরায় মাঝে মধ্যে সামান্য পেসকস প্রেরণ করে বাদশাহের অধীনতার ভান করেন। কিন্তু কার্যত তিনি স্বাধীন শাসক ছিলেন।

১৫৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দ তৎপুত্র সুত্রাজিৎ ভূষণায় স্বীয় ক্ষমতা প্রবল করে তোলেন। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দ মোঘল সেনাপতি ইফতিখার খানের নেতৃত্বাধীন বাহিনী ভূষণা আক্রমণ করলে সুত্রাজিৎ বীর বিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করে অবশেষে মোঘল বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে তিনি বহু মোঘল অভিযানে অংশগ্রহণ করবে বলে জানা যায়।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ফতেহাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন মজলিশ কুতুব। তিনিও ছিলেন একজন মোঘল বিরোধী শাসক। ইসলাম খানের সুবাদারীর আমলে মোঘল সেনাপতি হাবিবুল্লাহ ভূষণার রাজা সুত্রাজিতের সহায়তায় ফতেহাবাদ দূর্গ অবরোধ করলে মজলিশ কুতুব মুসা খানের সাহায্য প্রার্থী হন। মুসা খানও অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণ করেন। এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, মজলিশ কুতুব মুসা খানের একজন অন্যতম মিত্র ছিলেন। তবে উল্লেখিত যুদ্ধে মজলিশ কুতুব পরাজিত হয়ে মুসা খানের নিকট পলায়ন করেন। মুসা খান যখন মোঘল বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে ইব্রাহিমপুর দ্বীপে পলায়ন করেন তখন মজলিশ কুতুব ইসলাম

অবশ্য রামচন্দ্র অবশেষে মাতার নিষেধাজ্ঞার কারণে নিজেকে নিবৃত্ত করেন। লক্ষণমানিক্য দীর্ঘদিন রামচন্দ্রের মাধব পাশার রাজবাড়ীতে আটক অবস্থায় থাকার পর রামচন্দ্র একদিন তাঁকে দেখতে আসেন। লক্ষণমানিক্য তাকে রূঢ় ভাষায় ভৎসনা করেন। ফলে রামচন্দ্র তার আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাথে সাথে লক্ষণমানিক্যেকে মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

খানের নিকট আত্মসমর্পনে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে তিনি সুবেদারের শাহী কর্মচারী পদে নিযুক্ত হন।

ভুষণা রাজ্যের নামকরণ সম্পর্কে "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক একখানি ভৌগোলিক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, জনৈক ক্ষত্রীয় রাজা ধেনুকর্ম পুত্র কণ্ঠহার এর উপাধি ছিল বহুভূষণ। তিনি যশোরের উত্তরভাগ অধিকার করে-এর নাম রাখেন ভূষণা। সুলতানী শাসনামলে এই ভূষণা নগরটি ছিল মাতৈর পরগনার অধীনে। মোঘল আমলে সবে বাংলা যখন (উড়িষ্যাসহ) চবিবশটি সরকারে বিভক্ত হয়েছিল, তখন মাতৈর পরগনা ছিল মাহমুদাবাদের অন্তর্গত। যশোর, ফরিদপুর ও নদীয়া জেলার কিছুটা অংশ নিয়ে সে সময়ে মাহমুদাবাদ সরকার গঠিত হয়েছিল। এর মহাল ছিল অষ্টশিটি এবং রাজস্ব আদায় ছিল ১,১৬,১০,২৫৬ টাকা। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ভুষণা নগরে। এর পাশ্ববর্তী আরেকটি সরকার হল ফতেহাবাদ। আইন-ই-আকবরী মতে, বর্তমান ফরিদপুর জেলার কিছুটা অংশ এবং ঢাকা, নোয়াখালী ও বরিশাল জেলার কিছুটা অংশ নিয়ে ফতেহাবাদ[১২] সরকার গঠিত হয়েছিল। রাজা সুত্রাজিতের ঘটনাবহুল এবং বিচ্ছিন্ন কর্মজীবন জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের রাজত্বকালে সিকি শতাব্দি (১৬০৯-১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ) ব্যাপী বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি কামরূপ এবং আসাম জয়ে মোঘল অভিযানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

■ প্রতাপাদিত্য ঃ

যশোরের রাজা ছিলেন প্রতাপদিত্য। তার পিতা বিক্রমাদিত্য (পর্ব না শ্রীহরি) এবং পিতৃব্য বসন্তরায় (পূর্ব নাম জানকী বল্লভ)। আফগান সুলতান দাউদ খান কররানীর রাজত্বকালে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁরা দাউদ খান কররানী নিকট হতে সুন্দরবন অঞ্চল বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। দাউদ খান কররানীর পতনের সাথে সাথে তারা সুন্দরবনের একাংশ যশোহর[১৩] রাজ্যের পত্তন করেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের নিকট

[১২] এই মাহমুদাবাদ ও ফতেহবাদের নামের উৎপত্তি হয় বাংলা পাঠান ফতেশাহের আমলে (১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং তার নামানুসারেই ফতেহাবাদ নামকরণ করা হয়।

[১৩] আরবী জশর শব্দের অর্থ সাঁকো। একদা বর্তমান যশোর অঞ্চলে অসংখ্য নদ-নদী ছিল। স্থানীয় অধিবাসীগণ বাঁশের তৈরী সাকো দ্বারা ঐ সকল নদী খাল পার হতো বলে এ স্থানের নাম হয় যশোর। আবার বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় গৌড় হতে দাউদ খানের অপরিচিত ধনরত্ন নৌকাযোগে যশোরে আনয়ন করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে

বাংলার শাসন সংক্রান্ত ও রাজস্বের হিসাব পত্রের সমস্ত কাগজপত্র থাকায় মোঘল রাজস্বসচিব তোডরমল তাদের অনুসন্ধান করেন। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ তারা তোডরমলের সাথে সাক্ষাতপূর্বক মোঘল সামন্তরূপে যশোর রাজ্যের সনদ লাভ করেন।

প্রতাপাদিত্য এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী। জানা যায় যে, তিনি পিতা পিতৃব্য কর্তৃক মোঘলরাজ দরবারে যশোর রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে কৌশলে স্বনামে রাজ্যে সনদ আনয়ন করল। সম্ভবতঃ ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ (ভিন্ন মতে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ) প্রতাপাদিত্য নিজেকে যশোরের রাজা বলে ঘোষণা করেন। তিনি ঈশ্বরীপুর ধুমঘাট অঞ্চলে তার রাজধানী ও দূর্গ নির্মাণ করেন।

প্রাতাপাদিত্যের রাজ্যভিবেকের কিছুদিনের মধ্যেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। প্রতাপাদিত্য তার রাজত্বের প্রথম ক'বছর মোঘল সামন্ত রূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মোঘলদের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকেন এবং সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ কাছাকাছি কোন এক সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রাংকন করেছিলেন বলে সতীশচন্দ্র মিত্র উল্লেখ করেছেন। যদিও অদ্যাবধি তার কোণ মুদ্রা আবিস্কৃত হয়নি। প্রবাদ আছে যে, তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার পর রাজ্যের দীন দুঃখীদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বিতরণ করেন। এ দানের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে একটি ছাড়া প্রচলিত হয় "স্বর্গে ইন্দ্র দেব রাজ রাসুকী পাতালে প্রতাপ আদিত্য রায় অবনী মন্ডলে"।

প্রতাপাদিত্য ছিলেন একজন বীরযোদ্ধা। তিনি তার সৈন্য বিভাগে বাঙ্গালী, পাঠান, মগ, পর্তুগীজ, কুকী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় সৈনিক নিয়োগ করেন। প্রতাপাদিত্যের সেনাবাহিনী ঢালী, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ, নৌসৈন্য, হস্তীসৈন্য, মল্ল প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ঢালী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন কালীদাস রায় মদন মল্ল। অশ্বারোহী সৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষ প্রতাপসিংহ দত্ত, তীরন্দাজের অধ্যক্ষ সুন্দর ও ধুলিয়ান বেগম, নৌবহরের অধ্যক্ষ অগষ্টায় পেডো। গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলে ফ্রান্সিকো বড়া। কুকী সৈন্যেদের অধ্যক্ষের নাম রঘু।

যে, গৌড়ের যশ হরণ করে এই শহরের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়-এর স্থানীয় পুরাতন নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় যশোহর।

এছাড়াও গুপ্ত সৈন্য ও রক্ষী সৈন্যও ছিল। যুদ্ধ ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ঢাল তলোয়ার, শড়কী, বল্লম, লেজা, কামান, বন্দুক, বর্শা, তীর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রতাপাদিত্যের নৌবহরের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর রণতরী নির্মিত হত। তন্মধ্যে পিয়ারা, মহলগিরি, খুরাব, পাল, মাচোয়া, পশত, ডিঙি, 'গছাড়ি' বালাম, পলওয়ার 'কোচ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রতাপাদিত্যের সময় যশোরের কারিগরেরা জাহাজ নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিল। প্রতাপাদিত্যের পোতাশ্রয়ের প্রধান ও জাহাজ নির্মাণের অধ্যক্ষ ছিলেন ফেড্রারিক ডুডলী।

প্রতাপাদিত্যের আমীর ও উমরাহদের মধ্যে সূর্য্যকান্ত ও শংকর সবিশেষে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। শঙ্কর রাজস্ব ও রাজ্যশাসন পরিদর্শন করতেন এবং সূর্য্যকান্ত ছিলেন বীরযোদ্ধা। রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন ভবানন্দ মজুমদার। প্রতাপাদিত্যের দূর্গাধ্যক্ষদের মধ্যে পুরুষোত্তম দত্ত চৌধুরী, খাজা কামাল (বিকৃত নাম কোমল খোজা) মুয়াজিম বেগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতাপাদিত্য বহু পন্ডিতকে বৃত্তি দিতেন বলে জানা যায়। তার সভা প্রন্ডিতদের মধ্যে গুরুদেব কমল, নয়ন, তর্ক পঞ্চানন, অবিলম্ব স্বরস্বতি ও কবি ডিমডিম স্বরস্বতি (দার্শনিক পন্ডিত) সমধিক প্রসিদ্ধ।

অবশেষে ইসলাম খানের সুবাদারীর আমলে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ প্রতাপাদিত্য মোঘল বাহিনীর আক্রমণের মুখে পরাজয় অনিবার্য দেখে আত্মসমর্পন করেন। ইসলাম খান তাকে বন্দী করেন। কথিত আছে যে, প্রতাপাদিত্যকে একটি লোহার খাঁচায় বন্দী করে দিল্লী প্রেরণ করা হয় পথিমধ্যে তার মৃত্যু ঘটে।

এ যুগের বাংলার অন্যতম শক্তিশালী জমিদার যশোদলের রাজা প্রতাপাদিত্য। বাহারিস্তান এবং আব্দুল লতিফের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং তৎকালীন ইউরোপীয় লেখক বিশেষত জেসুইটগন সকলেই তার ব্যক্তিগত দক্ষতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অফুরন্ত সম্পদ ও সামরিক শক্তি বিশেষতঃ রণতরী এর কথা উল্লেখ করেছেন।

- জগদানন্দ বসু, কন্দর্পনারায়ণ বসু এবং রামচন্দ্র বসু ঃ

১৫৭৬ হতে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে তিনজন শাসনকর্তাকে রাজত্ব করতে দেখা যায়। তন্মধ্যে রাজা জগদানন্দ বসু ও তৎপুত্র কন্দর্পনারায়ণ মোঘল সম্রাট

Dhaka University Institutional Repository

আকবরের সমসায়িক ছিলেন এবং রাজা রামচন্দ্র ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রামনাথ দনুজমর্দন। আর ইদিলপুরের ঘটক সম্প্রদায়ের দলিলপত্র অনুযায়ী এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দনুজমর্দন রায় কায়স্থ।[১৪]

পিতা পরমানন্দ বসুর মৃত্যুর পর রাজা জগদানন্দ বসু বাকলা চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে বসেন। আফগান সালতানাতের পতনের পর তিনি স্বরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মোঘলদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং অন্যান্য ভূঞাদের ন্যায় ১৫৭৬ হতে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ বাকলা চন্দ্রদ্বীপে প্রলয়ংকারী এক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে নৌকা ডুবী হয়ে রাজা জগদানন্দ বসু মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর পুত্র কন্দপনারায়ণ সিংহাসনে আরোহন করেন।

কন্দর্পনারায়ণ বসু (১৫৮৪-১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ) চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি বীরযোদ্ধা এবং শক্তিশালী শাসক হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। কন্দর্পনারায়ণের রাজ্য খুলনা জেলার বাগেরহাট হতে ফরিদপুর, কোটালীপাড়া ও পূর্বে হাতিয়া সন্দীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুদের পুনঃপুনঃ আক্রমণে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণ কচুয়া হতে রাজধানী রাজনগরে স্থানান্তর করেন।[১৫] এক বছর পরে তিনি তার রাজধানী রাজনগর হতে বিশারীকাঠি গ্রামে স্থানান্তর করেন। ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ তিনি মোঘল সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং রাজধানী বাবুগঞ্জ থানার অধীনে ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে

---

[১৪] স্থানীয় জনশ্রুতি এবং প্রাপ্ত নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে চন্দ্রদ্বীপ পরিবারের নিম্নোক্ত বংশবৃত্তান্ত তৈরী করা হয়েছে। দনুজমর্দন রায়ের উত্তরাধিকারীরা হলেন রমা বল্লভ, কৃষ্ণ বল্লভ, হরি বল্লভ এবং জয়দেব। রাজা জয়দেবের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তার কন্যা কমলা দেবী উত্তরাধিকারী হন। তার স্বামীর নাম ছিল বল্লভদ্র বসু। কমলা দেবীর পর তার পুত্র পরমানন্দ বসু চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন এবং তিনিই চন্দ্রদ্বীপের বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। এই পরমানন্দ বসুর উত্তরাধিকারীগণই হলেন জগদানন্দ, কন্দর্প নারায়ণ এবং রামচন্দ্র।

[১৫] কন্দপনারায়ণের প্রধান সেনাপতি রঘুনন্দ ফৌজদার ও প্রধানমন্ত্রী সারাই আচার্য এবং প্রধান শরীর রক্ষক রামমোহন মাল রাজ্যশাসনে তাকে সর্বদা সাহায্য করতেন।
বিশ্বকোষে কন্দপনারায়ণের একটি পিতল নির্মিত কামানের উল্লেখ রয়েছে। কামানটির পশ্চাদভাগের উপরে তার এবং শ্রীপুরের বন্দুক নির্মাতা রূপিয়া খানের নাম খোদাই করা রয়েছে। কামানটি ৭.৫০ ফুট লম্বা পশ্চাদভাগে-এর পরিধি ২.৫ ফুট এবং মুখের দিকে পরিধি ১৯.৫ ইঞ্চি।

স্থানান্তর করেন। বাকলা রাজ্য হতে মগ জলদুস্যদের বিতাড়িত করার জন্য তিনি যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেন। তার রাজত্ব কালে অর্থাৎ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ ইউরোপীয় পর্যটক রালফ ফীচ বাকলা নগরী পরিদর্শন করেন।

কন্দপনারায়ণ ক্ষুদ্র রাজবাড়ীতে ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ শেষ নিঃশ্বাষ ত্যাগ করেন এবং ক্ষুদ্রকাটি গ্রামের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত আমতলী নদীর তীরে তাকে সমাহিত করা হয়। তার স্বরণে নদীর তীরে একটি বিরাট মন্দিও, মঠ নির্মিত হয়েছিল যা বর্তমানে আমলতলী নদীতে বিলীন হয়ে গেছে।

১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ পিতা কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর যুবরাজ রামচন্দ্র বাকলার সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি সম্ভবতঃ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ রাজধানী কচুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজধানী হতে মুসলমান ও নমশ্বদ্রদের অন্যত্র সরিয়ে কুলিন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের আবাম স্থায়ী করেন। তার প্রধান সেনাপতি ছিলেন রঘুনন্দ ফৌজদার এবং নৌবাহিনী প্রধান ছিলেন কৃষ্ণ জীবন। রাজা রামচন্দ্র সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং রাজধানী হোসেনপুর হতে মাধব পাশায় স্থানান্তর করেন এবং নতুন রাজধানীর নাম রাখেন শ্রীনগর।

জেসুইট মিশনারী মেল কেয়ার কনসেকার-এর অনুরোধে রামচন্দ্র তার রাজধানীতে পর্তুগীজদের প্রার্থনার নিমিত্তে গীর্জা নির্মাণের আদেশ দেন। এই মিশনারীগণ রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৬] ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ ইসলাম খানের সুবাদারীর আমলের প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে মোঘল শক্তির বিরুদ্ধে বিরাট যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং প্রায় এক সপ্তাহ যুদ্ধ করে অবশেষে তার মাতার অনুরোধে মোঘল বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পনে বাধ্য হন।

- বায়জিদ কররানী ঃ

কররানীদের পতনের পর আফগানগণ প্রায় সমগ্র সিলেটে ছড়িয়ে পড়ে। বায়জিদ কররানী ছিলেন তাদের নেতা। বায়জিদ কররানী খাজা ওসমানের একজন অন্যতম মিত্র

[১৬] রাজা রামচন্দ্র যশোরের রাজা প্রতাপাভিত্য কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি ভুলুয়ারাজ লক্ষণমানিক্যকে হত্যা করেন। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সাথে মিলিত হয়ে তিনি মোঘলশক্তির বিরুদ্ধে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন।

ছিলেন। স্বীয় অঞ্চলের স্বাধীনতা রক্ষার্থে তিনি মোঘলদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ওসমান খানের পরাজয়ের পর তিনি মোঘলদের নিকট আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন।

■ ওসমান খান লোহানী ঃ

ওসমান খান লোহানী ছিলেন উড়িষ্যার কতলু খান লোহানীর জ্ঞাতিভ্রাতা ঈসা খান লোহানীর পুত্র। তিনি ছিলেন উড়িষ্যা রাজ্যের প্রধান সেনাপতি এবং তিনি তার বীরত্বের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ওসমান মোঘল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ মানসিংহ উড়িষ্যা বিজয়ের পর তাকে ফরিদপুর অঞ্চলে জায়গীর প্রদান করে পুনরায় তা বাতিল ঘোষণা করলে ওসমান খান কতিপয় আফগান নেতাসহ সাঁতগাও পর্যন্ত অঞ্চল লুণ্ঠণ করে ভূষণার দিকে ধাবিত হন। সেখানে চাঁদরায় ও কেদাররায়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং অবশেষে ভূষণার দূর্গ দখল করেন। কিন্তু ঈসা খানের চক্রান্তে আফগানগণ তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং কেদাররায়ের নিকট ভূণণার দূর্গ হস্তান্তর করেন। অতপর ঈসা খান ওসমান লোহানীকে ময়মনসিংহ জেলার বোকাইনগর[১৭] অঞ্চলে একটি জমিদারি দান করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ ইসলাম খান ওসমান খান লোহানীর বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। ওসমান খান তখন পরাজয় সুনিশ্চিত ভেবে বোকাইনগর ত্যাগ করে শ্রীহট্টের পাঠান নামক বায়জিদ কররানীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে মোঘলবাহিনী সহজেই বোকাইনগর দূর্গ দখল করেন। অবশেষে ১৫১২ খ্রিস্টাব্দ মার্চ মাসে শ্রীহট্টের দৌলম্বপুরে মোঘল বাহিনীর সাথে সংঘটিত যুদ্ধে শত্রুপক্ষের তীরের আঘাতে মৃত্যু বরণ করেন। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

■ ভাওয়ালের গাজী পরিবার ঃ

ঢাকা জেলার উত্তরে ‘গারো পাহাড়ের’ দিকে বিস্তৃত ভাওয়ালের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল অবস্থিত। পাহাড়ী এবং মূলত; অনুর্বর এই অঞ্চলের উপর দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত। এখানে বহু শাল বুনো খেজুর গাছ দৃষ্ট হয়। ভাওয়াল ঢাকা জেলার একটি অতি পরিচিত পরগনা। ঈসা খানের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব হতেই ভাওয়ালের বিস্তৃত অরণ্য ভূমি গাজীগণ কর্তৃক শাসিত হত। কথিত আছে যে, পালবংশীয় রাজারা জমিদারদের পতনের পর জনৈক ধর্মযোদ্ধা

---

[১৭] ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার অধীনে একটি ইউনিয়ন হল বোকাইনগর।

Dhaka University Institutional Repository

পাহলোয়ান শাহ গাজী উপাধী প্রাপ্ত হয়ে এতদঞ্চলে এক ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়াইজের মতে এই গাজী বংশের সপ্তম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন মাহতাব গাজী এবং মাহতাবের পরে এতদঞ্চলের কর্তৃত্ব বাহাদুর গাজীর উপর অর্পিত হয়। বাহাদুর গাজী লক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে এবং বর্তমান কালিগঞ্জ হতে প্রায় এক মাইল উত্তরে ছাওরায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। ওয়াইজ আরও বলেন যে, এই বাহাদুর গাজী কিংবা তার পুত্র ফজলগাজী আকবরের রাজত্বকালে এতদঞ্চলের ভূঞা ছিলেন। কিন্তু ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত ৯৪৯ হিজরী সন তারিখ উল্লেখকৃত শেরশাহের একটি কামানের উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র একটি লিপি হতে প্রতীয়মান হয় যে, কামানটি ফজল গাজীর উপহার ছিল। অতএব, ধারণা করা যেতে পারে যে, ফজলগাজী ছিলেন শেরশাহের সমসাময়িক এবং সম্ভবত তিনি বাহাদুর গাজীর পিতা ছিলেন। জানা যায় যে, ফজল গাজী স্বীয় রাজ্যে স্বাধীন ছিলেন এবং তার বীরত্ব খ্যাতি ছিল।[১৮]

আকবরের শাসনামলে বাহাদুর গাজী আকবরের অনুগত ছিলেন এবং মোঘল সম্রাটের অনুকূলে পয়ত্রিশ খানি সুন্দর ও কাশা শ্রেণীর রণতরী মোতায়েন ও ভরণ পোষণের বিনিময়ে যার বাৎসরিক ব্যয় ছিল ৪৮,৩৭৯ রূপী) তিনি ভাওয়াল পরগনার কর্তৃক লাভ করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ছাওয়ারকে একজন স্বাধীন জমিদার রূপে দেখা যায় এবং তিনি মুসা খানের একজন মিত্র হিসেবে মোঘলশক্তির বিরোধীতা করেন। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, তিনি আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে কোন এক সময় মোঘল সম্রাটের আনুগত্য ত্যাগ করেন। বাহাদুর গাজী তার অসংখ্য রণতীর সাহায্যে মোঘল বিরোধী সংগ্রামে মুসা খানের পক্ষে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। মূসাখান মোঘল শক্তির নিকট চূড়ান্তরূপে পরাজিত হয়ে ইব্রাহীমপুর দ্বীপে পলায়ন করলে বাহাদুর কাজী মোঘল সুবাদার ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন।

উল্লেখ যে, গাজীদের শাসনামলে এতদঞ্চলের বহু তালুকদার তাদের অধীনস্ত ছিলেন এবং তারা সকলেই গাজী পরিবারের প্রধানের নিকট কর প্রদান করতেন। এসকল তালুকদারদের প্রত্যেকেরই চাওয়ার নিকটে একখন্ড জমিতে 'বাসা বাড়ি' ছিল।

---

[১৮] ভাওয়ালের গাজী বংশেধরদের নিকটে ঔরঙগজেবের শাসনামলের দ্বিতীয় বছরের একটি দলিল অনুসারে ভাওয়ালের গাজী পরিবারের বংশ লতিকা যা গবেষণার শেষে দেয়া হল।

Dhaka University Institutional Repository

ভট্টশালীর মতে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সরাইলের[১৯] জমিদার আনোয়ার খান। আনোয়ার গাজী নিঃসন্দেহে ভাওয়ালের গাজী বংশের সদস্য। রাউজের মতে, বাহাদুরের পুত্রের নাম 'সোনাগাজী' জোনা গাজী নয়। সোনাগাজী প্রথম দিকে মোঘল শক্তির বিরোধীতা করেন এবং পরে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন। তিনি অসংখ্য রণতরীর অধিকার ছিলেন। তিনি মুসা খানকে সাহায্যদান করেছিলেন একথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

'বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে' মুসা খানের মিত্রদের তালিকায় আনোয়ার গাজীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত বংশলতিকায় কোন আনোয়ার গাজীর নাম দৃষ্ট হয় না। তথাপি যেহেতু উল্লেখিত বংশ লতিকার বাহাদুর গাজীর ছোট ভাই মাহতাব গাজীর চার পুত্রের দু'জনের নাম নুর দেখানো হয়েছে, যেহেতু ভুট্রশালী মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের একজনের নাম ছিল আনোয়ার।

'বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে' আনোয়ার গাজীর নাম একজন শক্তিশালী জমিদার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মির্যানাথান তাকে বার ভূঞার একজন বলে উল্লেখ করেন। তিনি মোঘল শক্তির বিরুদ্ধাচারণ করেন কিন্তু পরিশেষে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন। 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী' মতে বানিয়াচঙ্গের জমিদার আনোয়ার খান। আনোয়ার গাজী ঢাকার ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পন করলে ইসলাম খান তাকে খাজা ওসমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু এগারসিন্দুরে গিয়ে তিনি আবার বিদ্রোহ করেন।

কিন্তু আনোয়ার খানের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং ওসমান খান পরাজিত হয়ে বোকাইনগর ত্যাগ করার পর পর্যন্ত মোঘল শক্তির সাথে তিনি কঠোরভাবে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন। উপরোক্ত গাজীগণ ছাড়াও অপর কয়েকজন গাজীর নাম পাওয়া যায়। যেমন চাঁদগাজী, সুলতান গাজী, সেলিম গাজী, কাসিম গাজী এবং তিলা (তালা) গাজী। তবে এদের সাথে ভাওয়ালের মূলাগাজীবংশ কোনভাবে সম্পর্কিত ছিল কিনা জানা যায় না। উল্লেখিত গাজীগণের নামানুসারে যথাক্রমে চাঁদপ্রতাপ সুলতানপ্রতাপ, সেলিমপ্রতাপ, কালিমপুর এবং তালিপাবাদ (তালিবাবাদ) পরগনাগুলির নামকরণ হয়। আকরবনামায় তিলা (তালা) গাজীর নাম পাওয়া যায়। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ এ পূর্বে বাংলা অভিযানে মোঘল সুবাদার

[১৯] ত্রিপুরা জেলার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত একটি পরিচিত পরগনা বর্তমানে ব্রাক্ষণ বাড়িয়ার একটি থানা।

খান জাহান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলে তিলা গাজীর সহযোগিতায় ভান্ডায় ফিরে যেতে সমর্থ হন। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ তিলাগাজী জীবিত ছিলেন। ধারণা করা হয় যে, অন্যান্য গাজীরাও একই সময়ের লোক। ভট্রশালীর মতে, উল্লিখিত পরগনা সমূহ যদি কখনও এই গাজীদের অধিকারের থেকে থাকে তবে আকবরের শাসনামলে কিংবা তার পূর্বেই তারা এগুলি হারিয়ে ছিলেন। উল্লেখিত পরগনাসমূহে অবস্থান সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হল চাঁদপ্রতাপ মানিকগঞ্জ জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত একটি বৃহৎ পরগনা এবং এটি ধলেশ্বরী নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরে ছড়িয়ে বিস্তৃত ছিল। বীমস কর্তৃক প্রদত্ত মানচিত্রানুযায়ী সেলিমপ্রতাপের অবস্থান চাঁদপ্রতাপের উত্তরে আর কাসিমপুর, তালিপাবাদ ও সুলতানপ্রতাপ পরগনাসমূহের মোটামুটিভাবে পশ্চিমে বংশী ও ধলেশ্বরী ও পূর্বে তুরাগ নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। মধ্যবর্তী এই অঞ্চলটির দক্ষিণে বংশী ও ধলেশ্বরী নদীর তীরে সুলতানপ্রতাপ পরগনা অবস্থিত এবং তুরাগ নদীর তীরে কাসিমপুর পরগনা অবস্থিত। এ অঞ্চলের উত্তরে হল তালিপাবাদ। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, চাঁদপ্রতাপের পূর্বে মুলতানের প্রতাপ অবস্থিত। কিন্তু চাঁদপ্রতাপের পশ্চিমে সুলতান প্রতাপ থাকায় ধারণা করা হয় যে, সুলতান প্রতাপ প্রকৃত পক্ষে একটি ছিটা পরগনা অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত পরগনা।

- বিনোদ রায় ঃ

চাঁদপ্রতাব পরগনার জমিদার ছিলেন বিনোদরায়। খুব সম্ভব মোঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে তিনি এ পরগনার কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি মুসা খানের একজন অন্যতম মিত্র হিসেবে মোঘল শক্তির বিরোধিতা করেন। বিনোদরায়ের বংশ পরিচয় সম্পর্কে ভট্টশালী বলেন, রাউলের রায়বংশের জমিদারগণ সাধারণত চাঁদপ্রতাপের জমিদার হিসেবে পরিচিত। এ বংশ কোন এক সঞ্জয় হাজরা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রাউলের রায়বংশ লতিকানুযায়ী সঞ্জয়ের দুই পুত্রের নাম গন্ধর্ব এবং শ্রীচন্দ্র। আর শ্রীচন্দ্রের দুই পুত্র হল মদন ও কমল। রাউলের রায় বংশের বর্তমান সদস্যগণ এই মদনের দশম অথবা একাদশ অধঃস্তন পুরুষ। ভট্টশালীর মতে, এই মদনই হলেন বিনোদ।

চাঁদপ্রতাপ মানিকগঞ্জ জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত একটি বৃহৎ পরগনা যা তৎকালে ধলেশ্বরী নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীর ছড়িয়ে বিস্তৃত ছিল। এ পরগনার নামকরণ যে চাঁদগাজীর

Dhaka University Institutional Repository

নামানুসারে হয়'ত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে চাঁদপ্রতাপ নামক স্থানটি সম্ভবতঃ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এবং মানিকগঞ্জ জেলার বর্তমান মানচিত্রে চাঁদপ্রতাপ নামটি অনুপস্থিত। আদি স্থানীয় লোকজনের মুখে আজও চাঁদপ্রতাপ পরগনার কথা শোনা যায়।

- মধু বা মাধবরায় ঃ

মধু বা মাধব রায় ছিলেন খালসী পরগনার জমিদার। তিনি কবে এ পরগনার জমিদারী লাভ করেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে' জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোঘল শক্তির বিরুদ্ধে মুসা খানের একজন মিত্র হিসেবে তার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুবাদার ইসলাম খানের অন্যতম নৌ সেনাপতি ইহতিমাম খানের চাটমোহরস্থ বৈধ জায়গীর যে তিনজন প্রভাবশালী জমিদার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, মধুরায় তাদের একজন। এছাড়া ইসলাম খান কর্তৃক যাত্রাপুর দূর্গ আক্রমণের প্রাক্কালে মুসা খান মির্জা মুমিন ও দরিয়া খানের সাথে মধু রায়কে যাত্রাপুর দূর্গ রক্ষার দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন।[২০] বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর থানার একটি ইউনিয়নের নরম খলসী। কিন্তু এ অঞ্চলের নদীর গতি অসংখবার পরিবর্তীত হওয়ায় বর্তমান খালসী এবং আমাদের সময়ের খালসী একই স্থান কিনা সে বিষয়ে কিঞ্চিত সন্দেহের অবকাশ হয়েছে।

- খান-ই-আলম বাহাদুরের পুত্র দরিয়া খানঃ

জাহাঙ্গিরের আমলে দরিয়া খানকে একজন জমিদার রূপে দেখা যায়। তিনি মুসা খানের সঙ্গে একযোগে মোঘলদের প্রতিহত করেন । তার সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি। সম্ববত তার জমিদারী পাবনা জেলার পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থীত ছিল।

- রাজা রায়

করোতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত শাহজাদপুরের জমিদার ছিলেন রাজারায়। শাহজাদপুর পাবনা জেলা হতে প্রায় ২৬ মাইল উত্তর পূর্ব চাটমোহর হতে প্রায় ২০ মাইল পূর্ব অবস্থিত একটি পরগনা। রাজারায়ের বংশ পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাকে মোঘলদের বিরোধীতা করতে দেখা যায়।

---

[২০] রেনেলকৃত বেহুল এ্যাটলাস এর ১৬নং মানচিত্রানুযায়ী গঙ্গা হতে ধলেশ্বরীর উৎপত্তিস্থলে অবস্থিত জাফরগঞ্জ হতে পাঁচ মাইল পূর্ব দিকে খালসী পরগনার অবস্থান। ১৫৫৭ সালের প্রধান সার্কিট মার্নাচত্রে চাঁদপ্রতাপ পরগনার পশ্চিমে খলসী পরগনা এবং খলীসীর উত্তর পশ্চিমে সিন্দুরী পরগনা দেখানো হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

▪শেখ পীর

শেখ পীর ছিলেন হাজী বাকাউলের পুত্র। তিনি কোন অঞ্চলের জমিদার সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তবে 'বাহারিস্থান-ই-গাইবী' মতে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি মুসা খানের একজন মিত্র ছিলেন।

▪হাজী শামসুদ্দিন বাগদাদী

হাজী শামসুদ্দিন বাগদাদীও মুসা খানের একজন অন্যতম মিত্র। মুসা খানের সময়ে তিনি সোনারগায়ের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা ছিলেন। মুসা খান মোঘলদের নিকট পরাজিত হয়ে ইব্রাহিমপুর দ্বীপে পলায়ন করলে হাজী শামসুদ্দিন বাগদাদী ইসলাম খানের নিকট আত্নসমপন করেন।

▪পাহলোয়ান

পাহলোয়ান ছিলেন মাতঙ্গের জমিদার। মাতঙ্গ ত্রিপুরা ও সিলেট জেলার মর্ধ্যবর্তী স্থানে সরাইলের উত্তরে এবং তরফের দক্ষিণে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পরগনা। 'বাহারিস্থান-ই-গাইবীর' মতে, তিান ছিলেন একজন সাহসী জমিদার। তিনি মোঘলদের বিরুদ্ধে অনমনীয়ভাবে যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধেই মৃত্যুবরন করেন।[২১]

[২১] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন, ঈসা খাঁ: সমকালীন ইতিহাস , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৫০

Dhaka University Institutional Repository

ভাটি রাজ্যের আর্থ-সামাজিক জীবন

সুলতানী আমলের শেষে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাবে আফগান সর্দার জায়গীরদার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায় করতেন সারা পূর্ববাংলায়। তাদের নিজস্ব কোন মুদ্রা ছিল না। তারাই ভু-স্বামী বা জমিদার ছিলেন। ঈসা খান এরূপ একজন ভু-স্বামী বা ভুঞা। জমিদার অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। ভাটি এলাকার সম্মিলিত ভুঞাদের প্রধান ছিলেন ঈসা খান। তাই রাজার মত শক্তিশালী ছিলেন। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজার বা নেতার মত মোঘল সামাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেন। মোঘল আগ্রাসন বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম কার্যকর করার লক্ষ্যে ভাটি এলাকায় বা পূর্ববাংলার সকল জমিদারগণ তাকে প্রধান ভুঞার মর্যাদা দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে মেনে নিয়েছিল। সুলতানী আমলের উত্তরাধিকারী হিসেবেই তিনি স্বদেশ ভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় তার গৌরবময় ভূমিকা রেখেছেন। এক্ষেত্রে তার অবদান উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবেই তিনি অনালোচিত কিংবদন্তীর নায়ক। ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে এবং ইতিহাসের তথ্যের ভিত্তিতে তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী পুরুষ।

রাফল ফীচের ভাষ্য অনুযায়ী ঈসা খান একজন রাজা। রাজার মত তিনি রাজত্ব আদায় করতেন। খন্ডিত রাজশক্তির সময়ে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাবে রাজস্ব সংগ্রহের জন্যই তার পরিচয় সাধারণের কাছে দেওয়ান বা রাজস্ব আদায়কারী। পরাজিত রাজশক্তির সৎ ক্ষমতাহীনতা তাকে রাজস্ব সংগ্রহে উৎসাহিত করে। তার মত অন্যান্য স্থানীয় জমিদারেরাও সম্ভবতঃ সংগ্রাম পরিচালন ও শাসন পরিচালনার জন্য পুরাতন প্রথা মতই রাজস্ব সংগ্রহ করত। আমাদের ইতিহাসের মোঘল পূর্ব যুগ এখনও জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত। সাধারণ মানুষ মোঘল যুগে প্রচলিত প্রশাসনিকের পরিচিত। তাদের কাছে রাজস্ব সংগ্রহকারী জায়গীরদায় বা জমিদার বা ভুঞা না হয়ে দিওয়ান নামে পরিচিত। তাই ঈসা খানের বাড়ি দেওয়ান বাড়ি হিসেবে পরিচিত। বার ভূঞা নেতার দূর্গ সুরক্ষিত বাড়িটি একজন সংগ্রামী নেতার প্রথম রাজধানী হিসেবে মোঘল লিপে পাওয়া গেলেও সাধারণের কাছে তা রাজস্ব সংগ্রহকারী

দেওয়ান বাড়ি। নবীনগর দু'জেলার মাছুমাবাদ গ্রামের দেওয়ান বাড়ি জঙ্গলবাড়ির দেওয়ান বাড়ি হয়বত নগরের দেওয়ান বাড়ি এরূপ ঐতিহ্যের ধারক।

ধ্বংসপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে বার ভুঞাগণ প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে রাজস্ব গ্রহণ করতে বাধ্য ছিলেন কেননা, রাজস্ব ছাড়া সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। সুলতানী আমলের শেষে বার ভূঞা নেতা ঈসা খান পূর্ববাংলার সমস্ত নেতা বা জমিদার প্রধান হিসেবে কেন্দ্রীয় শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাসন পরিচালনা করেন। তার কোন নির্দিষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল না। পূর্বের নিয়ম যেখানে আংশিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। শতকরা আড়াইভাগ রাজস্ব সংগ্রহ করে স্বাধীন রাজার মত তিনি চলতেন। এ রাজস্বও বেশী পরিমাণে গ্রহণ করতে পারেননি কেননা সাধারণ মানুষের আর্থিক স্বচ্চলতা ছিল না। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এক ওলন্দাজ পর্যবেক্ষক বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, সাধারণ মানুষ প্রচন্ড দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করত। তাদের জীবন ছিল তীব্র অভাবের ও এদেশ ছিল দুঃখের বাসভূমি।

বার ভুঞাদের আমলে সারা পূর্ব বাংলার ঢাকা, সোনারগাঁও ও কাতবার ছাড়া আর কোন উন্নত এলাকার নাম পাওয়া যায় না। সারা অলাকাই গ্রাম ছিল। এসব গ্রামের সংখ্যা ছিল অগণিত। গ্রামগুলো জঙ্গলের সীমায় সীমায়িত হতো। নদী, খাল, বিল গ্রামগুলোকে ভিন্ন করে রাখতে সাহায্য করত। দরিদ্র চাষীর বাড়ির নদীর তীরবর্তী উচু স্থানে থাকত। টিলার মত উচু জমি বিশেষ ব্যক্তিদের বা মোড়লদের বাস ছিল। এগুলো পাড়ায়, পাড়ায় বিভক্ত থাকত। বিভিন্ন গ্রামে জনংখ্যারও তারতম্য হতো। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই স্থানীয় বা মজবুত ইমারত নির্মাণের কথা ভাবতে পারতেন ও করতেন। সমাজে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতেন।

দারিদ্র কৃষকের বাড়ি ঘরগুলো বর্ষার প্রকোপে নষ্ট হয়ে যেতো। কেননা সেগুলো খড় বাঁশ দিয়ে তৈরী হতো। গৃহস্থালীতে মাটির বাসন কোসন ব্যবহার করা হতো। বর্ষার আগমনে গ্রামগুলো পানিতে ভরে গেলে পশুগুলোকে নিয়ে কৃষকেরা অপেক্ষাকৃত উচু স্থানে আশ্রয় নিত। এরই সাথে নৌকায় গ্রৃহস্থালীর জিনিসপত্র তলিয়ে যেতো। নদী তীরবর্তী সমভূমিগুলো ছিল শস্যাদির আড়ত। এ শস্য ঘোড়া ও নৌকাযোগে হাট বাজারে নেওয়া হতো। রাস্তাগুলো খুবই

Dhaka University Institutional Repository

সরু ছিল, জমির আলবেয়ে চাষী চলাফেরা করত। একমাত্র গ্রান্ড ট্রাঁক বোড়াই প্রধান রাস্তা, ছিল। এ রাস্তায় কিছুদুর পর পর কুঁয়া ও মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল।[২২]

ঈসা খানের রাজত্বকালে পূর্ব বাংলায় কৃষি ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল বলে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়। আবুলফজল বলেছেন, বাংলার মাটি এত বেশী উর্বর যে, এই মাটিতে বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হয়।[২৩]

তুলা

ঈসা খানের রাজত্বে উন্নতমানের তুলা উৎপাদনের জন্য কৃষকদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ট পোষকতা করা হতো। কাপাসিয়া[২৪] এলাকায় উন্নত জাতের তুলা উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ছিল। কার্পায়া উৎপাদনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই এলাকাটির নাম কাপাসিয়া নামে পরিচিত লাভ করে। একটি বিবরণ থেকে জানা যায় মেঘনা নদীর উত্তরে এবং শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বভাগের অকল সমূহেই সর্বোৎকৃষ্ট তুলা চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। সপ্তদশ শতকের পর্যটক বাঁণিয়ার স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বাংলায় এত বেশী পরিমাণ সূতা ও রেশসী আছে যে, এ রাজ্যকে এই দু'টো পণ্যের সাধারণ ভান্ডার বলে অভিহিত করা যায়।[২৫]

ঈসা খ'নের সময় কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর ও পাকুন্দিয়া অঞ্চলেও ব্যাপকভাবে তুলার চাষ হত। বর্ষন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তুলা উৎপাদনে ভাটিরাজ্য ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। ঈসা খানের সময় বাইরে থেকে তুলা আমদানীর কোন প্রয়োজন ছিল না।[২৬]

ধান

প্রাচীনকাল থেকেই ধান ছিল বাংলাদেশের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। বিভিন্ন জাতের ধান উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করায় নবম শতাব্দি থেকেই বাংলাদেশ থেকে ধান অথবা চাল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানী হত ব্যাপকভাবে। ধানের এত বেশী জাত ছিল যার সম্পর্কে

---

[২২] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন, ঈসা খাঁ: সমকালীন ইতিহাস , প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৬-৭৭

[২৩] আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী-জ্যাবরা অনুদিত প্রথম খন্ড, পৃ. ৪৪

[২৪] বর্তমান গাজীপুর জেলার একটি থানা। শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত এই স্থানটি ভাওয়ালের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান

[২৫] এম এ রহিম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩

[২৬] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করতে গিয়ে আবুল ফজল বলেছেন যে, যদি প্রত্যেক প্রকারের একটি করে শস্য কণা সংগ্রহ করা যায় তাতে একটা বড় কলস ভরে উঠবে।[২৭] আবুল ফজলের উল্লিখিত বর্ণনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, ঈসা খানের রাজত্বের বিভিন্ন জাতের ধান ধান উৎপাদনের জন্য ব্যাপক চাষাবাদ করা হত।

ঈসা খানের আমলে মসলিন বস্ত্র রফতানীর পাশাপশি চাউল রফতানীর বিষয়টি সম্পর্কে ও জানা যায়। খুব সম্ভবত ঐ সময় ধান থেকে চাউল করার পর ঐ চাউল বিদেশে রফতানী করা হত।

চিনি

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে চিনি উৎপাদনের প্রাচুর্য ছিল। ঈসা খানের সময় চিনি উৎপাদন একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পে পরিণত হয়। অত্যন্ত ভালমানের সাদা চিনি উৎপাদন ভাটি রাজ্যের বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

ঈসা খানের রাজত্বের প্রায় ৫০ বছর পরেও চিনিশিল্পের ব্যাপক রফতানীর কথা জানা যায়। জেসি সিনহা 'ইকনমিক এনালস অব বেঙ্গল' গ্রন্থে বলেছেন ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ ও এ প্রদেশ (বাংলাদেশ) শতকরা ৫০ ভাগ লাভে ৫০,০০০ মণ চিনি রফতানী করেছিল।

ঈসা খানের সময় প্রচুর পরিমাণ ঝোলাগুড় আরব ও পারস্য দেশের বণিকরা জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে যেত বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। মধুর বিকল্প হিসেবে এই ষোলা গুড় ব্যবহার হত।

পাট

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে পাটের চাষ হত বলে জানা যায়। চতুর্দশ শতকের পন্ডিত জ্যোতিবিদ কর্তৃক লিখিত 'কারত্মকার গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ঐ সময় মেয়েরা বিভিন্ন প্রকারের পাটের শাড়ী পারিধান করত।[২৮] আবুলফজলের লেখা থেকে জানা যায় যে, সরকার খোড়াঘাট অঞ্চলে রেশম ও এক প্রকার পাটের কাপড় তৈরী হত।[২৯]

---

[২৭] আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[২৮] ড. এম এ রহিম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫

[২৯] আবুলফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের সময় ভাটিরাজ্যে উৎপাদিত পাট দ্বারা পাটিজতব্য তৈরী হয়ে বিদেশে রফতানী করা হত। সমসাময়িকদের তথ্যাদি থেকে এই অঞ্চলে পাট উৎপাদন এবং পাট থেকে বস্ত্র ও সাধারণ পরিচ্ছদ ইত্যাদি তৈরীর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩০] এছাড়াও ষোড়শ শতকে রচিত বির্ভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, সমাজের সাধারণ স্ত্রীলোকেরা পাটের ব্যবহার করত।[৩১]

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হোসনে জাহান বলেন, আখ পাট, তুলা ছিল বাংলার অর্থকরী ফসল। সোনারগাঁয়ের চারপাশে আফিম, গাঁজর চাষ হতো। পর্তুগীজদের আগমনের সূত্র ধরে তামাকের চাষও শুরু হয়। পান সুপারীর পাশাপাশি এক ছিলিম সুগন্ধীযুক্ত তামাক খাবার জন্য ব্যবসায়ীরা উদগ্রীব ছিল। বাংলার চিনি ছিল সারা ভারতের মাঝে সেরা পানসুপারী খাওয়ার রীতি ছিল ঘরে ঘরে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় ব্যাপক তুলার চাষ হতো। তুলা উপযোগী জমি ছিল এখানে এখানকার আবহাওয়ার সুক্ষ্ম মসলিন উৎপাদিত হতো। মসলিনের সূতার রঙ করার জন্য কুসুম ফুলের চাষ হতো। গ্রামগুলো ছিল হাস্ত শিল্প কেন্দ্র। সূতা প্রস্তুত করা, রঙ করা, তুলা সংরক্ষণ করা, কাপড় বোনা সবই পরিবারের লোকেরা করত। গ্রামগুলোতে বিভিন্ন রকম মরিচ, তালের রস থেকে পানীয় পানের বর ইত্যাদি ছিল। এছাড়া ফুটি, বেল, তাল, সাধারণ আলু, বড় আলু, পেঁপে, পেয়ারা, কুল, আমরুন্দ জন্মাত প্রচুর। ধনী ব্যক্তিদের আমের বাগান ছিল। বাঁশ, বেত, ছন, শনপাট, কাঠাল, জারুল, ও জন্মাত। বড় বড় জঙ্গল ছিল বাংলার পুর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায়। সিলেট জেলার ঘণ জঙ্গল ছিল ১৮ শতক অবধি। ভাওয়ালেও মধুপুরের জঙ্গল ছিল আরও বড়। সমকালীন সরকার বাজুহা জঙ্গলাকীর্ন জলাভূমির তথ্য দেয়। বন্যায় পানিতে বাখরগঞ্জ জেলা ভেসে যাওয়ার দীর্ঘ বছর পর ১৬৬৫ সালে সেখানে পুনর্বাসন শুরু হয়।

বাংলার প্রধান ফসল ছিল ধান। ধানও নানা ধরনের হতো। সরু মিহি চাল দরিদ্র চাষী নিজের জন্য রাখত না। চাল ছিল প্রধান খাদ্য এবং ভাতের সাথে ঘি খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। প্রচুর গরু, ছাগল পালিত হতো বলে প্রচুর দুধ ও ঘি থাকতো কৃষকের ঘরে। মাছ-মুরগী ও ছিল। গরু জবাই হতো। ডাল জাতীয় ফসলের মধ্যে মাসকলাই ছিল প্রধান। এছাড়া ছোলা,

---

[৩০] ড. এম এ রহিম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০

মসুর, মটর, মুগ, ডাহুরী, উরি, চীনা, কাওন উৎপাদিত হতো। বাংলার চাষীরা পাশ্ববর্তী এলাকা অপেক্ষা ভাল খাবার খেতে পারত। ঘি মাখন দিত তার সাথে, তিন চার রকমের তরকারী, মাছ, মাংস তাদের দৈনন্দিন খাবারের মধ্যে ছিল। গ্রামের কর্তাব্যক্তিরা ছিলেন বেশীর ভাগই মুসলমান। তারা ভেড়া, মুরগী ও কবুতরের মাংস খেত। চিনি ও গুড় জাতীয় জিনিষ দিয়ে সরবত ও অন্যান্য পানীয় তৈরী হতো। জিরে, ধনে, আদা, চাষীরা নিজেদের প্রয়োজনে উৎপন্ন করতো। লবণ কিনে আনতে হত। বেড়ীর তেলে বাতি জ্বালাতো। তৈল জাতীয় ফসল বলতে বুঝাতো সরিষা, বেড়ীর গাছ, তিসি, কসুমফুল, তিল, বাজনা রয়না ইত্যাদি। ঘি এর বিকল্প হিসেবে দরিদ্র লোকেরা তিসির তেল ব্যবহার করত। তিসির চারা গাছ থেকে সূতা তৈরী হতো। এগুলো রাজস্ব ফসল হিসেবে ও বিবেচিত হতো পাট ছিল স্থানীয় ফসল। কাপড় বোনার কাজ ও পট ব্যবহার হতো। সূতা উৎপাদনকারী ফসল হিসেবে আরও ছিল চীনা ঘাস ও রেশম গুটি।

গরীব লোকেরা কাঁচা মরিচ ও আদা দিয়ে ভাত খেতো। কাঁচা পিয়াজ খাবার রীতি প্রচলিত ছিল না। একটা মজার তথ্য এই যে, লবঙ্গ, মানুষের গলায় কবিরাজের চিকিৎসার জন্য ঝুলিয়ে ব্যবহার হতো কাশি নিরাময়ের জন্য একা দেওয়া হত। দুই ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে গরীব লোকেরা কষ্টে দিন কাটাতো। এ সময় তারা দিনের বেলায় তাজা চাল ছোলা ভেঙ্গে খেতো। শুধু রাতে ভাত খেতো।

অকেজু সমতল ভূমি ফসলের জন্য চাষকরা হতো। ফসল ফলাতে লোহার লাঙ্গল ব্যবহা করতো কৃষকেরা। এ লাঙ্গল গরু চালিত ছিল। জমি ছাষ করার পর বীজ রূপে বা খরপি দিয়ে মাটি আলাদা করে বীজ রপন করা হতো। কাদাঁয় ছিটিয়ে বা জালা ফেলে চারা করে ও গোছা করে ধান লাগাবার রীতি ছিল। বছরে দুইবার, কোন কোন জায়গায় তিনবার ফসল তোলার সুযোগ ছিল। পর্যায়ক্রমে ফসল উৎপাদন কার্যত ছিল প্রকৃতির দান।

ধানের ক্ষেতগুলো আজবের মতই ছিল। জমিতে বেড়া দেওয়ার হতো না। মৌসুমী বৃষ্টির স্বাভাবিক দানকে কৃত্রিম সেচ ব্যবহার দিয়ে পানি অভাব পূরণ করা হতো। মেনীখালী তিমোহিনী খাল, নল, খালি খাল, ইছাপরা, পাঙখীবাজ খাল সে সময়ে বিখ্যাত ছিল। সোনারগাঁয়ের খাস নগর দির্ঘী, রাজঘাটের দিঘী প্রাচীনতার দাবীদার। নিকটবর্তী বিলের

জলপথের সাথে এগুলোর যোগ ছিল। সেচ ব্যবস্থা থাকার দরুন বৃষ্টির উপর নির্ভর থাকে কৃষকেরা ভাবনামুক্ত থাকতে পারত।

বাংলার ভাটি এলাকা প্রাকৃতিকভাবেই উর্বতা লাভ করত। বর্ষায় প্রবল বর্ষণের সময় নদীর তীঁর ছপিয়ে পানি জমিতে চলে যেয়ে প্রতি বছর জমা জমির ভাসিয়ে দিয়ে সেচ ও সারের সমন্বয় করে দিত। জমিতে পানি জমত। বেশী পানি হলে পানির থৈ থৈ অস্থিরতা জমিতে অসংখ্য খাত সৃষ্টি করত। বন্যার সময় এসব খাত উৎস নদী থেকে ভরে যেতো এবং এভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে ধীরে ধীরে স্থায়ী খালে রূপান্তরিত হতো। এভাবে রূপান্তরিত খাতের সংখ্যা বংলার পূর্বাঞ্চলের উৎস নদী অপেক্ষা অনেক বেশী। নদীর গতি পথ পরিবর্তিত হয়েছে অনেকবার। তীর ভেদে নতুন গতি পেয়েছে অনেক নদী। মেঘনা নদীর বুকে তলিয়ে গেছে কত গ্রাম, হাট, বন্দর। ব্রহ্মপুত্র নদের নতুন শাখা শীতলক্ষ্যা প্রকার নদীরূপে চিহ্নিত হয়েছে। আড়িয়াল খাঁ আজও ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা নদী হিসেবে স্থানে স্থানে চিহ্নিত হচ্ছে।

বাংলার লোকেরা এ সময় সামান্য বস্ত্র পরিধান করত। পুরুষেরা সবচেয়ে ছোট ধুতি ও মেয়েরা একটি শাড়ী পরত। গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত মাটির পাত্রগুলো আধুনিক যুগের মতই ছিল। নলযুক্ত পানপাত্র ব্যবহৃত হতো। হুক্কা কলকে, চাকনা সহ পাত্র ইত্যাদির নিদর্শন পাওয়া গেছে।[৩২]

ঈসা খানের সময় শুধু কৃষিক্ষেত্রেই নয়, ধাতব শিল্পেরও ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। চীনাদের বর্ণনা অনুসারে এই অঞ্চলে প্রস্তুত তরবারির উল্লেখযোগ্য খ্যাতি ছিল। তামা, কাসা স্বর্ণ, রূপার অলংকার ইত্যাদি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। 'উচ্ছ্বাস' কাব্যগ্রন্থে বলা হয়েছে ঈসা খান জঙ্গলবাড়ি অধিকার করার পর চতুর্দিকে থেকে বিভিন্ন পেশার লোকজন ও বিভিন্ন শিল্পের কারিগর জঙ্গলবাড়ি শহরে এসে বসতি স্থাপন করে এবং নিজ নিজ পেশায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ঈসা খানের সময় শুঙখ শিল্পের ব্যাপক প্রসাব ঘটেছিল।[৩৩] সাওতালরা এই শিল্পে বিশেষ পারদর্শী ছিল এবং ঈসা খানের রাজ্যে তাদের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল

---

[৩২] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৯

[৩৩] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন রচিত জঙ্গলবাড়ি প্রাচীন ভাটিরাজ্যের রাজধানী (প্রবন্ধ) সাহিত্য সাময়িক সৃষ্টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরী কিশোরগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

বলে জানা যায়।[৩৪] কিশোরগঞ্জ শহরের সাওতাল মহল্লায় বসবাসকারী শুঙখ শিল্পীরা বর্তমানে ঢাকা শাখারী পটিতে বসবাস করে।

ঈসা খানের শাসনামলে ভাটিরাজ্যের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাত্রার বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, এসময় মানুষের জীবনে অত্যাধিক প্রাচুর্য থাকায় জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কল্পনাতীতভাবে সস্তা ছিল। অন্যান্য দেশের স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থ এই প্রদেশকে সম্পদশালী করে তুলেছিল।[৩৫]

মুকুন্দরায়ের চন্ডিমন্ডল কাব্যে এই অঞ্চলের ষোড়শ শতকে জিনিসপত্রের সস্তা ও সুলভতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম একজন দাসীর বাজার করার বিষয়টিকে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, দুর্বল দাসী ৫০ কাহন কড়ি নিয়ে বাজারে যায়। সে একটি লম্বা লাউ ও একটি কুমড়া খরিদ করে ১০০ কড়িতে ১ ঝুড়ি আম খরিদ করে ১০০ কড়িতে।

একটি রুই মাছসহ অন্যান্য মাছ। যেমন চিতল, বোয়াল এবং ৬৪১টি চিংড়া মাছ খরিদ করে। একটি খাসি ছাগল খরিদ করে ৮ কাহন কড়িতে। সরিষার তেল ক্রয় করে ১০ বুড়ি কড়ি সেরদারে।[৩৬]

বাংলার অর্থনীতিতে কৃষকের অবদান সবচেয়ে বেশী। কৃষিই তাদের জীবিকার উৎস। আর পশুপালনই কৃষির অত্যতম প্রধান অবস্থান ছিল। প্রাকৃতিকভাবে পলি ও গোবর সার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো। জ্বালানী হিসেবে জঙ্গলে প্রচুর জ্বালানী কাঠ খড়ি পাওয়া যেতো। এগুলো কুটিরশিল্পে রূপ পেয়েছিল, যেমন মসলিন শিল্প, রেশম শিল্প,। কৃষিসমাজে ব্যবহৃত হস্তশিল্পের মধ্যে ধান কাটার জন্য কাস্তে; ধান মাড়াই ঝাড়া শুকানো, মাপা ইত্যাদি কাজের জন্য বাঁশের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাদি যেমনঃ কুলা, ডালা, ওজনের জন্য কাঠা নির্মাণ করা এ শিল্পের আওতায় পড়ে। এছাড়া ধান সিদ্ধ করা, ধান ভানার জন্য পরিশ্রমী মানুষও ঢেঁকির ও প্রয়োজনে ছিল। সোনারগাঁয়ে অদরে সোনাকান্দাই হল এরূপ যন্ত্রপাতির একটি প্রসিদ্ধ মেলার স্থান।

---

[৩৪] এ তথ্যাদি জঙ্গলবাড়ির ঈসা খানের অধঃস্তন দেওয়ান আমিনদাদ খানের নিকট থেকে সংগ্রহীত হয়েছে।

[৩৫] এম এ রহিম বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রাগক্ত, পৃ. ৪৫৬

[৩৬] মুকুন্দরায়, চন্ডী কাব্য, পৃ. ১৫৫-৫৬, এম. এ. রহিম, পুস্তক, বাংলা একাডেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮

Dhaka University Institutional Repository

তুলা সংগ্রহ করা, ধন করা, সূতা করা, সূতা দিয়ে কাপড় বোনা, তাঁতির কাদে সূতা পৌছানো পর্যন্ত ব্যবহাদির জন্য বিশেষ শিল্প চিন্তার প্রয়োজন হতো।

আখ থেকে চিনি ও গুড় তৈরী করার জন্য বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন হয়। এগুলো বিশেষ শ্রেণী তৈরী করেছিল। সরিষা থেকে তেল নিংড়ানোর জন্য ঘানির ব্যবহার ছিল। পরিবহন ব্যবস্থা মূলত; নদী পথেই চলত। নদী পথে বড় নৌকা বরা, কোসা পাটেল্লা ডিঙ্গি কোন্দা ব্যবহৃত হত। ঘোড়া ও বলদ পরিবহন কাজে ব্যবহার করা হতো। কয়েকটি গ্রাম মিলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হতো। গ্রামীণ সমাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলত। [৩৭]

[৩৭] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের সময় বাংলার ভাষাভাষি

ঈসা খান ছিলেন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের এক কিংবদন্তী পুরুষ। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ঈসা খানের প্রায় অর্ধেক জীবন অতিবাহিত হয়েছে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। এরপরেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা এবং জ্ঞানীগুণীদের সমাদরের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের নতুন নির্মাণে ঈসা খান যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কবি আলাউল, দ্বিজবংশীদাস, সৈয়দ সুলতান, মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, নিত্যানন্দ দাস, আব্দুল হাকিম, শাহ বন্দে আসীর এগারসিন্দুরী প্রমুখ কবি সাহিত্যক ঐ সময়কালে আবিভূর্ত হন। ঐ সময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট সময়কাল। ইতিপূর্বে বাংলার সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এবং ঐ বংশের সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের চর্চারধারা বাংলার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঈসা খানের সময় এ ধারা জোরদার হয়।

ষোড়শ শতকের যে সময়টিতে শ্রী চৈতন্যদেব কিশোরগঞ্জ জেলার বেশ কয়েকটি স্থানে আগমন করেছিলেন। ঐ সময় তার ভাবাদর্শের প্রভাবে এবং বৈষ্ণম গোষ্ঠীর সাক্ষত সংস্পর্শে মাত্র পঞ্চাশ বৎসর ব্যবধানে ঈসা খানের ভাটিরাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটেছিল।

এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন, খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দির গোড়া হতেই তখনকার বাংলা সাহিত্যে এক ঘোর পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনের যাতে বাংলার প্রাচীন কাব্যধারা একরূপ জীবনমৃত হয়ে পড়ে এবং বাংলায় এক নতুন সাহিত্য অভিনব মুর্তিতে গড়ে উঠে। এই সাহিত্য বাংলার খ্যাতনামা বৈস্মব সাহিত্য। বঙ্গে বৈষ্ণব মতের উদ্ভবের ফলে এই নতুন সাহিত্যের জন্ম সম্ভবপর হয়েছিল। যে সংস্কৃতিগত পটভূমিকায় বাংলায় বৈষ্ণব মতের উদ্ভব সম্ভবপর হয় তার সর্বাঙ্গে ইসলামী প্রভাব পড়েছিল।[৩৮]

এই সময় ঈসা খানের ভাটিরাজ্যে কর্ত কাঙ্কন চন্ডীমঙ্গলে, মাধবাচার্য এবং বংশীদাসসহ প্রমুখ কবিদের মনসা মঙ্গল কাব্যে মুসলিম সংস্কৃতির বিভিন্ন আচার আচরণ ও মুসলিম শব্দসমূহ তাদের সাহিত্যে লক্ষ্যে অথবা অলক্ষে প্রবেশ করে।

---

[৩৮] ডঃ মোহাম্মদ এনামুল হক: নতুন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা (প্রবন্ধ) বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ. ৮৯

ভারতীয় হিন্দী সাহিত্যের সাথে বাংলা সাহিত্যের যোগসাধন কালটি ঈসা খানের রাজত্বকালীন সময়েই নিরূপণ করা যায়। ডঃ এনামুল হকের মতে, ১৫৮৮-১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পাঁচ বছর কবি মুহাম্মদ কবীর 'মনোহর মাধূমালতী' নামক এক কাব্য হিন্দী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। মাধুমালতী কাব্যের সৌম্য ও শান্তরস, অনন্য কল্পনার সৌন্দর্য এবং সর্বোপরি আপনার মাধুর্য পাঠককে মুগ্ধ করে।[৩৯] মুহাম্মদ কবীদের ভাষা ও রচনা রীতির পরিচয় নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

মনোহার মালতীর আকুল পিরিত।
গাহিব সকল লোক মন হরষিত ॥
এহি যে সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দীতে আছিল।
দেশি ভাষায় মুঞি পঞ্চালী ভণিল।[৪০]

১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে দিকে মুহাম্মদ আকিলের "মুসানামা" এবং কমর আলীর সরসালের নীতি রচনা করে সাস্ত্রীয় ইসলামের সাথে বাংলা সাহিত্যের যোগসাধন করলো আরো বলিষ্ঠভাবে। এমতাবস্থায় সুলতান রুকুন উদ্দীন বররক শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও নাসির উদ্দিন নূসরত শাহের সময়ে সূচিত বাংলা ভাষার চর্চার ধারা ঈসা খানের সময়ে একটা পর্যায়ে উন্নীত হয়। এ সময় কবি সাহিত্যিকগণ তাদের লেখায় বাংলা ভাষায় স্বপক্ষে কথা বলতে শুরু করেন।

ঐ সময়ের কবি সৈয়দ সুলতান তার 'রসুল চরিত' বাংলা ভাষায় রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, সৈয়দ সুলতান ছিলেন ঈসা খানের মাতুল বংশের একজন কবি। আরবী ভাষা বাংগালিরা না বোঝার কারণেই বাংলা ভাষায় রসুল রচিত রচনা কালে তিনি উল্লেখ করেন যে,

গ্রহশত রস যোগে অব্দ গো গুঞ্জইল
দেশী ভাষে এই কথা কেহ না কহিল
আরবী ফাচ্ছি ভাষে কিতাব বহুত
আলিমানে বুঝে না বুঝে সূর্য্যসুত।[৪১]

---

[৩৯] আবদুর রহমান খান, বাংলা সাহিত্যে কালক্রমিক পরিচয়, গুরুগৃহ প্রকাশনী, ১৩৯০ বাংলা, পৃ. ১৪৬

[৪০] ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, নতুন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা (প্রবন্ধ) বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার. ১৯৯৮, পৃ. ৮৯

সমসাময়িক কালের কবি আব্দুল হাকিম আরো জোরালো ভাষায় বাংলা ভাষার স্বপক্ষে যুক্তি পেশা করেন। তিনি বলেন-

যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণি
সে সব কাহার জন্ম নির্ময় ন-জানি
নিজ দেশে ত্যাগী কেন বিদেশ না জায়। [৪২]

ষোড়শ শতাব্দির আরও পূর্ব থেকে প্রচলিত বিভিন্ন সুরের মধ্যে ভাটিয়ালী রাগেন নামে সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত যে ভিন্ন সুর সৃষ্টি হয় তা ভাটী অঞ্চলের লোকদের মুখের ভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। ঈসা খান ছিলেন মাজুবানে ভাটি বা ভাটীর অধিপতি। ভাটি অঞ্চলের তার সময়ের এবং পরবর্তী সময়ের ঘটনা প্রবাহের উপর যে সমস্ত লোক কাহিনী ভিত্তিক পালাগানের সৃষ্টি হয় তা গোটা বাংলা সাহিত্যের গৌরবের বস্তু।

শ্রী চৈতন্যের পরে মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি দ্বিজবংশী দাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও সমধিক জনপ্রিয়। কবি দ্বিজবংশী দাসের রচিত পদ্মপুরাণও অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তার পদ্মপুরাণ রচনাকাল জ্ঞাপক একটি পদ এভাবেই লিখিত হয়েছে।

জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দার
শকে রচে দ্বিজবংশী পুরাণ পদ্মার[৪৩]

এ শ্লোকটিতে **অংকস্য** বামাগতি নিয়ম প্রয়োগ করলে ১৪৯৭ শক বা ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। দ্বিজবংশী ঈসা খানের দ্বিতীয় রাজধানী এই জঙ্গলবাড়ির অতি নিকটে পাতুয়া ইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক শ্রী আশুতোষ ভট্রাচার্য বলেন "চৈনত্যের ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর অংকীর্তন করে নাম প্রচারের রীতি সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছিল। দ্বিজবংশী দাসও সংকীর্তনের দল বেধে সর্বত্র স্বরচিত ভাষার গান গেয়ে বেড়াতেন"। ঈসা খানের সমসায়িক কালের এবং একই এলাকার এই কবির কথা চন্দ্রাবর্তী ছিলেন এ সময়কালে একজন সহিনী কবি। চন্দ্রবর্তীর কাব্যরসাকর জীবন কথা এবং জনপ্রিয় কাব্য রচনার পরিচিত

---

[৪১] ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

[৪২] আব্দুর রহমান খান, প্রাগক্ত, পৃ.১৩৮

[৪৩] আশুতোষ পাল, ময়মনসিংহের কাব্য সাধনা (প্রবন্ধ) ময়মনসিংহের সাহিত্য সংস্কৃতিক জেলা বোর্ড ময়মনসিংহ- ১৯৮৬, পৃ. ৩১০

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়। তার রোমাটিক জীবন কাহিনী পর্যালোচনা করলে কবি চন্দ্রাবর্তী তাঁর কাব্যে পিতৃ পরিচয় দিয়েছেন-এভাবে।

ধারা স্রোতে ফলেশ্বরী নদী রয়ে যায়
বসতি যাদবানন্দ করেন তাথায়।
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম আঞ্চনা ঘরনী
বাঁশের পালায় ছনের ছাউনি।
ঘট বসাইয়া সদা পুজে মনসায়
কোপকরি সেই হেতু লক্ষী ছাড়ি যায়।
দ্বিজবংশী পুত্র হৈলা মনসার রবে
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে। [৪৪]

ঈসা খানের সমসাময়িক কালের আর একজন কবি ষষ্ঠীবর[৪৫] এবং তার পুত্র গঙ্গা দাসের নাম উল্লেখ করা যায়। কবি ষষ্ঠীবর তার কবিতায় আরবি, ফারসি ভাষা ও ব্যবহার করেছেন ব্যাপকভাবে। এই পরিচয় পাওয়া যায় তার কবিতা থেকে।

প্রথমে চলিল কাজিমীর বহর তাজি।
আবার হাজার পাইক তাহার বাম বাজী।
সতর হাজার পাইক বামবাজী লড়ে
ধানকীর ফৈজ সব লড়ে ঘোড়ে ঘোড়ে
মুখে দোয়া কারেকাজি হাতে ৩ কোরাণ।
সাহেমনি দোলা আনি ছিল বিদ্যমান।
দোলা এচড়ি কাজি খসাইল মজা
সেই দিন জুমাবার পেগম্বার রোজা।[৪৬]

---

[৪৪] শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড. দ্বিতীয় সংখ্যা, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ.২৫

[৪৫] ষষ্ঠীবর ঈসা খানের রাজত্বের মহেশ্বরী পরগনার দিনদ্বিপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্থান টির নাম বর্তমানে জিনারাদি যা নরসিংদী জেলায় অবস্থিত

ষষ্ঠীবরের পুত্র গঙ্গাদাস মহাভারতের আদি পর্ব ও অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। অশ্বমেধ পর্বের লবকুশের যুদ্ধ অধ্যায়ে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন-

গঙ্গাদাস সেন কহে যষ্টীবর সূত

আবার অন্যত্র বলেন-

বিরচিল গঙ্গাদাস বাণক তনয়

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন দ্বিজ মাধব। চৈতনোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্য হিসেবে দ্বিজ মাধবের সারদা রচিত সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কবি দ্বিজমাধব 'সারদাচরিত' চরনাকাল বর্ণনা করেছেন এভাবে-

ইন্দু বিন্দু বান দাতা শক নিয়োজিত

দ্বিজ মাধব গায় সারদা রচিত।[৪৭]

এই শ্রোক অনুযায়ী কাব্য রচনাকাল ১৫০১ শত অর্থাৎ ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ বোঝা যাচ্ছে। কবি দ্বিজ মাধব ছিলেন ঈসা খানের রাজ্যের অধিবাসী। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে, দ্বিজ মাধব সপ্তগ্রাম থেকে ময়মনসিংহ জেলার নবীনপুর (বর্তমান গোসাইপুর) গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। কবির বাংশধরগণ আদ্যাবধি প্রতিষ্ঠাসহ বিদ্যমান।[৪৮]

উল্লেখ্য যে, গৌড়ের সালতানাত বিলুপ্ত হবার পর সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ঐ সময় কিছুদিন বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য চর্চা চলতে থাকে। পরে সাহিত্যিকরা বিশেষ বিশেষ স্থানে যে সমস্ত রাজণ্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য চর্চার সুবিধা পেয়েছেন ঐ সমস্ত স্থানে গমন করে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

ঈসা খানের শাসনাধীন সকল রাজ্যের মধ্যে এগারসিন্ধুর ছিল একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। ঈসা খানের সেনা ছাউনিসহ একটি বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দর হিসেবেও এই স্থানটির গুরুত্ব ছিল। ঐ এগারসিন্দুরের অতি নিকটবর্তী ভিটাদিয়া গ্রামের কবি নিত্যানন্দ দাস ছিলেন ষোড়শ

[৪৬] মোহাম্মদ আশারাফুল ইসলাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ঈসা খাঁন, কিশোরগঞ্জ সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকা জানুয়ারী-১৯৯৫, পৃ. ১৯-২০

[৪৭] কিশোরগঞ্জের ইতিহাস, কিশোরগঞ্জের জেলা ইতিহাস প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৩, পৃ. ২০৪

[৪৮] আশুতোষ পাল ময়মনসিংহের কাব্য সাধনা, (প্রবন্ধ) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দির বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। এগারসিন্ধুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন-

বহু দেশে কামরূপ রাজ্য অতিশুদ্ধ
পঠানে লইল তাহা করি মহা যুদ্ধ।
সে দেশের রাজধানী এগারসিন্ধুর
ব্রহ্মপুত্র পাড়েস্থিত অতি মনোহর।[৪৯]

কবি এখানে এগারসিন্ধুরকে ঈসা খানের রাজত্বের রাজধানী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কারণ ১৫৮০ থেকে ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেশীরভাগ সময় ঈসা খান তার সৈন্যবাহিনী সভাসদ বর্গ এগারসিন্ধুরেই অবস্থান করতেন। ফলে কবির কাছে এই স্থানটিকে ঈসা খানের রাজধানী হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। নিত্যানন্দ দাস তার 'প্রেম বিলাস' কাব্য গ্রন্থে তৎকালীন সময়ের এগারসিন্ধুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে আর ও বলেছেন-

এগারসিন্ধুর আর দগদগা স্থানে
বাণিজ্য বিখ্যাত তা সর্বলোকে জানে
নানা দেশী বণিক আসয়ে এথায়
বেচা কেনা করে সঙ্গে আনন্দ হিয়ায়।[৫০]

ঈসা খানের সমসাময়িক একজন মুসলিম কবির সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি এগারসিন্ধরের অধিবাসী ছিলেন। ঈসা খানের কাহিনী সম্বালিত তার কাব্য গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। তার কাব্যের কিছু অংশ উপস্থাপন করা হল। কবির নাম শাহ বন্দে আসীর এগারসিন্ধুরী।

সালার সাজাইয়া যবে আসিলেক রণে
পরাজিত হইল তবে মোঘল পাঠানে
রাজত্ব করিল কায়েম ঈসা খান বীর
গড়িয়া উঠিল জনপদ লোহিত্যেব তীর[৫১]

---

[৪৯] কিশোরগঞ্জে ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

[৫০] মোহাম্মদ আলী খান সম্পাদিত, পাকুন্দিয়া উপজেলা ইতিহাস ও ঐতিহ্য মোহাম্মদ সাইদুর পাকুন্দিয়া উপজেলার কথা, পাকুন্দিয়া উপজেলার পরিষদ-১৯৮৭ পৃ. ৫০

কবি শাহ বন্দে আসীর ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। এগারসিন্ধুরে যে সকল দরবেশ ও ইসলাম প্রচারকদের মাযার রয়েছে তন্মধ্যে হযরত শাহ গরীব উল্লাহ (র.) এর মাযার অন্যতম। কবি শাহ বন্দে আসীর তারই অধঃস্তন ছিলেন বলে জানা যায়।

বাংলা ভাষার প্রতি ঈসা খানের অনুরাগ ছিল এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি ঈসা খানের কামানের গায়ে বাংলা ভাষায় লেখা 'সরাকার শ্রীযুক্ত ইছাখাঁর মসনদ্দালি সন হাজার ১০০২'। উল্লেখ্য যে, ঐ সময়ের যে সকল কামান আবিস্কার হয়েছে সবগুলোতেই কামানের পরিচয় দিতে গিয়ে আরবি ফারসি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বাংলার ভাটিরাজ্যের অধিপতি ঈসা খানের কামানে উৎকীর্ণ করা হয়েছে বাংলা ভাষা।[৫২] তার বাংলা ভাষার অনুরাগের কারণেই আজ বাংলা ভাষাভাষির ইসলামী সংস্কৃতির পরিবেশে গড়ে উঠে জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

ঈসা খানের সময় বয়নশিল্প

ঈসা খানের সময় তার রাজত্বে বয়নশিল্পের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। মসলিন বস্ত্রছিল এই বয়ন শিল্পের পৃথিবী বিখ্যাত বস্ত্র সামগ্রী। প্রাচীনকাল থেকেই সোনারগাঁওসহ কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা ছিল মসলিন বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র।

ঈসা খানের সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবুলফজল বলেছেন, সোনারগাঁও সরকারে এক প্রকার মিহি মসলিন প্রচুর পরিমাণে পস্তুত হয়। এগারসিন্ধুর শহরে একটি বড় পুকুর রয়েছে। এই পুকুরে ধোয়া কাপড়-চোপড় খুবই পরিষ্কার হয়।[৫৩]

ঈসা খানের সময় বাণিজ্য বন্দর হিসাবে যে স্থানগুলো প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তন্মধ্যে সোনারগাঁও, এগারসিন্ধুর এবং জঙ্গলবাড়ি ছিল অন্যতম। ঈসা খান ভাটিরাজ্যে শিল্পের বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি বণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিলেন ব্যাপকভাবে। তিনি ইউরোপীয় বণিকদেরকে, চীনা বাণিকদেরকে বাণিজ্য সুবিধা প্রধান করেন এবং বিশেষ করে উপমহা

---

[৫১] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান সম্পাদিত, কাব্য মালঞ্চে ঈসা খান কিশোরগঞ্জ সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকা ১৯৯৫ জানুয়ারী সংখ্যা, পৃ. ২৬

[৫২] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খাঁন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

[৫৩] আল্লামাআবুল ফজল, আইন-ই-আকবরীর, জাবেট অনুদিত ২য় খণ্ড আটলান্টিক পারলিশার্স এণ্ড ডিস্টিউটাস দয়ীয়াগজু নতুন দিল্লী পৃ. ৩৬

দেশের বিভিন্ন স্থানের সাথে ব্যাপকভাবে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ বৃটেনের দূত রালাফ ফীচ তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলেন, যে সে সময় সোনারগাঁওয়ে যে, সূতী বস্ত্র তৈরী হত তা ভারতীয় কার্পাস বস্ত্রের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।[৫৪]

পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দ ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারের পর পর্তুগীজ নাবিকরা ভারতীয় বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যের লাভজনক ব্যবসা করতে থাকে। ফলে ইউরোপে বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদার বিষয় হয়ে ওঠেছিল।[৫৫] রালফ ফীচ বলেছেন The chief King all these countries is called Isa can, and he is chief of all the other kings and is a great friend to all christians.[56]

রালফ ফীচের বক্তব্য যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে স্পষ্ট অনুমান করা যাবে যে, র‍্যালফ বীচ খি, বলতে ঐ সময় ইউরোপীয় বণিকদরকেই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। বয়নশিল্পের প্রভূত উন্নতির জন্য ঈসা খান কার্পাস উৎপাদন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী স্থানসমূহে ছিল সুক্ষ্ম মসলিনের নিতান্ত অপরিহার্য উপকরণ উৎকৃষ্টতম কার্পাস উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য স্থান। ঈসা খানের রাজত্বে কার্পাস উৎপাদনে কৃষকরা যাতে বিভিন্ন সহযোগিতা লাভ করতে পারে তার জন্য কার্পাস উৎপাদনের কেন্দ্রস্থলগুলোতে যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ঈসা খানের সময় বিশ্বের অন্যান্য রাজন্যবর্গের ন্যায় মোঘল সম্রাট ও তাদের হেরেমের মহিলাদের কাছে এই ভাটিরাজ্যের মসলিন বস্ত্র এক আকর্ষণীয় বস্ত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। আর সেই কারণে তৎপরবর্তীকালে জঙ্গলবাড়ি, এগারসিন্ধুর ও বাজিতপুর উৎপাদিত মসলিন বস্ত্র বিদেশী কোন বণিক অথবা এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা যাতে রফতানী করতে না পারে এবং উপযুক্ত মূল্য দিয়ে শুধুমাত্র মোঘল সম্রাটের খরিদ করতে পারে এই জন্য সাম্রাট নুর জাহান

---

[৫৪] যে এন দাস গুপ্ত, বেঙ্গল ইন দি সিক্সটিস্থ সেঞ্চুরী এডি কলিকাতা-১৯১৪, ড. ওয়াকিল আহমদ বাংলায় বিদেশী পর্যটক, পৃ. ১১৬

[৫৫] রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাসঃ ২য় খণ্ড প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

[৫৬] জে এন দাস গুপ্ত, বেঙ্গল ইন সিক্সটিস্থ সেঞ্চুরী এডি, কলকাতা ১৯১৪, ড. ওয়াকিল আহমদ বাংলায় বিদেশী পর্যটক, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

জঙ্গলবাড়িতে দায়োগা নিয়োগ করেছিলেন। চমৎকার কতগুলো নামে বিভিন্ন প্রকার মসলিন বস্ত্র উৎপাদিত হত।

মলমলে খাস-

ঈসা খানের শাসনামলে এই নামের সূক্ষ্ম বস্ত্রটি মলবুসে খাস নামে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। আঠার শতকের এই কাপড়কে মলমলে খাস নামে অভিহিত করা হয়। এই কাপড় ১৮০০ থেকে ১৯০০ সূতা ব্যবহৃত হত। এই সময় কাপড় এত সূক্ষ্ম ছিল যে, ১০ গজ দৈর্ঘ্য এবং ১ গজ প্রস্থ ১টি টকুরা ৬ থেকে ৭ তোলার বেশী হত না।

জঙ্গল খাস

ঈসা খানের শাসনামলে উৎপাদিত মসলিন বস্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্ত্র ছিল জঙ্গল খাস। ঈসা খানের পরিবার পরিজন এবং ভাটিরাজ্যের মজলিশ ও তাদের পরিবার পরিজনের পরিধেয় বস্ত্র ছিল জঙ্গল খাস। সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক আবুলফজল তার আইন-ই-আকবরীতে জঙ্গল খাসের কতা বলেছেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী ধারণা করা যায় যে, ঐ সময় জঙ্গলবাড়িতে উৎপাদিত এই মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত করা হত এগারসিন্ধুরে অবস্থিত বিভিন্ন পপ্তুত কারখানায়।[৫৭]

২০ গজ দৈর্ঘ্য ও ১ গজ প্রস্থে জঙ্গল খাস তৈরী হত। জঙ্গলবাড়িতে তাঁতীরাই শুধুমাত্র এই বস্ত্র তৈরীতে দক্ষ ছিল। জঙ্গল খাস ছিল সাদা জমিন বিশিষ্ট কাপড়।

শবনম

ভোরবেলার শিশির নামের এই কাপড়টি এত পাতলা ছিল যে, তাঁতীরা একে শবনব নাম দিয়েছিল। শবনম নামের এই মসলিনটি প্রস্তুত হবার পর খাসের উপর শুকাতে দিলে শিশির এবং কাপড়ের মধ্যে প্রার্থক্য বোঝা কষ্টকর ছিল। আর তাই এর নাম দেওয়া হয়েছিল শবনম। এই কাপড়টি সাদা জমিন বিশিষ্ট ছিল এবং পরিধেয় জামা কাপড় তৈরির জন্য এই কাপড়ের যথেষ্ট কদর ছিল।

তানজেব

[৫৭] আবদুল করিম, ঢাকাই মসলিন, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

শব্দটি মূলত তন-জেব। তন অর্থ দেহ এবং জেব অর্থ অলংকার। অথার্ৎ দেহের অলংকার। কাপড়টির দ্বারা অভিজাত পরিবারগুলো জামা কাপড় তৈরীর জন্য ঐসময় খুবই উৎসুক থাকত। এই বিখ্যাত মসলিন বস্ত্রটি বিদেশেও প্রচুর রফতানী করা হত।

তারান্দাম

পরিধেয় জামা কাপড় পস্তুতের জন্য এই কাপড়টি তৈরী করা হত। আরব ও পারস্য বণিকরা এই কাপড়টি বেশী পরিমাণে খরিদ করত। বিভিন্ন রঙে এই কাপড়টি তৈরী হত। এই কাপড় ২০ গজ লম্বা ও ১ গজ চওড়া মাত্র ১০ তোলা থেকে ৮০ তোলা পর্যন্ত ওজন হত।

সরবুটি

এই কাপড় তৈরী হত মূলত পাগড়ির জন্য। বুটিদার বুননে এই কাপড়ের ব্যাপক চাহিদা ছিল। ঈসা খানের আমলে এই কাপড় ভারতের মুসলিম অধ্যূষিত অঞ্চলে অভিজাত ব্যক্তিরা খরিদ করত। মধ্য এশিয়ায় এই বস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল। এছাড়াও মসলিন বস্ত্রে নকশা করা বিভিন্ন নামের কাপড় প্রস্তুত করার জন্য কারিগরদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্টপোষকতা করা হত। সমসাময়িক লেখকদের বিবরণের অভাবে মসলিনের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে ঈসা খানের সময় বয়নশিল্পে ব্যাপক উৎকর্ষ ঘটেছিল বলে উল্লেখিত বর্ণনায় স্পষ্ট অনুমান করা যায়।

অনেকে বলেন, ঈসা খান যখন ভাটিরাজ্যের রাজধানী সোনারগাঁও প্রতিষ্ঠা করেন তখন প্রায় ২০০ বছর পর সোনারগাঁওয়ে এ আবার প্রাণচাঞ্চল ফিরে আসে। কারণ ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার দুশো বছরের স্বাধীন সুলতানী আমলে কয়েকবার সোনারগাঁওয়ে সমগ্র বাংলার রাজধানী হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আর্ন্তজাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের একটি প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বেশীরভাগ সময় বাংলার রাজধানী গৌড় অথবা পান্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হবার ফলে সোনারগাঁওয়ের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। ঈসা খান ক্ষমতা লাভের পর সোনারগাঁও আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের এক উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য বন্দর হিসেবে।

Dhaka University Institutional Repository

রালফ ফীচ বলেছেন, ঐ সময় সোনারগাঁও থেকে প্রচুর পরিমাণ সূতী বস্তা এবং চাউল ভারতের অপরাপর অংশে, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং আরও বিভিন্ন স্থানে রফতানী হত।[৫৮]

বিবিধ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মসলিন বস্ত্রের রফতানী বাণিজ্যে বিদেশী বণিকদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে ঈসা খানের রাজত্বকালীন সময়ে ওলন্ডাজ ইংরেজি ও ফারসি বণিকরা এগারসিন্ধুরে এবং সোনারগাঁওয়ে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে বাণিজ্য করতে আসে। ষোল শতকের গোড়ার দিকে তারা বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে, হুগলী বন্দরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এবং সেখানে থেকেই বাংলা এই অঞ্চলে উৎপাদিত মসলিন বস্ত্রসহ অন্যান্য রফতানী পণ্যের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। পর্তুগীজদের বাণিজ্যের এই ধারা ঈসা খানের সময় অনেক কমে আসে এবং আস্তে আস্তে ইংরেজরা প্রাধান্য লাভ করে। পর্তুগীজরা তখন মসলিন বস্ত্রের চোরাকারবারী হিসেবে এবং চিটাগাংগের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে মগদের সাথে মিলিত হয়ে লুঠতরাজসহ অন্যান্য অপকার্যে লিপ্ত হতে থাকে। এই ক্ষেত্রে ঈসা খান কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বণিকদের সোনারগাঁওসহ তার রাজত্বে অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সোনারগাঁও থেকে সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকা পর্যন্ত মৈত্রী জোটের অর্ন্তভূক্ত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রাজন্যবর্গের সহায়তায় সামরিক চৌকি স্থাপন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের তৎপরতা বন্ধ করতে সক্ষম হন।

ঈসা খানের সময় তার রাজত্বে উৎপাদিত মসলিনের রফতানী বাণিজ্যের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দের দিকের মসলিন বস্ত্রের উৎপাদন ও রফতানী কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ ইংরেজী লেখকরা লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে দেখা যায় বার্ষিক ২৮$\frac{১}{২}$ লক্ষ

---

[৫৮] ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলায় বিদেশী পর্যটক, পৃ. ১১৬

টাকার বস্ত্র উৎপাদন করত এই অঞ্চলের তাঁতীরা।[৫৯] ঐ সময় মসলিন বস্ত্র উৎপাদন বিষয়টি অনেকটা কমে গিয়াছিল বলে অনেকে মনে করে থাকেন। ঐ প্রসঙ্গে জেমস টেইলর বলেন, উৎকৃষ্ট ধরণের মসলিন তৈরীর জন্য কয়েকটি স্থান বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল আর সেগুলো হচ্ছে ঢাকা সোনারগাঁও, ধামরাই, তিতাবর্দী জঙ্গলবাড়ি, বাজিতপুর[৬০] এগারসিন্ধুর সোনারগাঁওসহ অন্যান্য এলাকার তাঁতীরা আরও বেশী মূল্যের বস্ত্র উৎপাদনের বিষয়টি ধারণা করা যায়। কেননা এই সময় মসলিন বস্ত্রে রচম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।[৬১]

ঈসা খানের সময় এই মসলিন বস্ত্র এত বেশী সমাধিত ছিল যে, সারাবিশ্বকে আকর্ষণ করেছিল। বাংলায় সৃষ্টি হয় এক অন্যরকম সংস্কৃতির পরিবেশ যা পরবর্তীতে বাংলার স্বাধীনতা। হয় বাংলাদেশ।

---

[৫৯] জিমস যেইলর, ডিসক্রিপটিভ এন্ড হিস্টিকাল একাউন্ট অব দি কটন ম্যানুফ্যাকচারারস অব ঢাকা লন্ডন, ১৮৫১ পৃ. ৪

[৬০] আবুদল করিম, ঢাকাই মসলিন, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৮৫-৮৬

[৬১] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

পৃ. ২০০-২৪৮

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ঈসা খানের প্রতিরক্ষা কৌশল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খ) ঈসা খানের দূর্গসমূহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ) ঈসা খানের মসজিদ স্থাপত্যসমূহ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঘ) দেওয়ানবাগে প্রাপ্ত ঈসা খানের সাতটি কামান

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের প্রতিরক্ষা কৌশল

ঈসা খানের অসামান্য রণকৌশল অসাধারণ প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার মাধ্যমে মোঘল হানাদার বাহিনীর অসংখ্য আক্রমণ প্রতিহত করে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে দেখা যায় যে, ঈসা খান এমন এক সময় বাংলায় এই অঞ্চলে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন যখন অখণ্ড ভারতের গোটা অঞ্চল একের পর এক সম্রাট আকবরের সামরিক শক্তির নিকট পদানত হচ্ছিল।

ঈসা খান বাংলার ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুদ্ধকৌশল উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন। এই যুদ্ধকৌশল উন্নয়নে যে কয়েকটি উপাদান ছিল তন্মধ্যে বিচক্ষণ সেনাপতিত্ব ছিল একটি দ্বিতীয় উপাদান ছিল পদাতিক বাহিনী। ঈসা খান উপলব্ধি করেছিলেন যে, নদ-নদী অধ্যুষিত বাংলায় যুদ্ধের জন্য আশ্বারোহী সৈন্য অপেক্ষা পদাতিক সৈন্যের সংগঠন অধিকতর উপযোগী। ঈসা খানের পাইক নামে পরিচিত পদাতিক বাহিনী এমন ধরনের সামরিক কৌশলের অধিকার ছিল যে, তারা বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় সংগ্রামে কৃতিত্ব অর্জন করেছিল।

ঈসা খানের যুদ্ধকৌশলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল নৌবহর। এ প্রসঙ্গে ডঃ এম এ রহিম বলেছেন যে, ঈসা খান পূর্ববাংলা থেকে মোঘল নাওয়ারা বিতাড়িত করেন। তিনি তার দ্রুতগতিশীল রণতরীর সাহায্যে প্রায়ই পশ্চিমবাংলার ঘোড়াঘাট অঞ্চল পর্যন্ত মোঘল এলাকায় হানা দিতেন এবং একসময় তিনি বিখ্যাত মোঘল সেনাপতি মানসিংহের অবস্থা সংকটজনক করে তুলেছিলেন। বিক্রমপুরের নিকট নৌযুদ্ধে মানসিংহের নৌবহরের উপর তার চুড়ান্ত বিজয় ষোড়শ শতকের বাংলার নৌবাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।[১] তার মতে যুদ্ধের কলাকৌশল উন্নয়নে পদাতিক বাহিনীর যুদ্ধ কৌশলের সাথে নৌবহরের বিজ্ঞানসম্মত সমাবেশ ছিল ঈসা খানের রণকৌশলের অন্যতম উপাদান।

ঈসা খানের যুদ্ধকৌশলের আর একটি পদ্ধতি ছিল দেশীয় অস্ত্রের ব্যবহার। ঐতিহাসিকরা[২] বলেছেন, এসব দেশীয় অস্ত্রসস্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাঁশের লাঠি। বাংলায় প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য লম্বা বাঁশের লাঠি বা তরবারি ও অন্যান্য বহু অস্ত্রসস্ত্র অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। সৈনিকগণ

---

[১] ড. এম. এ. রহিম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

[২] শ্রী প্রিয়দর্শন কার্মা, বাংলার সামরিক ইতিহাসের গোড়ার কথা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ভারত, ১৯৮৮, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

লম্বা লাঠি নিয়ে অপেক্ষাকৃত দূর থেকে শত্রু সৈন্যদের বিরুদ্ধে অধিকতর সুবিধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারত।

ঈসা খান মোঘল হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় প্রথম কৌশল হিসেবে সোনারগাঁও এবং এগাঁরসিন্ধুরের বিশেষ করে পশ্চিম ও উত্তর দিকের নদীসমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌবহর মোতায়েন রেখে আক্রমণকারীদের আক্রমণের প্রথম দিকেই প্রতিহত করতে তৎপর থাকার জন্য তার বাহিনীকে নির্দেশ দিতেন। আর এভাবেই এককটি ক্ষুদ্র দল বিরাট শত্রু বাহিনীর অগ্রগতি পতিহত করতে সক্ষম হত। এ ছাড়াও ঈসা খান কর্তৃক নিয়োজিত সামরিক নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা ব্যবস্থা ও যুদ্ধ রচনা কৌশল এমন ভাবে করতেন যাতে তারা বাংলার এই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার সুযোগ সুবিধা নিতে পারেন।

প্রথমদিকে মোঘলরা তাদের যুদ্ধ যাত্রায় সরাসরি নৌ-পথ অনুসরণ করলেও পরবর্তী সময়ে তাদের সামরিক অভিযানের প্রকৃতি পরিবর্তন করেন। শাহবাজ খান যখন বাংলার সুবেদার ঐ সময় ঈসা খানের বিরুদ্ধে দুই ধরনের সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। প্রথমত, শাহবরদীর নেতৃত্বে পদাতিক বাহিনী আর দ্বিতীয়ত: শাহবাজ খানের নেতৃত্বে পদাতিক ও নৌবাহিনী। ঈসা খান এই দুই ধরনের সামরিক অভিযানকেই প্রতিহত করেছিলেন অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে।

ঈসা খানের সাথে যারা মৈত্রী জোটে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বেশ কয়েকজন হিন্দু সামন্ত রাজা। উত্তর প্রদেশ এবং বিহার থেকে বিতাড়িত আফগান জায়গীরদার, ফৌজদার ও সম্রাট শেরশাহের দরবারে অমাত্যবর্গ ও মৈত্রী জোটে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে আফগান সেনানায়কদের রণদক্ষতা ছিল যথেষ্ট এবং মোঘল বাহিনীর যুদ্ধের কলা-কৌশল সম্পর্কে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। অপর দিকে বাংলার সামন্ত রাজারা বংশ পরম্পরায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল শাসন করার ফলে বাংলার পরিবেশ ও প্রকৃতির অবস্থার পূর্ণ অভিজ্ঞতার আলোকে তারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচালনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতেন ঈসা খান মোঘলদের সাথে যে কোন যুদ্ধে যতদূর সম্ভব রক্তপাত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন এবং কৌশলে শত্রুদেরকে পরাজিত করার পন্থা অবলম্বন করতেন।

ঈসা খানের যুদ্ধ কৌশলের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে তড়িৎ গতিতে মৃন্ময় দূর্গ নির্মাণ করা। 'বাহারিস্তান-ই-গায়বী' গ্রন্থে সমসাময়িক কালের লেখক মির্জা নাথান

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন যে, বাংলায় সৈন্যরা প্রয়োজনের সময় তড়িৎ গতিতে এমন দূর্গ নির্মাণ করে ফেলে যা সুদক্ষ কারিগরগণও বহুমাস এবং বছরব্যাপী সময়েও নির্মাণ করতে সমর্থ হয় না।[৩]

এ প্রসঙ্গে এম এ রহিম বলেছেন যে, বাংলায় বনজঙ্গল ও ঝোপঝাপ বাঙ্গালি সৈন্যদের গেরিলার যুদ্ধের উপযোগী ছিল।[৪] আকবরনামায় বলা হয়েছে যে, বাঙ্গালি সৈন্যরা তাদের শত্রু সৈন্যদের অভিযান পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকত এবং অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে চক্রভঙ্গ করে দিত। ফলে ঈসা খানের মত একজন জমিদার বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহের সৈন্যদের উপর সামরিক সুবিধা লাভ করেন এবং ঘোড়াঘাটে মোঘল সৈন্যবাহিনীকে বিপদাপন্ন করে তোলেন।[৫]

ঈসা খান বেশ কয়েকটি সামরিক ছাউন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সামরিক ছাউনিগুলোর মধ্যে এগাঁরসিন্ধুর এবং বক্তারপুর সামরিক ছাউনি ছিল অন্যতম। বর্তমান শেরপুর জেলার গড়জড়িপা কেল্লাতাজপুর, বোকাইনগর কেল্লা, কালাগাছিয়া দূর্গ, খিজিরপুর দূর্গ প্রভৃতিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখা হত।

এছাড়া আক্রমণকারী বাহিনীর যে কোন আক্রমণের সময় সামরিক মৈত্রী জোটের অধীন প্রত্যেক জমিদার তাদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। প্রয়োজনে অন্যান্য স্থান থেকেও পদাতিক ও নৌসেন্যরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসত। তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভিন্ন স্থান থেকে শত্রু সৈন্যদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করত। ফলে শত্রু পক্ষের বিশাল সামরিক বাহিনীও পযুর্দস্ত হয়ে যেত। ঈসা খানের রণকৌশলের প্রশংসা করেছেন ঐতিহাসিকরা। এম এ রহিম বলেছেন, সোনারগাঁও এর জমিদার ও বার ভূঁইয়াদের প্রধান ঈসা খান ছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও সেনাপতি। সামরিক সংগঠন সেনাপত্বি ও সৌর্য বীর্যে তিনি এমনকি, শাহাবাজ খান, সাদিক খান এবং মানসিংহের সম্রাট আকবরের খ্যাতনামা সেনাপতিদের উপরেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৬]

এ প্রসঙ্গে এম এ রহিম আরো বলেন, রণনিপুণ ও অভিজ্ঞ সেনাপতি মানসিংহের ঈসা খানের যুদ্ধে বাঙ্গালিদের চমৎকার সামরিক কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। সব রকম সামরিক কলাকৌশল অবলম্বন করে দীর্ঘ অভিযান করেও মানসিংহ এই বাঙালি যোদ্ধার সাথে যুদ্ধে স্থায়ী সাফল্য অর্জনে

[৩] মির্জা নাথান, বাহারিস্তান-ই-গায়বী, ১ম খন্ড, খালেক দাদ চৌধুরী অনুদিত বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃ. ৪৮

[৪] এম. এ. রহিম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

[৫] আবুলফজল, আকবরনামা, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১৪

[৬] এম এ রহিম, বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫

Dhaka University Institutional Repository

ব্যার্থ হন।[৭] বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন অব্যহত রাখা সম্ভব হত না যদি বাংলার ধারাবাহিক স্বাধীনতা না থাকত। বার ভূইয়ার প্রধান ঈসা খান তার নিজের প্রতিভা ও রণকৌশলের মাধ্যমে মোঘল সম্রাটের কয়েকজন সেনাপতিকে প্রতিহত করে মোঘলদের অধিনতা থেকে মুক্ত করে বাংলায় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন। যে কারণে আজও বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

[৭] এম এ রহিম বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

Dhaka University Institutional Repository

ভাটির নাওয়ারা

বাংলার মোঘল নাওয়ারার বিপ্লবীতে ঈসা খান গঠন করেছিলেন ভাটি নাওয়ারা। অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল সমৃদ্ধ এই পূর্ব বাংলার প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম ছিল নদীপথ। এই নদী পথেই উত্তর প্রদেশ থেকে বন্যার মত ছুটে এসেছে মোঘল সৈন্যরা। অন্যদিকে ঈসা খান মসনদ-ই-আলা তার নাওয়ারার মাধ্যমে এই আগ্রাসন শক্তিকে পতিহত করেছেন বছরের পর বছর অসাধারণ রণকৌশলের মাধ্যমে।

ঈসা খান তার নৌবাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহ্যগত দিক অনুসরণ করেছিলেন। ১২১২ খ্রিস্টাব্দ বাংলার মুসলিম শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খালজি সর্বপ্রথম নৌবহর গঠন করেন এবং বাঙালি নাবিকদের সাহায্যেই নৌবহর পরিচালনা করতেন। পরবর্তী সময়ে দিল্লীর সুলতানী আমলে এবং বাংলার সুলতান মুগিস উদ্দিন তুঘরল এবং বাংলার স্বাধীন সুলতান ফখরউদ্দিন মুবারকশাহ, শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ প্রমুখ সুলতানের সময় নৌবহরের বিশেষ উন্নত হয় ও শক্তিশালী সামরিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ঈসা খানের সময় বাঙালিরা নৌকা নির্মাণে যেমন দক্ষ্য ছিল তেমনি নৌ চালনায় ও নৌযুদ্ধে নিপুণ ছিল। এ বিষয়টি প্রমাণ করা যায় ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে। এ প্রসঙ্গে প্রিয় দর্শন সেন শর্মা বলেন যে, ঈসা খান একটি জোট রাজ্যের অধিপতি হলেও তার রণকূশলতা এবং চতুর নেতৃত্বের জন্য তিনি মোঘলদের আতংকের কারণ হয়েছিলেন।[৮]

'মাসালিক-আল-আবসার' গ্রন্থের লেখক ইবনে ফজলুল্লাহ আল উমরী বাঙ্গালিদের জাহাজ নির্মাণ ও নৌচালনার নৈপুণ্যের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ঐ সময় লক্ষণাবর্তীতে দুই লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ দ্রুতগতি সম্পন্ন নৌকা ছিল। যদি কেউ এগুলোর মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী সেই নৌকার উপর তীর নিক্ষেপ করে তাহলে এদের দ্রুত গতির দরুন নিক্ষিপ্ত তীরটি তাদের মধ্যবর্তী নৌকার উপর পড়বে।[৯]

ঈসা খানের সমসাময়িক ঐতিহায়িক আবুলফজল বলেন, যুদ্ধ, পরিবহন বা দ্রুত চলার জন্য বাঙ্গালিরা বিভিন্ন প্রকারের নৌকা প্রস্তুত করে। দূর্গ আক্রমণের উদ্দেশ্যে এসব নৌকা এমনভাবে

---

[৮] প্রিয়দর্শন সেনশর্মা, বাংলার সামরিক ইতিহাসের গোড়ার কথা, পরিশ্চবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৬

[৯] ইবলে ফজলুল্লাহ আল উমরী, 'মাসলিক আল আবসার' অনুবাদ, পৃ. ১৭, এম এ রহিম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ করা হয় যে, যখন এদেরকে তীরের দিকে চালনা করা হয় তখন এদের অগ্রভাগ দূর্গের শীর্ষ দেশ ছাড়িয়ে উপরে উঠে এক এতে দূর্গ দখল করা সহজ হয়।[১০]

এম এ রহিম বলেন যে, নৌশক্তির বিরাট গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকায় বাঙালি শাসকগণ বহুসংখ্যক রণতরীর একটি বহর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।[১১]

ইবনে বতুতার বর্ণনায় ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের নৌশক্তি এবং বাংলার যুদ্ধ বিগ্রহে রণতরীর চূড়ান্ত ভূমিকা সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়।[১২] সম্রাট জাহাঙ্গীর তার তুজুকে বলেছেন, বাঙালি শাসকগণ সর্বদা ৫,০০০ রণতরী রাখতেন।[১৩]

বাংলার বার ভূঁইয়াদের প্রত্যেকের রণতরীর বিরাট বহর ছিল। তন্মধ্যে ঈসা খানের ভাটির নাওয়ারা ঘোড়শ শতাব্দিতে বিশেষভাবে কৃতিত্বের অধিকারী ছিল। কারণ তারা মোঘল নাওয়ারাকে পর্যুদস্ত করেছিল। ভাটির নাওয়ারায় বিভিন্ন ধরনের রণতরী ছিল যেমন কোষা, জালিয়া, ধুয়া, সুন্দরা, বজরা, খেলনা, পিয়ারা, বালিয়া, পাল, গুয়ার, মাসুরা পাস্তা, স্তুপ, পাততা, উলাখ, ময়ুর পঙখী, গায়দুর চালকর, পানশী, গালওয়ার ইত্যাদি আকারে ও গঠনে ভিন্নতা এ সমস্ত রণতরী নৌযুদ্ধে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহৃত হত। ওয়ার তিল গোলন্দাজ রণতরী বা কামানবাহী সামরিক নৌযান এবং জালিয়া ছিল ছিপনৌকা, কিছু সংখ্যক নৌকা গোলন্দাজ, তীরন্দাজ, কল্লামধারী এবং অন্যান্য শ্রেণীর সৈন্য ও নৌযোদ্ধাদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

ঈসা খানের নৌবহরগুলো পূর্ব বাংলার বিভিন্ন নদীতে সতর্কতার সাথে মোতায়ন করা হত। তারা প্রাথমিকভাবে সহস্য আবির্ভূত হয়ে শত্রু বাহিনীকে হঠাৎ আক্রমণ করত এবং শত্রু সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবার পূর্বেই আবার তারা অদৃশ্য হয়ে যেত। ঈসা খানের নৌসেনারা দাঁড় টানা এবং সাঁতারে বিশেষ পারদর্শী থাকায় তড়িৎ গতিতে যুদ্ধের নতুন নতুন কৌশল উদ্ধাবন করতে পারত। তারা সামরিক রণতরী পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন অভিজ্ঞ ছিল ঠিক তেমনি রাতারাতি মৃন্ময় দূর্গ তৈরিতেও পারদর্শী ছিল।

ঈসা খানের রণতরীগুলোতে যারা হাল ধরতেন তাদেরকে বালা হত ‘পাঞ্চারী’। যারা দাঁড় টানতেন তাদেরকে বলা হত ‘দাঁড়ি’। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলাকে পাকুন্দিয়া থানার এগারসিন্ধুরের নিকটে দরবারপুর গ্রামে আজও প্রচলন আছে যে, আশিঘর দাঁড়ি একঘর পাঞ্চেরীতে। অর্থাৎ ঈসা

[১০] আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

[১১] এম এ রহিম বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২

[১২] নলিনীকান্ত ভট্টাশালী রচিত করেন এন্ড ক্রনশজি আর্লি ইন্ডি পেন্ডেন্ট সুলতান ক্যাবব্রীজ, ১৯২২, পৃ. ১৩৫-১৩৮

[১৩] এম এ রহিম বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২

Dhaka University Institutional Repository

খানের নৌসৈন্যদের কিছু সংখ্যক দাঁড়ী ও একজন পাঞ্জেবী এই স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল বলে এই বাক্যটির উৎপত্তি ঘটে। ঈসা খানের সামরিক বাহিনীর যুদ্ধের কলাকৌশল উন্নয়নে পদাতিক বাহিনীর যুদ্ধ কৌশলের সাথে নৌবহরের বিজ্ঞানসম্মত সমাবেশ ছিল অন্যতম উপাদান। তড়িৎ গতি সম্পন্ন রণতরী নিপুণভাবে পদাতিক সৈন্যদের চলাফেরায় সাহায্যে করত এবং অতপর উভয় বাহিনী শত্রুর বিরুদ্ধে যুগপৎ আক্রমণ চালাত। ফলে ঈসা খানের এই ভাটির নাওয়ারা বাংলার যুদ্ধ কৌশলের একটি শক্তিশালী উপাদানে পরিণত হয়।[১৪]

ঈসা খানের রণতরীগুলো কি ধরনের ছিল এর একটি বাস্তব নিদর্শন রয়েছে এগারসিন্ধুরের অতি নিকটে পাকুন্দিয়া থানা সদর থেকে সামান্য কিছু উত্তরে কোষাকান্দা গ্রামে।[১৫] কথিত আছে যে, ঈসা খানের একটি রণতরী এই স্থানে এসে মাটির সাথে আটকে যায়। এই কোষাটিকে সরিয়ে নিতে ব্যার্থ হয় নৌসেনারা। ফলে কোষাটি ঐ স্থানেই থেকে যায়। সময়ে আবর্তে এই কোষাটি তার আকৃতি ঠিক রেখে একটি মাটির ঢিবিতে পরিণত হয়। আজও সেই কোষার আকৃতিতেই মাটি ঢিবিটি ঈসা খানের নৌবহরের একটি স্থাপতি বহন করছে।[১৬]

বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ঈসা খান মসনদ-ই-আলার রণকৌশল বিশেষ করে ভাটির নওয়ারার অবদান ছিল অন্যতম। কেননা বাংলার অনেক এলাকাই ছিল ভাটিএলাকা। এছাড়া বাংলার বার ভূইয়াদের সকলের কিছু না কিছু রণতরী ছিল, এই রণতরীর সাহায্যেই ঈসা খান মোঘলদের বিরোদ্ধে বিজয়ী হন। বাংলাকে মোঘলদের অধীন থেকে মুক্তকরে বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখেন এবং বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করেন।

---

[১৪] কোষাকান্দার শতাতালি বদ্ধ ফকিরের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান যে, প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে এই টিবির অভ্যন্তরে থেকে বেশ কিছু তরবারি বর্শার ফলক উদ্ধার করা হয়েছিল। উদ্ধারকৃত জিনিসগুলো একজন দারোগা নিয়ে যায়।

[১৫] এই স্থানটি পাকুন্দিয়া কিশোরগঞ্জ রাস্তার পার্শ্বেই। প্রাচীন মলংনদী এই স্থান দিয়েই প্রবাহিত হত। বর্তমানে এই নদীর চিহ্ন মাত্রও নেই। কোষাকান্দা পাকুন্দিয়া থানা সদর থেকে প্রায় ২.৫০ কিঃ মিঃ উত্তর দিকে।

[১৬] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের দূর্গসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

কাতরাবো দূর্গ

কাতরাবো দূর্গটি বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার মাসুমাবাদ গ্রামে অবস্থিত। শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে বাহাদুর খান বিলের পার্শ্বে এই দূর্গটি ঈসা খান নির্মাণ করেন। এই স্থানে ঈসা খান তার ভাটিরাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ মোঘল সুবেদার শাহবাজ খান এই দূর্গ নগরীটি ধ্বংস করেন। এরপর ঈসা খান বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁওয়ে তার রাজধানী স্থানান্তর করেন।

দূর্গটি নির্মিত হয়েছিল মৃন্ময় পদ্ধতিতে। তবে দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্ব দিকে ইষ্টক নির্মিত দেয়াল দ্বারা দূর্গটিকে বিষেভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। দূর্গের আয়তন উত্তর দক্ষিণে ৩৯৬০'-০ এর পূর্বপশ্চিমে ২৯৭০'-০। এই দূর্গ নগরীর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে একটি বিশাল দীঘি। আজও যাকে মানুষ 'দেওয়ান দীঘি' বলে অভিহিত করে থাকে। **কাতরাবো** দূর্গের অভ্যন্তরে এবং আশেপাশে অসংখ্য দালান কোটার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দূর্গটি ঈসা খান তার ভাটিরাজ্যের রাজধানী হিসেবে যথাযোগ্যভাবে গড়ে তুলেছিলেন। দূর্গের প্রবেশ তোরণটি পূর্বদিকে অবস্থিত। দূর্গের বাইরে প্রায় ২০০ বিস্তৃত পরিখা খনন করা হয়েছিল বলে স্পষ্ট অনুমান করা যায়।[১৭]

এ প্রসঙ্গে আরো পরিষ্কার আলোচনা করেছেন অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান তাদের গ্রন্থ 'ঈসা খাঁ: সমকালীন ইতিহাসে' বিখ্যাত **কাতরাবো** দূর্গের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরের এবং বাহাদুর খান বিলের ধারে আজও পরিদৃষ্ট হয়। দূর্গের চর্তুদিকস্থ বিভিন্ন ভিত্তি স্তরের নিদর্শন হতে এখনও সহজেই এই দূর্গের ভূমি নকশা দেখা সম্ভব। এককালের জনাকীর্ণ শহর **কাতরাবো** ছিল একাধারে ঈসা খানের প্রথম রাজধানী এর সুরক্ষিত বাসস্থান। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ মোঘল সুবাদার শাহবাজ খান কর্তৃক **কাতরাবো** বিধ্বস্ত হলে ঈসা খান সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং মাসুম খান কাবুলী দূর্গের অংশ বিশেষ পুন:নির্মাণ পূর্বক সেখানে বসতি স্থাপন করেন। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ মাসুম খান কাবুলীর মৃত্যু পর্যন্ত **কাতরাবো** তার দখলে ছিল। বাহরিস্তান-গায়েবী হতে জানা যায় যে, মোঘল সুবেদার ইসলাম খানের শাসনামলে মুসা খান দাউদ খানকে **কাতরাবো** নিযুক্ত করেছিলেন।

---

[১৭] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

১৬১১ খ্রিস্টাব্দ ১২ মার্চ মির্জা নাথানের নেতৃত্বাধীন বাহিনী অকস্মাৎ **কাতরাবো** উপর আক্রমণ পূর্বক দাউদ খানকে পারাজিত করেন এবং **কাতরাবো** দূর্গ ধ্বংস করেন। বাহারিস্তান-ই-গায়েবী হতে আরও জানা যায় যে, **কাতরাবো** কদম রসুল হতে উত্তরে, শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে এবং খিজিরপুর হতে প্রায় বার মাইল দুরে অবস্থিত। **কাতরাবো** চৌহদ্দী এখনও স্থানীয় লোক কাহিনীতে বর্ণিত একটি ছড়া গানের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। ছড়া গানটি নিম্নরূপ-

বব আঠারব (কোটারব)
বাইল্যা আর ছোনাব
হাটতে হাটতে হাটাব,
জামাই গ্যাছে মিঠাব।
শ্বশুর পাড়া গুইত্যাব,
আমের বাগান পোড়াব।
পান খাইতে যাও বিরাব
আমাগো বাড়ি মুইড়াব।
বৌ এর বাড়ি পেরাব,
খাইজ্যা দেহ বারব।
নাকারা বাছে বাজনাব
বাড়ির কাছে আমলাব।
খোলা মাঠে বেলাব,
মানীর মান ভোলাব,
গলা কাটা পোনারব,
উল্টা পাড়ে বিনরাব।
নাও ডুবাইছে কেরাব,
সর্বশেষে তারাব।

এ থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে, সে সময়ে **কাতরাবো** ছিল একটি পরগনা (তৎকালীন জেলা) যা শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী ঢাকা ও ময়মনসিংহের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বৃটিশ শাসনামলে বিভিন্ন দলিল দস্তাবেশ অনুযায়ী **কাতরাবো** আজও একটি টপপা এবং তৌজির নাম। ঈসা খানের রাজধানী শহর **কাতরাবো** কালের পরিক্রমায় বর্তমানে মাছুমাবাদ নামক গ্রামে

Dhaka University Institutional Repository

রূপান্তরিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার অধীনে বারোক মৌজায় অবস্থিত। এই মাছুমাবাদ গ্রাম বর্তমানে উত্তরে মহল্লা হাটাব এবং দক্ষিণে দেওয়ান বাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত।

উল্লেখিত 'দেওয়ান বাড়ির' তার চমকপ্রদ ধ্বংসাবশেষের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। খুব সম্ভবত: এটিই ছিল ঈসা খানের সুরক্ষিত বাসস্থান। মাছুমাবাদ গ্রামে প্রাপ্ত কতিপয় গুরত্বপূর্ণ প্রত্মতাত্বিক নিদর্শন প্রমাণ করে যে, সত্যিকার অর্থেই **কাতরাবো** ছিল একটি প্রতিরক্ষা, মূলত দূর্গ ও বাসস্থান। শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে এবং বাহাদুর খান বিলের জলাভূমি দ্বরা পরিবেষ্টিত লাল কাঁকরযুক্ত মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি উচু দূর্গে যার আয়তন প্রায় উত্তর দক্ষিণে ২৬৪০ হাত এবং পূর্ব পশ্চিমে ১৯৮০ হাত। **কাতরাবো** এর দূর্গনগর এবং বাসস্থানের মাঝে রয়েছে দেওয়ান দীঘি। আর দেওয়ান দীঘির উত্তর তীরে দন্ডায়মান রয়েছে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাধি সৌধ। এছাড়া দেওয়ান বাড়ি এলাকায় অপর একটি জলাশয় রয়েছে যা মিঠা 'পুস্করীনি' নামে পরিচিত।

দেওয়ান বাড়ি একটি বৃহদাকৃতির মৃন্ময় নির্মিত দূর্গ, যার পশ্চিম-দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে রয়েছে ৯'.৬" পুরু সুদৃঢ় ইষ্টক নির্মিত দেয়াল এবং কোণগুলিতে সংলগ্ন রয়েছে আট কোণাকৃতির বুরুজ। এই এলাকাটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১০০০ ফুট প্রশস্ত এবং উত্তর দক্ষিণে ১৩০০ দীর্ঘ। দূর্গ দেয়ালের বাইওে দক্ষিণে এবং পশ্চিমে বিস্তৃত জলাভূমি। দূর্গেও বিশাল স্তম্ভ যুক্ত তোরণ দ্বারটি পূর্বদিকে অবস্থিত। এই তোরণ দ্বারা একটি অসম কোন বিশিষ্ট আয়তাকার উচু ভূমিটিতে সম্ভবত: কর্মচারীদের বাসভবন ছিল। তোরণের দক্ষিণ দিকে সংলগ্ন পুরু দেয়ালে একটি উচু স্থান পরিলক্ষিত হয় যা একটি উচু বুরুজ ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই বুরুজ হতেই দূর্গের দ্বিতীয় দেয়াল শুরু। এই দেয়ালেটি পূর্বদিকে বিল এলাকা পর্যন্ত গিয়ে উত্তরদিকে ঘুরে দেওয়ান দীঘির দক্ষিণ তীরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বিতীয় দেয়ালটি পুনরায় পশ্চিমদিক ঘুরে দেওয়ান বাড়ির উত্তর পূর্বে কোণের বুরুজের যাথে যুক্ত হয়েছে। দেওয়ান বাড়ির উত্তরদিকস্থ চৌহদ্দীর বাইরে কাজী বাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় কিছু ইষ্টক নির্মিত দেয়ালের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এই এলাকাটি সম্ভবত দেওয়ানের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের আবাসস্থল ছিল। বর্তমানে মৃত্তিকা স্তরে হ্রাস প্রাপ্ত কতিপয় স্তম্ভ দেওয়ান বাড়ি। এলাকার উত্তর দিকস্থ চৌহদ্দীর সীমানা নির্দেশ করে। উল্লেখিত স্তম্ভসমুহের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্তম্ভ পরিলক্ষিত হয় যা ৬'.৬" বর্গাকার এবং ১০' উচু। এ স্তম্ভের অভ্যন্তরে পানি প্রবাহের উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি পোড়ামাটির নল উল্লাম্বভাবে গ্রহিত রয়েছে। দেওয়ান বাড়ির অভ্যন্ত রে ভাগে উল্লিখিত স্তম্ভ রেখার বাইরে দক্ষিণ দিকে ১৫০'×১৬০' আয়তন বিশিষ্ট একটি আয়তকার

Dhaka University Institutional Repository

পাকা মেঝে পরিলক্ষিত হয়। এই মেঝের পূর্ব দিকস্থ চৌহদ্দীর দেয়াল মিঠা পুস্করানির পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

মিঠা পুস্করীনি জলাশয়টি প্রায় বর্গাকার ও ২০′ গভীর এর চতুর্দিক ইষ্টক নির্মিত দেয়াল দ্বারা বাধাইকৃত। তবে এখানে ব্যবহৃত ইষ্টকসমূহ এক মাপের নয়। এর উত্তর পশ্চিম তীরে একটি ধাপ বিশিষ্ট পাকা মাঠ বিদ্যমান রয়েছে। এই জলাশয়টি মূলত: অধিবাসীদের খাবার পানি সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হত। প্রায় বিশ বছর আগে জলাশয়টির অভ্যন্তরে কতিপয় বিশালকার কাল স্তম্ভ ছিল বলে জানা যায়। তবে বর্তমানে তার কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। জলাশয়টির উত্তর পশ্চিম কোনে একসময় একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল বলে প্রবল জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে এবং মসজিদটি ইষ্টক নির্মিত খোদাইকৃত ফুলের নকশা দ্বারা অলংকৃত ছিল। জলাশয়ের উত্তর পশ্চিম তীরে ইষ্টক নির্মিত দেয়ালের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। জলাশায়ের উত্তর পারে, ফলবৃক্ষ ক্ষুদ্র ঝোপ এবং লম্বা খাস জন্মেছে। এখানে ব্যবহৃত ইষ্টক সমূহ ৮″×৬.৫″×১.৫″ ৭.৫″×৬″×১.২৫″ পরিমাণ বিশিষ্ট এবং কিছু কিছু রয়েছে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের।

উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের আবাস স্থলের পূর্বদিকে এবং প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব চৌহদ্দীর বাইরে একটি দ্বীপসহ বৃহৎ জলাশয় পরিলক্ষিত হয় যা দেওয়ান দীঘি নামে পরিচিত। সমগ্র এলাকাটি বিশ একরের ও বেশী স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এটি উত্তর দক্ষিণে ১৪৪০ ফুট দীর্ঘ এবং পূর্ব পশ্চিমে ৭২০ ফুট প্রশস্ত। জলাশয়টি গভীর এবং পানি পরিষ্কার। আয়তকারে রয়েছে প্রাচীন বৃহৎ বৃক্ষ সারি।

দেওয়ান দীঘির পশ্চিম তীরে একটি উচু মাটির ঢিবি পরিলক্ষিত হয় যেখানে অসংখ্য ইটের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এটি আয়তনে প্রায় ৫৬ ফুট দীর্ঘ এবং ৪৬ ফুট প্রশস্ত। সম্ভবত: এটি একটি সাধারণ হাম্মাম খানা ছিল এবং একটি পাকা ঘাটের উপর স্থাপিত। এই ঘাটকে রাজঘাট বলা হয়।

দেওয়ান দীঘির মাঝখানে একটি ছবি সদৃশ্য বর্গাকার দ্বীপ রয়েছে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ সাল পর্যন্ত এই দ্বীপটি দেওয়ান দীঘির পশ্চিম তীরের সাথে একটি মাটির সেতু দ্বারা সংযুক্ত ছিল। এক কালে রাজ ঘাট সংলগ্ন দেওয়ান বাড়ির উত্তর চৌহদ্দীতে একটি তোরণদ্বার ছিল।

দেওয়ান দীঘির তীরে একটি সমাধির ধ্বংসাবশেষ সহ আবেষ্টনীকৃত একটি করবস্থান রয়েছে। ধারণা করা যেতে পারে যে, কবর স্থানটি এবং দীঘির মাঝখানে স্থাপিত প্রশস্ত। এর পশ্চিম দিকে পড়ে থাকা পাকা স্তম্ভের ভগ্নাশেষ দৃষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থানে একটি মসজিদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং এটি উত্তর ভারতে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত মিহরাব এবং সমাধির

মাঝখানে কতিপয় ইমারতের ভিত আজও বিদ্যমান রয়েছে। সমাধির দক্ষিণ দিকে মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত তোরণ দ্বারটি সমগ্র এলাকাটিতে একটি ছবি সদৃশ দৃশ্যের অবতারণা করে। কিন্তু এই পাকা কবরটিতে কে শায়িত আছেন জানা যায় না। তবে ধারণা করা যেতে পারে যে, যেহেতু ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত **কাতরাবো** মাসুম খান কাবুলী দখলে ছিল, সেহেতু এই সমাধিটি সম্ভবত, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কখনও তিনি নিজের জন্য নির্মাণ করেছিলেন।[১৮]

অবশেষে বলা যায় এই দূর্গটি দুইবার আক্রমণের সম্মুখীন হয়। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ মোঘল সুবেদার মাহাবাজ খান গোলা নিক্ষেপ করে এই দূর্গ নগরীটিকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছিলেন। এরপর ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ ১২ মার্চ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে মোঘল সেনাপতি নির্জানাথান দূর্গটি ধ্বংস করে দেন।[১৯] ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য স্বাধীনতার অনেক প্রয়োজন, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঈসা খান অনুধাবন করেন দূর্গ নির্মাণের যার প্রমাণ **কাতরাবো** দূর্গ।

জঙ্গলবাড়ি দূর্গ

প্রাচীন ভাটিরাজ্যের রাজধানী নগরী জঙ্গলবাড়ি। কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার কাদির জঙ্গল (খোদি জঙ্গল) ইউনিয়নের জঙ্গলবাড়ি নামক গ্রামে এই দূর্গের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত।[২০]

জঙ্গলবাড়ির নামকরণ সম্পর্কে মোশাররফ হোসেন শাহজাহান তার গ্রন্থে বলেন, জঙ্গলবাড়ী একটি ঐতিহাসিক স্থান। একাদশ শতাব্দিতে আসামের দরঙ্গ জেলার প্রতাবগড় থেকে কোন কারণে বিতাড়িত হয়ে জঙ্গল বলাহুর নামে একজন রাজা এই স্থানে এসে ভাটিরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার নামে এই স্থানটি জঙ্গলবাড়ি নামকরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ের বিবর্তনে জঙ্গলবাড়ি নামকরণ করে। রাজা জোদ্দার লোঙ্গর এই স্থানটিতেই তার রাজ্যের রাজধানী স্থপন করেছিলেন। এরপর থেকে ষোড়শ শতাব্দির প্রথম পর্যন্ত জঙ্গলবাড়ীর ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।[২১]

একাদশ শতাব্দিতে জোদ্দার লোঙ্গর নামে একজন রাজা স্বাধীন ভাটিরাজ্য কায়েম করে রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন এই স্থানটিতে। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দ পর এই দূর্গটি ঈসা খান অধিকার করেন। তখন এই দূর্গের রক্ষ্যক ছিলেন সসংরাজ্যের প্রতিনিধি লক্ষ্মণ হাজরা।

---

[১৮] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত. পৃ. ৫১-৫৪

[১৯] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

[২০] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত. পৃ. ৫৯

[২১] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

জঙ্গলবাড়ি দূর্গটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। চর্তুদিকে খনন করা হয়েছিল পরিখা। কথিত আছে, সুসং আধিপতি রাজা জানাকিনাথ মল্লিক এই দূর্গটি সংস্কার ও মেরামত করেছিলেন। বাংলার হোসেন শাহী সালতানাতের সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ আল হোসাইনী রাজত্বের শেষ দিকে তারই নির্দেশে এ সংস্কার কার্য সম্পাদিত হয়েছিল। দূর্গের দক্ষিণদিকে প্রবাহিত নরসুন্দা নদীর তীরে মনোরম এই দূর্গটির অভ্যান্তরে ছিল অসংখ্য ইমারত। প্রচন্ড ভূমিকম্পে দূর্গটির সকল ইমারত ধ্বংস হয়ে যায়।

ঈসা খান যখন জঙ্গল বাড়ী দূর্গ অধিকার করেন তখন তিনি জঙ্গলবাড়িতে তার ভাটিরাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। দূর্গের আশপাশে গড়ে তোলেন অসংখ্য দালানকোঠা। ১৩২৬ বা সাল ভূমিকম্পে সব ধরনের স্থাপত্য নিদর্শন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

জঙ্গলবাড়ি দূর্গের ভূমি নকশা প্রায় আয়তকার। বর্তমানে পরিদৃষ্ট বিশাল প্রশস্ত পরিখাটি এর প্রমাণ বহন করেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বের সময় ঈসা খানের পুত্র মোঘলদের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে ইসলাম খানের হাতে পরাজিত হলে এবং মুসা খান বন্দি হলে তার পরিবারবর্গ জঙ্গলবাড়ি দূর্গে স্থানান্তরিত হয়। প্রায় ৪০ একর স্কুমিনিয়ে নির্মিত এই দূর্গটিতে পরিকল্পিত খনন কার্য করা হলে ইতিহাসের অনেক উপাদান খুজে পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা যায়।[২২]

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হাবিবা ও শাহনাজ হোসনে জাহান তাদের গ্রন্থে 'ঈসা খাঁ; সমকালীন ইতিহাসে' বলেন কথিত আছে যে, ষোড়শ শতাব্দির চতুর্থ পাদের প্রথম দিকে এগারসিন্ধুরের যুদ্ধে মোঘল শক্তির নিকট পরাজিত হয়ে ঈসা খানের জঙ্গলবাড়ির অধিপতি, লক্ষণসিংহ হাজারাকে বিতাড়িত করে এই দূর্গ অধিকার এবং সেখানে তার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ঈসা খান এর স্থানে বেশ কিছুদিন বসবাস করেন এবং তিনি এতদঞ্চলের দেওয়ান হিসাবে পরিচিত লাভ করেন। এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, ঈসা খান এ দূর্গের আদি নির্মাতা নন।

এমন কি লক্ষণ হাজরাকেও এদূর্গের আদি নির্মাতা বলে মনে হয় না। কেননা দূর্গ এলাকার বাহিরে ছড়িয়ে থাকা ইষ্টক ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ সমূহ প্রাক-মুসলিম যুগের বলে প্রতীয়মান হয়। খুব সম্ভব প্রাক মুসলিম যুগে এদূর্গটিকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একটি সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তবে এবিষয়টি কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ঈসা খান জঙ্গল বাড়ি দূর্গের অভ্যন্তরে অনেক ইমারতাদি নির্মাণ এবং সমগ্র দূর্গটিকে সংস্কার ও সুরক্ষিত করেন। মুসা খান সম্পূর্ণ রূপে মোঘলদের বর্শতা স্বীকার করলে ঈসা খানের বংশধরা সোনারগাঁও হতে জঙ্গল

[২২] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮

Dhaka University Institutional Repository

বাড়িতে তাদের পারার দূর্গকে স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তীতে তারাই জঙ্গলবাড়ি জমিদাররূপে পরিগণিত হন। মুসা খানের পুত্র হয়বত খানের সময় জঙ্গলবাড়ির জমিদারগণ ১১টি পরগনার কর্তৃত্ব করতেন। পরে হয়বত খান তার জমিদারীর অংশ (৭টি পরগনা) নিয়ে হয়বত নগরে বসতি স্থাপন করেন। এখনও ঈসা খানের অধঃস্তন পুরুষগণ জঙ্গলবাড়ি গ্রামে বসবাস করেন এবং তাদের বাড়িঘর দূর্গ এলাকাটি ভিতরেই অবস্থিত। জঙ্গলবাড়ির দূর্গের ভূমি নকশাঁ গোলাকার। প্রাচীরের কোন চিহ্ন বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। তবে দূর্গের দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরদিকে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা এবং পূর্বদিকে নরসুন্দা (স্থানীয় নরসুন্দা নদী বিদ্যমান)। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার নিমিত্তে তিন দিকে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা কেটে নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করে দূর্গটিকে দ্বীপাকারে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এখন দূর্গ এলাকটি একটি দ্বীপের ন্যায় সৃষ্ট হয়। শীতকালেও নৌকা ব্যতিরেকে দূর্গ এলাকায় যাওয়া হয় না। তিন দিকের পরিখাসমূহ পূর্বদিকের নদীর মত গভীর ও প্রশস্ত বলে সেগুলিকেও নদী বলে ভুল হয়। সমগ্র দূর্গ এলাকার আয়তনে আনুমানিক ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশ একর। বর্তমানে সেখানে কোন ইমারতের অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। জঙ্গলকীর্ণ দূর্গ এলাকাটি পরিষ্কার করে বর্তমানে সেখানে চাষাবাদ করা হয়। সমগ্র স্থানটিতে ছড়িয়ে রয়েছে।

দূর্গ এলাকার বাহির বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ইষ্টক ও মৃত পাত্রের ভগ্নাংশসমূহ এতদঞ্চলে একটি প্রাচীন নগরীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। সে সময় তৈজস পত্রের তেমন প্রচলন না থাকায় বিভিন্ন ধরনের মৃৎ পত্রের ব্যবহার ছিল অত্যধিক। সে সবেরই অজস্র ভগ্নাংশ এতদকলে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে। এখানে হলকদর খার কবরও রয়েছে।[২৩] আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জঙ্গলবাড়ি নামকরণ জোঙ্গল বলাহুর ব্যক্তির নাম থেকেই জঙ্গল বাড়ি ও ঈসা খান দূর্গটির নির্মাতা না হলেও তিনি এটি কয়েকজন সংস্কার করেন এবং সর্বশেষ তিনিও তার বংশধরগণ দখলে রাখেন বা বর্তমানে ও পরিলক্ষিত হয়। বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভোমত্ব রক্ষায় যেমন ভূমিকা রেখেছে ঈসা খানের দূর্গগুলি তেমনি স্বাধীনতা ও ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়নে জঙ্গলবাড়ির দূর্গের অবদান অপরিসীম।,

বোকাইনগর দূর্গ

মোমেনশাহী শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা বলুয়া নদীর তীরে বোকাইনগর নামক স্থানে এই দূর্গটি প্রথমে মৃন্ময় পদ্ধতিতে নির্মাণ করেন কামরূপ রাজ্যের অধীন সামন্ত রাজা বোকাই কোচ। তিনি সম্ভবত একাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে রাজত্ব করেন।

[২৩] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত. পৃ. ৫৭-৫৮

Dhaka University Institutional Repository

বোকাই রাজা এ স্থানে তার রাজধানী স্থাপন করেন এবং সমৃদ্ধশালী নগরীর পত্তন করেন। সুলতান সায়ফ উদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বের সময় (১৪৮৭-১৪৯০খ্রিস্টাব্দ) তার বিখ্যাত সেনাপতি মজলিশ খান হুমায়ুন এই দূর্গটি অধিকার করেন। আয়তকার আকৃতিতে নির্মিত এই দূর্গের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন ঈসা খান। এক সময় তিনি দুর্গটি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলার শেষ পাঠান বীর খাজা উসমান খান লোহানীকে দায়িত্ব দিলেন।

দূর্গের আয়তন পূর্বে-পশ্চিমে প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ। প্রস্থে প্রায় ১ কিলোমিটার। দূর্গটির তিনদিকে খানন করা হয়েছিল বিশাল পরিখা। দক্ষিণদিকের ইষ্টক নির্মিত দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থান সুউচ্চ চমৎকার প্রবেশ তোরণ। দেয়ালে ও প্রবেশ তোরণের কিছু অংশ আজও পরিলক্ষিত হয়। দূর্গের অভ্যন্তরে নির্মিত মসজিদ। বিগত শতাব্দির প্রথম দিকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে যায়। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ মোঘল বাহিনী কর্তৃক এই দূর্গের পতন ঘটে।[২৪]

হাবিবা খাতুন এ প্রসেঙ্গ বলেন কথিত আছে যে, পঞ্চদশ শতকে যখন প্রাচীন কামরূপ রাজ্য খন্ডিত হওয়া শুরু করে তখন বোকাই নামক জনৈক কোচ প্রধান দূর্গটি নির্মাণ করেন। ভিন্ন মতে, তিনি একদশ শতাব্দিতে এখানে রাজত্ব করতেন। তার নামানুসারেই এই স্থানের নামকরণ হয় বোকাইনগর। তবে তার পরবর্তী বংশধর সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অপর দিকে সুলতান সায়ফ উদ্দীন দ্বিতীয়: ফিরোজ শাহের আমলে (১৪৮৬-১৪৮৯খ্রিস্টাব্দ) তার প্রতিনিধি মজলিশ খা হুমায়ুন এখানে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন বলে প্রবল জনশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু এর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে বোকাইনগর কিল্লা হুমায়ুন শাহ এর অধীনস্ত হয় এবং তিনি স্বীয় পুত্র নূসরত শাহকে-এর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে খাজা ওসমান মোঘল বাহিনী কর্তৃক উড়িষ্যা হতে বিতাড়িত হয়ে পূর্ববাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করলে ঈসা খান তাকে বোকাইনগর এলাকায় একটি জমিদারী দান করেন। নতুন করে সেখানে তার শক্তিশালী ঘাটি স্থাপন করেন। এ স্থানে তিনি স্বপরিবারে বসবাস করেন। এই বোকাইনগর দূর্গ হতে উসমান খান মোঘলদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে তার অপর দুটো দূর্গ হাসানপুর এবং এগারসিন্ধুর হতেও তিনি মোঘলদের বিরোধিতা করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ মোঘল সুবেদার ইসলাম খান কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ওসমান খান বোকাইনগর ত্যাগ করে শ্রীহটের আফগান শাসক বায়জিদ কররানীর আশ্রয়গ্রহণ করলে একই সনের নভেম্বর মাসে বোকাইনগর দূর্গ মোঘদের অধিকারভুক্ত হয়।

---

[২৪] মির্জা নাথান, বাহারিস্তান-ই-গায়বী, খালেতদাদ চৌধুরী অনুদিত বাংলা একাডেমী-১৯৭৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে দক্ষিণদিকে পরিখার কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয়নি। তবে দক্ষিণ প্রাচীরের কিছুঅংশ এবং দক্ষিণ বুরুজ ও ধ্বংসাবশেষ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ দূর্গটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং দূর্গ এলাকায় সৃষ্ট হয়েছে বেশ কিছু গ্রাম। উক্ত এলাকায় সর্বত্র অসংখ্য ইটের ভগ্নাংশ পরিলক্ষিত হয়। দূর্গের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে ছিল খাজা উসমানের বসত বাড়ি। কিন্তু এস্থানে কোন ইমারতের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পরিলক্ষিত না হওয়ায় ধারণা করা যেতে পারে না যে, সম্ভবত এখানে প্রাসাদ জাতীয় কোন ইমারত নির্মাণ করা হয়নি। এর নিকট রয়েছে একটি মজে যাওয়া পুকুর।[২৫] বোকাইনগর দূর্গ ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাংলার স্বাধীনতার পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতি রক্ষা করে আজও দাড়িঁয়ে আছে যা ঈসা খানের অমর কৃতি।

কদমরসুল দূর্গ

নারায়ণগঞ্জ শহরের বিপরীত দিকে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে নবীগঞ্জে কদম রসুল নামে একটি প্রাচীন স্থান রয়েছে। এই স্থানেই ঈসা খান কর্তৃক নির্মিত কদম রসুল দূর্গটি অন্যতম। দূর্গটি কত সনে তিনি নির্মাণ করেন তা অবশ্য জানা যায় না। তবে দূর্গটি যে ঈসা খানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দূর্গ ছিল ইতিহাসে এর সত্যতা পাওয়া যায়। দূর্গের আয়তন অথবা পরিমাণ সম্পর্কে এখন আর কোন ধারণা করা যায় না। বর্তমানে একটি মাত্র টিলার উপর মসজিদ মাজার ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র পা মুবারকের চাপযুক্ত প্রস্তর খন্ড সংরক্ষিত হচ্ছে। সম্ভবত এই টিলাটি দূর্গের অভ্যন্তরের একটি অংশ।[২৬]

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হাবিবা ও শাহনাজ হোসনে জাহান তাদের গ্রন্থ 'ঈসা খাঁ; সমকালীন ইতিহাস' আলোচনা করেছেন সঠিক তথ্য জানতে তা সাহায্য করবে বলে মনে হয়। মির্যা নাথান-এর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, নদীর তীরে একটি 'দমদমা' অর্থাৎ দূর্গ বা উচু ভূমি ছিল তার নাম রসুলপুর বা কদমরসুল। মির্যা নাথান আরও উল্লেখ করেছেন যে, ঈসা খানের সেনাপতি মাসুম খান কাবুলী বণিকগণ কর্তৃক আরবদেশ হতে আনীত নবীজির পদচিহ্ন রক্ষিত একটি প্রস্তর খন্ড বহুমূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করে এই স্থানে স্থাপন করেন।

সৈয়দ মোঃ তাইউফুর এর মতে, নামকরণ সম্পর্কে বলেন, মাসুম খান কাবুলী এই প্রস্তর খন্ডটি ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লিখিত প্রস্তর খন্ডের কারণেই সম্ভবত এ স্থানের নামকরণ হয় কদমরসুল। প্রস্তরখণ্ডটি আজও একটি উচু টিবির উপরে বর্গাকারে নির্মিত একতলা

[২৫] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত. পৃ. ৬০-৬১

[২৬] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯

Dhaka University Institutional Repository

ইমারতে রক্ষিত আছে। এই ইমারতটি এবং এর সম্মুখস্ত ছোট বারান্দাটি ঢাকার জমিদার গোলামনবী কর্তৃক ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে এটিতে বহুবার সংস্কার হওয়ায় এর আদিরূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ এখন অসম্ভব।

এই কদমরসুল নামক স্থানটিতে ঈসা খানের দূর্গ ছিল বলে ইতিহাস উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মৃত্যুর পর মুসা খান ঐ দূর্গের ব্যবহার করেন। মুসা খানের সাথে মোঘল সুবেদার ইসলাম খানের যুদ্ধের সময় কদমরসুল দূর্গের দায়িত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ খান। উল্লিখিত যোদ্ধ মোঘল সেনাপতি মির্যা নাথান কদমরসুল গমন প্রসঙ্গে বাহরিস্তান-ই-গায়েবীতে বর্ণিত একটিঅংশ কদমরসুল দূর্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। অংশটি নিম্নরূপ—

সংবাদবাহী খবর নিয়ে এলো যে মির্জা নাথানের সাহায্যে কুড়িটি নৌকা পাঠাবার সময়ই ইহতিমাম খা দোলাই নদী থেকে বের হয়ে লক্ষ্যানদী দিয়ে তার সমস্ত নৌবহর নিয়ে আবদুল্লাহ খার বিরুদ্ধে কদমরসুল থানা অভিমুখে রওনা হয়ে গোছেন.. .. ...। অতপর তিনি (মির্জা নাথান) কদমরসুল যাত্রা করেন এবং ইহতেমাম খার নিকট এক স্থানে মিলিত হন। কদমরসুলের কামান সজ্জিত উচ্চ স্থানের (দমদমা) উপর দাঁড়িয়ে নাথান দেখতে পান যে, ইহতিমাম খার অনুমতি ছাড়াই তার নৌবহর শত্রুদের পাশ্চাদ্ধাবন করছে। একটি বিষয় খুব সহজেই বলা যায়, যেহেতু কদমরসুল দূর্গটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত তাই তার সঠিক গঠন ও প্রকৃতি ও ভূমি নকশা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়।

তাই অনুমান করে বলা হয় দূর্গটি একটি মৃন্ময় নির্মিত দূর্গ ছিল। দূর্গের উচু মাটি থেকে অস্তিত্ব ধারণা করা হয়।[২৭] কদমরসুল দূগটি যেমন ঈসা খানের সৌর্যবীর্জের চিহ্ন তেমনী এ দূর্গে নবীজীর (সা.)-এর পদচিহ্ন রক্ষিত একটি প্রস্তুত খন্ড রক্ষিত আছে। যে কারণে বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়নের পাশপাশি-এর মাধ্যমে ঈসা খান বীরত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এগারসিন্ধুর দূর্গ

কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্গত এগারসিন্ধুর গ্রামে এই দূর্গ অবস্থিত। একদা ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী বানার শীতলক্ষ্যা আড়িয়াল খাঁ, গিয়ারাসুন্দা প্রভৃতি নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল এগারসিন্ধুর দূর্গ। এর নিকটেই ছিল ব্রহ্মপুত্র হতে লক্ষ্যা নদীর উৎপত্তি স্থল। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্বতীরে যে স্থানে থেকে বানার নদী পূর্বদিকে চলে গেছে ঠিক সেখানেই

[২৭] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত. পৃ. ৫৫-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থিত ছিল এগারসিন্ধুর দূর্গ। এগারসিন্ধুর অর্থ এগারনদীর মিলিত স্থান। প্রকৃত পক্ষে, এখানে অনেক নদ-নদী মিলিত হয়েছে বলেই হয়ত এস্থানের এরূপ নাককরণ করা হয়েছে।[২৮]

এ প্রসঙ্গে মোশাররফ হোসেন বলেন, ঈসা খাঁ; মসনদ-ই-আলার বিখ্যাত এগারসিন্ধুর দূর্গটি বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্ধুর গ্রামে অবস্থিত। এগারসিন্দুরের পূর্ব নাম ছিল "গঞ্জে হাবেস্ক" আমাদের ধারণা মতে ইবনে বতুতার বাংলাদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্তে সিলেট থেকে সোনাগাঁওয়ে আসার পথে যে, "হাবেস্ক" শহরের কথা লিখেছেন সেই হাবেস্ক শহরটি এগারসিন্ধুকেই সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

আরও বলেন, এগারসিন্ধুর দূর্গটি প্রথম নির্মিত হয়েছিল কামরূপ সামন্ত রাজাদের আমলে। ব্রহ্মপুত্র নদের তীর বাঁকে অবস্থিত এই স্থানটি সপ্তম শতাব্দির ও পূর্ব থেকে কামরূপ রাজ্যে অধীন ছিল এবং এগারসিন্ধুর ছিল কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণ সীমা। খ্রিষ্টপূর্ব পরবর্তীকালে এই এগারসিন্ধুরের দক্ষিণে স্বাধীন বহু জনপদের অবস্থানের কারণেই কামরূপ রাজারা এগারসিন্ধুকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে সুরক্ষিত দূর্গ ও দূর্গ নগরী হিসেবে গড়ে তোলেন।

দূর্গটি সম্পর্কে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় বলা হয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদের তীক্ষ বাঁকে অবস্থিত এগারসিন্ধুর দূর্গের পাদদেশে দাঁড়িয়ে দেখতে পাবে এগারসিন্ধুরের জাঁকজমক ও আভিজাত্য। এগারসিন্ধুর দূর্গটি খুবই সুরক্ষিত। বিশেষ করে নদী যখন বর্ষকালে কানায় কানায় ভরে যেত তখন যে কোন দিক থেকে এগারসিন্ধুরের দূর্গে পৌঁছা খুবই দুর্ভেদ্য ছিল। এগারসিন্ধুর দূর্গটি সম্ভবত প্রথমে মৃন্ময় পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল। উত্তরদিকে বিশাল পরিখা পশ্চিম দক্ষিণদিকে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ আর পূর্বদিকে লালমাটির গেড়িক উচ্চ ভূমি অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবেই এই দূর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল আশ্চর্যজনক ও চমৎকার। ঈসা খান এই দূর্গটির সংস্কার সাধন করে সুরক্ষিত দূর্গ হিসেবে গড়ে তোলেন। দূর্গের সুউচ্চ টাওয়ারগুলো তিনি নির্মাণ করেন। দূর্গের অভ্যন্তরে ঈসা খানের আমলের কোন স্থাপত্য নির্দর্শন আজ আর অবশিষ্ট নেই। তবে পরিকল্পিত উপায়ে খনন কার্য করা হলে দূর্গটি সম্পর্কে অনেক কিছুই ধারণা করা সম্ভব হবে।

দূর্গের প্রধান প্রবেশ তোরণটি কোন দিকে ছিল তা আজ আর অনুমান করা যায় না। তবে অনেকের মতে বর্তমানে এগারসিন্ধুর ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন যে উচ্চ মাটির টিলাটি বিদ্যমান সম্ভবত এখানেই ছিল প্রবেশ তোরণ। যার ধ্বংসস্তপটি পরিণত হয়েছে একটি মাটির টিলায়। বর্তমানে এগারসিন্ধুর দূর্গের অভ্যন্তরে সম্রাট শাহজাহানের আমলের দু'টি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, একটি

---

[২৮] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত. পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন কবরস্থান দুটি মাযার পরিদৃষ্ট হয়। সমগ্র দূর্গ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছোট আকারের ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দূর্গের প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ বহন করে।[২৯]

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান বলেন, আহমদ হাসান দানী বলেন, ঈসা খান এগারসিন্ধুর একটি মাটির দূর্গ নির্মাণ করেন। স্থানীয় জন প্রবাদ মতে, ষোড়শ শতকে বেবুইদ নামে জনৈক কোচ প্রধান এখানে একটি দূর্গ নির্মাণ পূর্বক তার রাজধানী স্থাপন করেন। দূর্গ অভ্যন্তরে একটি বৃহদাকৃতির প্রাচীর জলাশয় "বেবুদ্ধা" রাজার দীঘি বলে পরিচিত। কথিত আছে যে, দীঘির কাছেই পানকি ছিল রাজার বাড়ি। উত্তর দক্ষিণে লম্বা এই দীঘিটির পানি বেশ স্বচ্ছ। এই বেবুদ্দা নাম হতে প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ ধমালম্বী কোন নৃপতির নিবাস বা বিহার মন্দিরবাড়ির অবস্থান ছিল এখানে। ঈসা খান কোচ প্রধান বেবুইদকে পরাজিত করে এই দূর্গ দখল করেন এবং এ স্থানে তার শক্তিশালী ঘাটি স্থাপন করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ঈসা খান এখানে কোন নতুন দূর্গ নির্মাণ করেননি, বরং তিনি প্রাচীন দূর্গটি সংস্কার ও সুরক্ষিত করেন মাত্র। মোঘল সম্রাট আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহ ঈসা খান নেতৃত্বধীন মোঘল বিরোধী জোট দমন করার উদ্দেশ্য ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দ এগারসিন্ধুর দূর্গের দিকে অগ্রসর হন এবং শেষপর্যন্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে প্রত্যাবরণ করেন। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে অহম রাজাও দূর্গটি আক্রমণ করে দখল করেন। পরে বাংলার মোঘল সুবেদার ইসলাম খান অহম ঘাটিটি ধুলিস্যাৎ করে দেন। উল্লিখিত আক্রমণের পর যা কিছু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল তার সকলই ১৮৯৭ সালের প্রলয়ংকারী ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হয়ে সমগ্র এলাকাটি চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। এখনকি দূর্গ প্রাচীর কেটে এবং পরিখাগুলি ভর্তি করে যে স্থানে ধান ক্ষেত সৃষ্টি করা হয়েছে। দূর্গ এলাকা বলে চিহ্নিত স্থানটি দৃষ্টি প্রতীয়মান হয় যে, দূর্গের পশ্চিম দিকে প্রশস্ত পরিখা এবং উত্তর ও পূর্ব দিকে শঙ্খ নদীর বাঁক দ্বারা সৃষ্ট স্বাভাবিক পরিখা ছিল। বর্তমানে এটি শঙ্খ নদীর বিল নামে পরিচিত। দূর্গের দক্ষিণ দিকে ছিল বিশালাকার ব্রহ্মপুত্র শীতলক্ষ্যা নদী। নদীর অপরতীরে ঢাকা জেলার শুরু। সমগ্র দূর্গ এলাকাটি যে, বিশালাকারের ছিল তা সহজেই বোধগম্য। দূর্গের চর্তুদিকে নির্মিত মাটির দেয়াল প্রায় ৬০'.০" প্রশস্ত ছিল। দূর্গের ঢিবির উপরে পুরাতন কবর আছে।

সমগ্র দূর্গ এলাকায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এ দূর্গের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। মাঝে মধ্যে দু এক খণ্ড পাথরও পরিলক্ষিত হয়। এগারসিন্ধুর দূর্গের ধ্বংসাবশেষের হতে প্রাপ্ত প্রাচীন যুগের পাথরসমূহের বেশিরভাগই স্থানীয় শাহ মোহাম্মদ মসজিদের অঙ্গনে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

[২৯] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২০

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত পাথরসমূহ দৃষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খুব সম্ভব, এ স্থানে প্রাক মুসলিম যুগে মন্দিরাদির অস্তিত্ব ছিল। এগারসিন্ধুর দূর্গের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত ইটসমূহের বেশির ভাগই ৭"×৭"×১.৫" পরিমাণ বিশিষ্ট যা অন্যান্য সুলতানী আমলের স্থাপত্যে ব্যবহৃত ইটের অনুরূপ। বর্তমানে এ এলাকায় সাদী মসজিদ (১৬৫২খ্রিস্টাব্দ) শাহ মোহাম্মদ মসজিদ (১৬৮০খ্রিস্টাব্দ) এবং বিভিন্ন আকৃতির একাধিক টিবি ও পাকা কবর এখনও বিদ্যমান।[৩০]

বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা রক্ষায় এ অঞ্চলে এগারসিন্দুর দূর্গ অনেক অবদান রেখেছে। এ জন্য প্রেরণা পুরুষ বীরে আলা ঈসা খানের অবদান সবার আগে।

সোনাকান্দা দূর্গ

তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা গ্রন্থে মুন্সী রহমান আলী তায়েশ বলেছেন, সোনাকান্দা দূর্গ নির্মাণ করেন মীর জুমলা।[৩১] তবে অনেকের মতে, এ দূর্গ ঈসা খানের সময় নির্মিত হয়েছিল। পরে মীর জমলা দূর্গটি পুণ: নির্মাণ করেন। নারায়ণগঞ্জ শহরের বিপরীত দিকে বান্দর নামক স্থানে দূর্গটি অবস্থিত। ঈসা খানের সময় এই দূর্গের স্থাপত্যের ধরণ কেমন ছিল এ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কথিত আছে, ঈসা খান স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করে প্রথমে এই সোনাকান্দা দূর্গে এনে রেখেছিলেন এবং এই দূর্গে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। ঈসা খানের পুত্র মুত খানের রাজত্বের সময় মোঘলদের হাতে এই দূর্গের পতন ঘটে।[৩২]

শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে কদমরসুল থেকে প্রায় আড়াই/তিন মাইল দক্ষিণে বন্দর নামক স্থানে সোনাকান্দা দূর্গ অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জ বিপরীত দিকে এর অবস্থান। একদা শীতলক্ষ্যা ধলেশ্বরী ও ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল এই সোনাকান্দা দূর্গ। বর্তমানে ধলেশ্বরী নদী অনেক দক্ষিণে মৃতপ্রায় ব্রহ্মপুত্র অনেক পূর্বে এবং শীতলক্ষ্যা অনেক পশ্চিমে সরে গেছে।

সোনাকান্দা দূর্গের নামকরণ সম্পর্কে বহু কাহিনী জনমনে প্রচলিত রয়েছে। একটি কাহিনী মতে, ঈসা খান কেদাররায়ের বিধবা কন্যা সোনাবিবিকে জোর করে বিয়ে করে এ দূর্গে রাখার সময় তিনি কেঁদে ছিলেন বলে এ দূর্গের নাম হয় সোনাকান্দা। অন্য আর একটি কাহিনী মতে, সোনাবিবি

---

[৩০] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮

[৩১] মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, তাওরাবিখ-ই-ঢাকা, ডঃ আনম শরফুদ্দিন অনুদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-১৯৮৫ ,পৃ. ২১৭

[৩২] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

ঈসা খানের অনুপস্থিতিতে মোঘল আক্রমণ থেকে একাকী দূর্গ রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে কেঁদেছিলেন বলে এ দূর্গের নামকরণ হয় সোনাকান্দা। উল্লিখিত কাহিনীসমূহ একেবারেই ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এগুলো হতে অন্ততঃ এটুকু প্রতীয়মান হয় যে, ঈসা খানের সময় এ স্থানে একটি দূর্গ ছিল। আবার ইসলাম খানের সাথে মুসা খানের যুদ্ধের সময় মুসা খান যে বন্দর দূর্গের অবস্থান নিয়েছিলেন তা মির্যা নাথানকৃত বাহরিস্তান-ই-গায়েবী হতে জানা যায়। বার ভুঁইয়াদের পতন হলে পূর্ব নির্মিত সোনাকান্দা দূর্গ মোঘলগণ কর্তৃক অবিকৃত ও পুনর্নির্মাণ হয়। পরবর্তীতে মীর জুমলা কর্তৃক এ দূর্গটি সংস্কার হয়। আর একস্থানেই দন্ডায়মান ইষ্টক নির্মিত আয়তকার নকশা সম্বলিত সোনাকান্দা দূর্গের স্থাপত্য বিশিষ্ট মোঘল স্থাপত্য রীতির ছাপ লক্ষ্যণীয়।

বার ভুইয়াদের সময় নির্মিত দূর্গটির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে বার ভুঁইয়াদের বিশেষ করে ঈসা খান কর্তৃক অপর সকল দূর্গের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে ধারণা করা যায় যে, ঈসা খান কর্তৃক নির্মিত সোনাকান্দা দূর্গের নির্মাণ উপাদান ছিল সম্ভবত মৃন্ময়।[৩৩] ইসলামী সংস্কৃতির উন্নতির জন্য ঈসা খানের অবদান অপরিসীম। এক্ষেত্রে সোনাকান্দা দূর্গের অবদান স্বীকৃত কেননা, ঈসা খান এ দূর্গ ব্যবহার করেছেন।

খিজিরপুর বা হাজীগঞ্জ দূর্গ

নারায়ণগঞ্জ শহরের উত্তরদিকে অবস্থিত এই বিখ্যাত দূর্গটিকে খিজিরপুরের দূর্গ বলে অভিহিত করা হয়। ঈসা খানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এ হাজিগঞ্জ দূর্গ। ঈসা খান এ স্থানে তার রাজধানী স্থাপন করেন এবং এ দূর্গের অভ্যন্তরে তার প্রাসাদ বাটি ছিল। স্বরূপচন্দ্র রায় বলেন, ঈসা খান রাজধানী খিজিরপুরে রাজত্বের বিচারালয়, বহুতল অট্টালিকা ও সুরম্য মসজিদ নির্মাণ করেন। বৃটেনের রাণী এলিজাবেথের দূত রালফ ফীচ বলেন, Isa Khan Built a Fort at khijirpur.[34]

দূর্গের ভূমি নকশাঁ অনুযায়ী ষষ্ঠভুজাকৃতির দূর্গ বলে সাব্যস্ত করা যায়। যদিও পূর্বদক্ষিণ দিকে বেষ্টনী দেয়ালসহ কিছু অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তথাপি বাস্তব পর্যবেক্ষণে মূলভূমি নকশাঁটির একক সম্যক ধারণা করা যায়। সম্পূর্ণ ইটের তৈরী হাজিগঞ্জ দূর্গের প্রবেশ তোরণটি উত্তর দিকে অবস্থিত। প্রবেশ তোরণসহ দূর্গটির সম্মুখ বাহুর পরিমাণ ৪৪.০৪ মিটার এবং দক্ষিণ বাহুটির একই পরিমান।

---

[৩৩] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

[৩৪] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

দূর্গের অন্যান্য বাহুর কিছুটা কমবেশী ৩৬.১০ মিটার হবে।[৩৫] ডঃ এম আবদুল কাদের ঈসা খানকে খিজিরপুরের ঈসা খান হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আকবরের সময় খিজিরপুর দূর্গের যেমন উল্লেখ পাওয়া যায় ঠিক তেমনি মুসা খানের দূর্গমালার মধ্যেও একটি খিজিরপুর দূর্গ হিসেবে চিহ্নিত। এ প্রসঙ্গে বাহরিস্তান-ই-গায়েবীর একটি বর্ণনা অত্যন্ত তৎপর্যর্পূণ। যেমন-

রাত প্রভাতের চার ঘড়ি পূর্বে তাঁরা লক্ষ্যা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন। সকাল বেলা মির্জা নাথান খিজিরপুর আর শেখ কামাল কুমার সরে পৌছেন। দোলাই এবং লক্ষ্যা নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত খিজিরপুরে মোহনায় মোহাম্মদ খান পনিকে পাঁচশ অশ্বারোহীসহ নিয়োজিত করেন।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, বার ভূঁইয়াদের শাসনকালে একটি উল্লেখযোগ্য দূর্গ ছিল খিজিপুর। হাজীগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত বলে এ দূর্গ টিকে বর্তমানে হাজীগঞ্জ দূর্গ নামেও অভিহিত করা হয়। বার ভূঁইয়াদের পতনের পর এই দূর্গটি মোঘল অধিকারে আসে এবং মোঘলগণ ঈসা খান কর্তৃক নির্মিত দূর্গটি পুনর্নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে মীর জুমলা এই দূর্গটিকে সংস্কার ও নবায়নের মাধ্যমে অধিকতর শক্তিশালী একটি দূর্গে পরিণত করেন। হাজীগঞ্জ দূর্গের এই পুনর্নির্মিত রূপ আজও হাজীগঞ্জ এলাকায় দন্ডায়মান।[৩৬] হাজীগঞ্জ এলাকায় খিজিরপুর নামে দূর্গটি ইসলামী সংস্কৃতি রক্ষায় হাজীগঞ্জের অবদান অপরিসীম।

কিল্লা তাজপুর

বোকাইনগর দূর্গ হতে প্রায় ছয় মাইল উত্তর পূর্ব বলুয়া নদী যেখানে সুবিয়া নামে পরিচিত সে খানের কিল্লা তাজপুর অবস্থিত। তাজপুর দূর্গকে কবে নির্মাণ করেন সে সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পোওয়া যায় না। স্থানীয় জনশ্রুতি মূলে জানা যায় যে, সুলতান সায়ফ-উদ-দীন দ্বিতীয় ফিরোজ শাহর আমলে ১৪৮৬-৮৯ খ্রিস্টাব্দ তার সেনাপতি মজলিশ খান হুমায়ুন কামরূপ রাজের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা এবং তার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এ দূর্গটি নির্মাণ করেন। তাজপুর দূর্গ কিছুকাল ওসমান খানের মিত্র নাসির খান এবং দরিয়া খানের অধীনে ছিল বলে জানা যায়। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ তারা দুজন মোঘল বাহিনীতে যোগ দেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ ওসমান খান যখন মোঘল বাহিনী কর্তৃক বোকাইনগর হতে বিড়াড়িত হন তখন তিনি কিল্লা তাজপুর হয়ে শ্রীইটের দিকে পলায়ন করেন। অর্থাৎ সে সময় কিছুদিন এই তাজপুর দূর্গ ওসমান খানের অধীনে ছিল। ওসমান খানের পতনের পর দূর্গটি মোঘলদের অধিকারে আসে এবং সেখানে মোঘলদের শাসন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তাজপুর দূর্গ

---

[৩৫] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

[৩৬] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং প্রায় সমগ্র এলাকা চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। পোদ্দার বাড়ি হসেবে পরিচিত এটি তুলনামূলকভাবে আধুনিক ইষ্টক নির্মিত ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ব্যতিরেকে দূর্গ অভ্যন্তরে কোন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট নেই।

মৃন্ময় নির্মিত এই দূর্গটি ছিল প্রায় ১ মাইল প্রশস্ত। আ,ক.ম জাকারিয়া অবশ্য ভিন্ন পরিমাণ দিয়েছেন। তার মতে, এর আয়তন ছিল প্রায় ২৪০০×১২০০০ ফুট। দূর্গের চতুর্দিকে ছিল মৃন্ময় নির্মিত উচু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং প্রাচীরের স্থানে অর্ধবৃত্তাকার বুরুজ সন্নিবিষ্ট ছিল। আর প্রাচীরের বাইরে ছিল প্রশস্ত ও গভীর পরিখা। স্থানে স্থানে মাটির প্রাচীরের কিছু কিছু অংশ কোন রকমে টিকে থাকতে দেখা যায়। সমগ্র দূর্গ এলাকাটি মৃত্তিকার গর্ভে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ইটের টুকরাও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পরিদৃষ্ট হয়। বুটাকোনা বাজারের নিকটে দক্ষিণ পূর্বকোণের দূর্গ প্রাচীর ব্রহ্মপুত্র নদের একটি ক্ষুদ্র শাখা দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে একটি স্থাপত্যিক কাঠামোর কিছুঅংশ উন্মোচিত হয়। উন্মোচিত অংশটির ভিত্তিতে ৩০'.০" প্রশস্ত এবং ভিত্তি হতে ক্রমহ্রাস মান আকারে প্রায় ১৫'.০" উচু অবস্থায় বিদ্যমান।[৩৭] কিল্লা তাজপুর বাংলার ইতিহাসে অন্যতম নিদর্শন। বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতি রক্ষাসহ স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক ভূমিকা পালন করেছে।

ভূষণা দূর্গ

ফরিদপুর জেলার মধুখালি থানা সদর দপ্তর হতে তিন মাইল এবং ফরিদপুর জেলা শহর হতে প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নোওয়াপাড়া ইউনিয়নের কিল্লাবাড়ি নাকম গ্রামে ভূষণা দূর্গ অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এ এলাকাটি ভূষণা কিল্লাবাড়ি নামে পরিচিত।

প্রাচীনকালে ভূষণা একটি বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল। রেনেল কর্তৃক প্রদত্ত মানচিত্রানুযায়ী ফরিদপুর ও যশোর জেলার কিছুটা অংশ নিয়ে সেকালে ভূষণা নগর বিস্তৃত ছিল বলা যায়। মধুমতি ও বারাসিয়া এই দুই নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল এই ভূষণা দূর্গ। 'দ্বিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক একখানি ভৌগোলিক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, জনৈক ক্ষত্রীয় রাজা ধেনুকর্ণর এর পুত্র কণ্ঠহার এর উপাধি ছিল বঙ্গভূষণা। তিনি যশোরের উত্তর ভাগ অধিকার করে এর নাম রাখেন ভূষণা। পাঠান শাসনামলে ভূষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। সুলতান নূসরত শাহ এর আমলে বাংলায় যে সতেরটি টাকাশাল ছিল ভূষণা তাদের অন্যতম। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তোডরমল কর্তৃক বাংলাদেশে যে জরিপ কার্য

[৩৭] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদিত হয়, সেখানে ভূষণা ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ভূষণা দূর্গ সম্পর্কে আকবরনামায় বর্ণিত উক্তিটি নিম্নরূপ।

`It (Bhushna) is a strong for and a paoulous country is connceted with it".

সম্রাট আকবরের জনৈক সেনাধ্যক্ষ আকবরমহলের যুদ্ধের পর ফতেহাবাদ সরকার দখল করে সেখানকার ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ এ মুরাদ খানের মৃত্যু হলে মুকুন্দরাম নামক জনৈক ভুস্বামী মুরাদ খানের পুত্রদের বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক হত্যা করে নিজেকে ফতেহাবাদ ও ভূষণার শাসনকর্তা ঘোষণা করেন। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ মানসিংহ ওসমানসহ কতিপয় আফগান নেতাকে ফরিদপুর অঞ্চলে জায়গীর প্রদান বাতিল করলে তারা লুন্টন করতে করতে ভূষণার দিকে ধাবিত হয়। ভূষণা তখন চাঁদরায় ও কেদাররায়ের দখলে ছিল। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ ১১ ফেব্রুয়ারী আফগানদের হস্তগত হয়। কিন্তু বার ভুঁইয়ার প্রধান ঈসা খানের মধ্যস্থতায় আফগানগণ কেদাররায়ের হস্তে ভূষণা সোপর্দ করতে বাধ্য হয়। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ ১ এপ্রিল মানসিংহের পুত্র হিম্মত সিংহ ভূষণা জয় করেন। কিন্তু খুব বেশিদিন মোঘল অধিকারে রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ মানসিংহের অপর পুত্র দুর্জনসিংহের অধীনস্থ বাহিনী ভূষণার দূর্গ অবরোধ করেন। একই সনের ২০ জুন দূর্গাভ্যন্তরে একটি কামান ফেটে যাওয়ার দরুন সোলাইমান খান ও তার সৈন্য নিহত হয়। আর কেদাররায় উপায়ন্তর না দেখে ঈসা খানের আশ্রয়গ্রহণ করেন। ফলে ভূষণা দূর্গ পুনরায় মোঘলদের অধীনস্থ হয়। পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলী খানের সময়ে সমগ্র বাংলা যে তেরটি সার্কেল বিভক্ত হয়। ভূষণা তাদের অন্যতম। বৃটিশ শাসনামলে ভূষণা একটি থানা হিসেবে পরিচিত ছিল। পাকিস্তান শাসনামলে পুলিশ সদরদপ্তর বর্তমান বোয়ালমারীতে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে ভূষণা একটি নগন্য গ্রাম মাত্র।

ভূষণা দূর্গ আয়তাকার নকশায় নির্মিত এবং উত্তর দক্ষিণে ১৩০০ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ১১৭০ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ বাহুর মধ্যস্থল বরাবর ৫০ ফুট প্রশস্ত একটি রাস্তার মাধ্যমে দূর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। দূর্গের চতুস্পর্শ মাটির উচু দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত ছিল। দূর্গকে সুরক্ষিত করবার নির্মিত্তে দেয়ালের অভ্যন্তরে ও বহির্দিকে প্রায় ৮০ ফুট চওড়া গভীর পরিখা খনন করা হয়েছিল। প্রাচীন দূর্গের ভগ্নাংবশেষ, দেয়াল ও পরিখার নিদর্শন আজও দৃষ্ট হয়। ইষ্টক নির্মিত কিছু কিছু গৃহও চোখে পড়ে। দূর্গের উত্তর দক্ষিণে ও পশ্চিম দেয়ালে আজও নিকটস্থ ভূমি হতে প্রায় ১৫'.০" উচু এবং ৫০'.০" এর ও বেশি প্রশস্ত অবস্থায় বিদ্যমান।

সমগ্র এলাকা বর্তমানে চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। দূর্গের পূর্ব দেয়ালে ও ভূমির সমতল করে চাষাবাদ করা হয়। চাষাবাদের ফলে উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের অভ্যন্তরীণ পারীখাসমূহ প্রায় অসপষ্ট প্রতীয়মান হয়। পূর্ব দেয়ালের অভ্যন্তরভাগে দেয়ালের সাথে সংলগ্ন একটি পুকুর রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, সম্ভবতঃ পরিখাটিকেই পরবর্তীকালে পুকুরে পরিণত করা হয়েছিল। তবে উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে দূর্গ দেয়ালের বর্হিদিকের পরিখাসমূহ এখনও সুস্পষ্ট। দূর্গের একমাত্র তোরণ দ্বারের পশ্চিম পার্শ্বে ৪০'.০"×৪০'.০" পরিমাপ বিশিষ্ট একটি টিবি রয়েছে। যার উপর রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন ইটের ভগ্নাংশ। এটি দূর্গ রক্ষী অথবা অপর কোন ব্যক্তির আবাসিক ইমারত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা বলা যায় না।

দূর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ পথে প্রায় ১০০'.০" পূর্বে একটি প্রাচীন মসজিদের ভিতরে সম্প্রতি একটি টিনের মসজিদ নির্মিত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব যাদুঘর অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক মোঃ আবদুল কাদির ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ ভূষণা দূর্গ পরিদর্শনকালে আলোচ্য মসজিদটির পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের ভগ্নাংবাশেষ অবলোকন করেন। অবশ্য তিনি এটিকে মোঘল আমলে নির্মিত বলে মনে করেন। কিন্তু উক্ত মসজিদের দেয়াল হতে অপসারিত বলে কথিত তিনটি ইটের অলংকরণ (একটিতে পূর্ব প্রস্তুটিতে পদ্মাফুলের নকশা এবং অনূদিত ফুলেল অলংকরণ বিদ্যমান) দৃষ্টে প্রত্মতত্ত্ব অনুমান করা যায় যে, মসজিদটি সুলতানী আমলে প্রথম নির্মিত হয়েছিল।

মসজিদ হতে ১০০'.০" উত্তর পূর্বদিকে ইট নির্মিত একটি প্রাচীন কুপের অস্তিত্ব বিদ্যমান এই কুপের সন্নিকটে দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ইমারতের ভগ্নাবংশেষ লক্ষ করা যায়। সম্ভবতঃ মুসল্লীদের আযুর পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হত। কুপ ও জলাধারে ব্যবহত ইট-সমূহ মসজিদের সম-সামষ্টি বলে প্রতিয়মান হয়।

মসজিদ হতে সামান্য পশ্চিমে এবং দূর্গ তোরণের পূর্বে একটি অনুচ্চ ও ক্ষতিগ্রস্ত টিবি দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে একে আবু তোরাবের মোঘল ফৌজদার ভূষণা কবর বলা হয়। বর্তমানে অবশ্য এখানে কোন কবরের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, তবে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন ইট ও ইটের ভগ্নাংশ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। ভূষণা দূর্গের দক্ষিণ বাহুর পূর্বকোণে বেশ কিছু ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ও কিছু মাটির টিবি রয়েছে যা আঞ্চলিক আধিবাসীগণ কর্তৃক ইট ও হরণে দৌরাত্বে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এখানে স্তপাকারে ফলের নকশাকৃত ইট ও ইটের মাঝে মাঝে মাটি দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। ফলে এখান থেকে ইমারত সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করা দুস্কর। ১৯৬৩ সনে আব্দুল কাদিও এস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ইমারতের কয়েকটি দেয়ালের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। দক্ষিণ বহুর পূব কোনে বিদ্যমান একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আজও রাজা সীতারামের ফাঁসির ঘর নামে পরিচিত। বর্তমানে ইমারতটির উত্তর ও পূর্বদেয়ালের কিছু অংশ ব্যতিত সম্পূর্ণই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিলুপ্ত।[৩৮] অবশেষে বাংলায় ইসলামী সংসস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ঈসা খানের অবদান অপরিসীম। যার সাক্ষী এই দূর্গটি ইতিহাসিক স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে ইসলামী সংস্কৃতি ও স্বাধীনতাকে উৎজীবীত করেছে।

---

[৩৮] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের মসজিদ স্থাপত্য সমূহ

Dhaka University Institutional Repository

কুতুব শাহ মসজিদ

ঈসা খান একটি বীরত্বগাথা নাম, যে নাম প্রেরণা জোগিয়ে আসছে যুগের পর যুগ। তিনি বাংলাকে শুধু স্বাধীন করার জন্য জীবনভর যোদ্ধ করেছেন। আর যখননি সুযোগ পেয়েছেন তখনি প্রতিষ্ঠা করেন মসজিদ। এবং ইসলামী সংস্কৃতি উন্নয়ন করেছেন যত দিন বেঁচে চিলেন। যার প্রমাণ হিসেবে অসংখ্য পুরাকৃতি মসজিদ স্থাপত্য।

বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম থানা সদরে পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি অবস্থিত। অনুমান করা যায় যে, ঈসা খানের প্রধান মজলিশ কুতুব শাহ জৈনশাহী পরগনার জমিদার ছিলেন এবং ঈসা খানের একজন মিত্রশক্তি হিসেবে মৈত্রীজোটে অংশ গ্রহণ করেন মোঘল সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন। তিনি এ অনিন্দ্য সুন্দর মসজিদটি নির্মাণ করেন। মজলিশ কুতুবের সমাধিটি এই মসজিদের পাশেই অবস্থিত।[৩৯] সম্ভবতঃ তার নাম অনুসারেই এর নামকরণ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে ব্যাপক আলোচনা করেছেন অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান,

অষ্টগ্রাম নামক একটি প্রাচীন স্থান বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলার পূর্বপান্তে চতুর্দিকে হাওর দ্বারা পরিবেষ্ঠিত একটি উচু ভূমিতে অবস্থিত। এ অঞ্চলটির থানা এবং ইউনিয়নের নামও অষ্টগ্রাম। আদিতে কালনী, ধানু, গিয়ারা উত্তরা, ধলেশ্বরী, মেঘনা, কাওরা এবং বাংলা নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল অষ্টগ্রাম। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ একটি মানচিত্র অষ্টগ্রামকে সিলেট জেলা ভুক্ত দেখানো হয়েছে।

অষ্টগ্রামের পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট কুতুব শাহ মাজিদ বাংলার স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। একটি বৃহৎ পুষ্করিনীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে পশ্চিম দিকে কুতুব শাহ মসজিদ দন্ডায়মান। এ অঞ্চলের একজন জনপ্রিয় দরবেশ কুতুব শাহ এর নামানুসারে এ মসজিদের নামকরণ করা হয়। পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে কুতুবশাহ-এর সমাধি অবস্থিত। আর মসজিদের দক্ষিণ দিকে আনুমানিক ১২'০" দূরে অনুচ্ছ বেদীর উপর নির্মিত সমাধি বিদ্যমান। এখানে আরো একটি সমাধি ছিল বলে স্থানীয় জনশ্রুতি সূত্রে জানা যায়। এ সকল সমাধিতে কারা শায়িত আছেন তা জানা যায় না। উল্লেখ যে, এই চারটি সমাধি হতে কুতব শাহের সমাধিটি আকারে বৃহত্তর।

---

[৩৯] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর দক্ষিণে লম্বা কুতুব শাহ মসজিদের আয়তন বহির্ভাগে প্রায় ৪৫'০×২৫'০ এবং অভ্যন্তরে ভাগে প্রায় ৩৬'০×১৬'০"। এ পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের পুরুত্ব প্রায় ৫'.০" এবং উত্তর ও পশ্চিম দেয়ালের পুরুত্ব প্রায় ৪'.৬"। মসজিদের চারকোণে রয়েছে চারটি অষ্টকোনাকৃতির বুরুজ। এগুলি বর্গাকার স্ফীত রেখা দ্বারা অলংকৃত। এর পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি করে কৌনিকাকৃতির খিলানকৃত প্রবেশ পথ রয়েছে। পূর্ব দেয়ালের অর্থাৎ প্রাসাদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটির উপবিভাগে ২৬'.৬"×১৩" পরিমাপের একটি অলংকারহীন ফাঁকা স্থান পরিলক্ষিত হয়, যেখানে সম্ভবত; কোন লিপিযুক্ত ফলক স্থাপিত ছিল। আর পশ্চিম দেয়ালের মধ্যভাগ বহির্দিকে সামান্য অভিক্ষিপ্ত এবং অভিক্ষিপ্ত অংশের দু'পাশে দু'টি তুলনামূলকভাবে সরু টারেট লক্ষ্য করা যায়- যেগুলির ভিত্তি বর্গাকার। মসজিদের বহির্দেয়াল সমূহ উল্লাম্বভাবে দুই সারি খিলান আকৃতির প্যানেলে বিভক্তি এক পূর্ব উত্তর দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশ পথসমূহের উপরিভাগে কিছু আনুভূমিক প্যানেল ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পশ্চিম দেয়ালে কোন আনুভূমিক প্যানেল দৃষ্ট হয় না। পূর্ব দেয়ালের খিলান কৃত প্রবেশ পথ বেষ্টনকারী আয়তকার ফ্রেম সমূহ নকশা বিশিষ্ট টেরাকোটা অলংকরণ দ্বারা সুসজ্জিত। অবশ্য কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ বেষ্টনকারী আয়তকার ফ্রেমের মধ্যবর্তী ডোরা (Band) টিতে সৃষ্ট টেরাকোটা নকশার নিচে একটি ফলসহ খেজুর গাছ ও গাছের নিচে খেজুর গাছের রস সংগ্রহের কিছু পাত্র পড়ে থাকতে দেখা যায়। আর খেজুর গাছের উপরে ফুলদানাতে স্থাপিত একটি Stylized বৃক্ষের মোটিক পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি খিলানের স্প্যান্ড্রিলে (Spandril) গোলাকার ফুল বিশিষ্ট টেরাকোঠা অলংকার দ্বারা সজ্জিত যা এতদঞ্চলের কারিগরদের অত্যন্ত প্রিয় একটা মোটিফ।

সুলতানী আমলের মসজিদের কনির্শে বাংলার দোচালা ঘরের কনির্শের ন্যায় যে স্বাভাবিক বক্ররেখা পরিলক্ষিত হয়, কুতুব শাহ মসজিদে তার মাত্রাধিক্য ঘটেছে। সাধারণত এ ধরণের মসজিদ তিন গম্বুজ বিশিষ্ট হয়, যেখানে মধ্যবর্তী গম্বুজের উত্তর পার্শ্বে একটি করে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ দেখা যায়। কিন্তু এ মসজিদে ভিন্ন ধরনের বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। এখানে বৃহদাকৃতির একটি কেন্দ্রীয় গম্বুজের চার কোণে চারটি ক্ষুদ্র গম্বুজ স্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য মসজিদ পাঁচটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজের উল্লেখ্যিত বিন্যাস মসজিদের অভ্যন্তরে ভাগকে অসম তিনঅংশে ভিভক্ত করেছে যার মধ্যে মধ্যবর্তী অংশটির পরিমাপ ১৬'.০"×১৬'.০" এবং এর দু'পাশে রয়েছে ২'.০" মার্জিন এলাকা। আর পাশ্ববর্তী অংশদ্বয়ের পরিমাপ ৮'.০"×১৬'.০"। মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটা মধ্যবর্তী অংশে এবং পার্শ্ববর্তী অংশদ্বয়ের উপরিভাগ আবার দুই অংশে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশের উপর একটি করে ক্ষুদ্র গম্বুজ স্থাপন করা হয়েছে। গম্বুজসমূহ মারবেল কৃত পেন্ডেন্টিভ দ্বারা সৃষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের পূর্বদেলায়ের তিনটি প্রবেশপথ বরাবর অভ্যন্তর ভাগের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। এগুলি সপির্ল নকশা বিশিষ্ট টেরাকোঠা অলংকার দ্বারা অতি মনোরমভাবে সুসজ্জিত। এখানে ব্যবহৃত অর্ধচন্দ্রাকৃতির একটি টেরাকোঠা নকশা এ মসজিদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত: এধরনের নকশা বাংলার এই প্রথম। অষ্টগ্রামের পথে দশগম্বুজ বিশিষ্ট কুলিয়ারচর মসজিদে একই ধরণের নকশা পরিলক্ষিত হয়। মসজিটির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সমাধি চারটির টেরাকোটা নকশার সাথে মসজিদ গাতের টেরাকোটা নকশার ঘনিষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ার প্রতীয়মাণ হয় যে, মসজিদ এবং সমাধিসমূহ একই সময়ে নির্মিত। এমনকি ইটের আকৃতিও একই ধরনের। এখানে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৬″×৬″×১″ এবং ৭″×.৫″×১″.৫″। তবে কুতব শাহের সমাধির ইটের আকৃতি তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর যার পরিমাপ ৮″×৮″×১.৫″ এবং ৮″×৮″×১″।

কুতুব শাহ মসজিদের নির্মাণ কৌশল এবং অলংকরণ রীতির উপর নির্ভর করে অধ্যাপক দানী ধারণা করেন যে, এটি ষোড়শ শতকের শেষার্ধে নির্মিত। তবে সাম্প্রতিককালে একটি কৃষ্ণপ্রস্ত রে নির্মিত শিলালিপি (২৭″×১৩″১.৫″) আবিস্কৃত হয়েছে যা বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। ষ্টেপলটন অবশ্য এ শিলালিপির আবিষ্কার স্থান উল্লেখ করেননি। কিন্তু মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ মনে করেন যে, এটি অবশ্যই সিলেটে আবিস্কৃত হয়, যখন অষ্টগ্রাম সিলেট জেলা ভুক্ত ছিল। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ অষ্টগ্রামে যে, সিলেট জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত শিলালিপিটি এতদঞ্চলের বিজেতা রুকন খান (আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এর উজির ও সেনাপতি) কর্তৃক ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ নির্মিত একটি ইমারতের নির্মাণ সম্পর্কে "হাশত গামারিয়ান" শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। ইমারতটি সম্ববত: মুহাম্মদের পুত্র জাশাইকন শেখ জালাল 'মুজাররেদ' এর সম্মানে রুকন খান নির্মাণ করেন। উল্লিখিত "হাসত গামারিয়ান শব্দটির বাংলা অর্থ অষ্টগ্রাম। লিপিটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিলেট ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে বিজিত হয়। একই ফটকের পশ্চাদ দিকে পরবর্তীকালের অপর একটা ফলক খোদিত রয়েছে। যার প্রাথমিক পাঠোদ্ধার হতে জানা যায় যে, কোন এক মসনদ আলী ফতেহ খান ১৫৮৮ খ্রীস্টাব্দে (৯৯৮ হিজরী) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

অতএব উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রুকন খান ১৫১২ খ্রিস্টাব্দ অষ্টগ্রাম জয় করেন এবং লিপি ফলকযুক্ত একটি ইমারত নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে বিখ্যাত দরবেশ কুতুব শাহ সম্ভবত: একই স্থানে সমাহিত হন। তাঁর সমাধির পার্শ্বেই সমনদ আলী ফতেহ খান ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন এবং পরবর্তী লিপি ফলকটি পুনরায় ব্যবহার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কুতব শাহ মসজিদের সম্মুখের পুষ্করিনীর উত্তরপাড়ে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাধি দেখা যায় যার ইটের আকৃতি মসজিদে ব্যবহৃত ইটের ন্যায়। এই সমাধিটি খুব সম্ভব পুরবর্তী কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের অংশ বিশেষ।[৪০] বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বা স্বাধনতার ইতিহাসে ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন একটি বিরাট অবদান। ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র মসজিদ প্রতিষ্ঠায় ঈসা খানের অবদান অনেক তিনি মোঘলদের প্রতিরোধের পাশপাশি মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার করেছেন, কুতুব শাহ মসজিদ তার একটি প্রমাণ।

ইটনা শাহী মসজিদ

ঈসা খানের মসজিদের মধ্যে অন্যতম মজলিশ দেলোয়ার কর্তৃক এই বিখ্যাত মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। ঈসা খানের সমসামরিক ঐতিহাসিক আবুলফজল 'আকবরনামা' গ্রন্থে ঈসা খান প্রসঙ্গে আলোচনায় কুতুব ও মজলিশ দেলোয়ারের উল্লেখ করেছেন।[৪১] মসজিদটিতে মোঘল স্থাপত্য রীতির প্রকাশ ঘটলেও ষোড়শ শতকের শেষ দিকে যে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উল্লেখ্য যে, মজলিশ দেলোয়ার এবং মজলিশ কুতুব উভয়ই ছিলেন আফগান। আফগানরা যখন ভারতের দিল্লী আগ্রা উত্তর প্রাদেশ ও বিহার থেকে বিতাড়িত হয়ে তদানিন্তন বঙ্গের এই একটি ভাটিরাজ্যের দিকে এসেছিল তখন তারা লোদী আমলের একটি ভিন্ন স্থাপতারীতিও সাথে করে এনেছিল। সেই স্থাপত্যরীতিতে যে সকল মসজিদ নির্মিত হয়েছিল অনেকে ঐ মসজিদ গুলোকে বারদোয়ারী মসজিদ বলে অভিহিত করে থাকে। এর মধ্যে কিছু কিছু তিন গম্বুজ মোঘল আমলেই নির্মিত হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলা সদরে বড় হাটিতে অবস্থিত শাহী মসজিদের সম্মুখে দেয়ালে রয়েছে তিনটি সমান আকৃতির প্রবেশ পথ। মসজিদের কানিশ্ ও প্যারাপেট সরল রেখায়। দেয়ালগুলোর পুরু প্রায় পাঁচ ফুট।[৪২]ঈসা খানের মজলিস দেলোয়ার কর্তৃক নিমির্ত ইটনা শাহী মসজিদ যার মাধ্যমে বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং বাংলাদেশে স্বাধীনতায় ভূমিকা রেখেছে।

---

[৪০] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও হুসনে জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৯

[৪১] আবুলফজল, আকারনামা, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৪২] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪

Dhaka University Institutional Repository

বিবি মরিয়ম মসজিদ

নারায়ণগঞ্জ শহরের উত্তরে বরফকল গোদারা ঘাটের সামান্য কিছুটা পশ্চিমে এবং হাজীগঞ্জ অর্থাৎ খিজিরপুর দূর্গের সামান্য দক্ষিণে মোঘল আমলে নির্মিত এই মসজিদটি অবস্থিত।

ঈসা খানের বংশধাররা দাবী করেন যে, ষোড়শ শতকের ৫টি ভাটিরাজ্যের অধিপতি ঈসা খান মসনদ-ই-আলার প্রথমা স্ত্রীর মাজারকে কেন্দ্র করে ঈসা খান নির্মাণ করেন এই মসজিদ। অনেকের মতে, বিবি মরিয়ম ছিলেন নবাব শায়েস্তা খানের কন্যা। শায়েস্তা খানের কন্যার কবরের পাশে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

ঈসা খানের বংশধরদের দাবি সত্য বলে মনে হয়। কেননা এই মাজারের উত্তর পার্শ্বে খিজিরপুর দূর্গ-সেখানে ছিল ঈসা খানের রাজধানী। আর এজন্যই ধারণা করা যায় যে, ঈসা খানের বিখ্যাত এই খিজিরপুর দূর্গে অবস্থান কালীন সময়ে তার প্রথমা স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন এবং এখানেই তাকে দাফন করা হয়। তার কবরকে কেন্দ্র করে ঈসা খান অথবা তার পুত্র মুসা খান মোঘল স্থাপত্য কৌশলে নির্মিত করেন এই মসজিদ।

আয়তাকারে নির্মিত এই মসজিদের পরিমাপ উত্তর দক্ষিণে ভিতরের দিকে ৪৫'-০ এবং পূর্ব পশ্চিমে চাওড়া প্রায় ১৫'.০। মসজিদের পূর্ব দেয়ালের তিনটি এবং উত্তর দক্ষিণের দেয়ালে ১টি করে দরজা রয়েছে। মাঝে দরজা দু'পাশেই দেয়ালটি বেশ উদগত। কেবলা প্রাচীরে রয়েছে তিনটা মেহবার। মসজিদের গম্বুজ ৩টি।[৪৩] ঈসা খানের জীবন মোঘল মুক্ত বাংলা গড়ার ডাকে যখনি সুযোগ পেয়েছেন তখনিই মসজিদ নিমার্ণ করেছেন। যা ইসলামী সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রাখে।

মহজমপুর মসজিদ

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানার জামপুর ইউনিয়নে মহজমপুর গ্রামে ছয়গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি অবস্থিত। ঢাকা শহর থেকে এই মসজিদের দুরত্ব প্রায় সতের মাইল পূর্বদিকে। বাংলার সুতলানী আমলে এ স্থানটি ছিল ইকলিম-ই মোয়াজোমাবাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র। এখানে ছিল মিন্ট টাউন। মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান শামসুদ্দিন আহমদ শাহের রাজত্বকালে জনৈক ফিরোজ খান কবীর এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। শিলালিপিতে মসনদ শাহী এবং সুলতান আলী মুসা ইত্যাদি বক্তব্য লিখিত থাকার কারণে অনুমান করা যায় যে, সম্ভবত এই মসজিদটি ঈসা খানের পুত্র মুসা খান মসনদ-ই-আলার নির্দেশে ফিরোজ খান কবীর নির্মাণ করেন।

[৪৩] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

আয়তাকারে নির্মিত ছয়গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদ বেশ কয়েকবার মেরামত করার ফলে মূল স্থাপত্য নিদর্শনটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৪৪]

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে "ঈসা খাঁ: সমাকালীন ইতিহাস" গ্রন্থে ঢাকা শহর হতে প্রায় সতের মাইল উত্তর পূর্বে বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ থানার অন্তর্গত জামপুর ইউনিয়ানে মহজমপুর নামক গ্রামে কাজী পাড়া মৌজায় দন্ডায়মান একটি ছয় গম্বুজ ধারী প্রাচীন মসজিদ মহজমপুর মসজিদ নামে পরিচিত।

মহজমপুর মসজিদের সম্মুখে অর্থাৎ পূর্বদিকে রয়েছে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের দক্ষিণে পূর্বঅংশে শাহলঙ্গলের সমাধি ও উত্তরপূর্ব কোনে লোদী আমলে নির্মিত একটি মিনার ও সমাধি এবং সমাধি মিনারের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে একটি বৃত্তাকার কুপ রয়েছে। আর প্রাঙ্গনের উত্তরদিকে রয়েছে- এর মূল তোরণদ্বার। এছাড়া সমগ্র এলাকাটির দক্ষিণে বেশ কিছু শনাক্তহীন করব দেখা যায়। উল্লিখিত কবরস্থানটিতে প্রবেশপথ বিদ্যমান। সমগ্র এলাকাটির দক্ষিণ পূর্ব ও উত্তরদিক ইষ্টক নির্মিত দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্বদিকের আবেষ্টনীর বাইরে একটি Vault কৃত কবরসহ প্রাচীন কবরস্থান বিদ্যমান।

আয়তকারে নির্মিত এই ছয়গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির বর্হিদিকের পরিমাপ উত্তরদক্ষিণে ৪২'×৬" ও পূর্ব-পশ্চিম ৩১'.০" এবং এর দেয়াল ৫'.৬" পুরু। মসজিদটির পূর্বদিকে একটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট বারান্দাযুক্ত করে একে বর্ধিত করা হয়েছে। বারান্দাটির আয়তন ৪০'.০"×৬"। বর্ধিত বারান্দার অভ্যন্তর ভাগে এখনও পূর্ব দেয়ালের কোণের আদি বুরুজদ্বয় চিহ্নিত করা যায়। মসজিদের ফাসাদে অর্থাৎ পূর্বদেয়ালে তিনটি খিলানকৃত প্রবেশপথ রয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী খিলানটির প্রশস্ততা ৬'.১" এবং পার্শ্ববর্তী খিলান দু'টির প্রস্তুত প্রশস্ততা ৫'.৯"। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দু'টি করে খিলান রয়েছে। যেগুলির প্রশস্ততা ৩'.৯"। বর্তমানে মসজিদটি উত্তরদিকে সম্প্রসারণের নিমিত্তে নতুন কিছু কাঠামোর নির্মাণ কাজ চলছে।

মসজিদটি অনেকবার সংস্কার করা হয়েছে। এবং যদিও এর কর্নিশ, গম্বুজ, পশ্চিম কোণের বুরুজসমূহ প্রভৃতির সকলই পুনর্নির্মিত তথাপি পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী এ অভিক্ষিপ্ত অংশে কুলঙ্গীকৃত প্যানেলে স্থাপিত কুলের নকশা বিশিষ্ট টেরাকোটা অলংকার সম্বলিত কিছু কিছু আদি বৈশিষ্ট্য এখনও বিদ্যমান।

---

[৪৪] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদটির অভ্যন্তর ভাগের পরিমাণ ৩১'.৬"×২০'.০"। কক্ষটির মধ্যবর্তী স্থানে প্রায় ৯'.১০" দুরত্বে দু'টি অষ্ট কোণাকৃতির প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপনের দরুন মসজিদটি দু'টি আইল ও তিনটি বে দ্বারা মোট ছয়টি অংশে বিভক্ত। প্রতিটি অংশের উপর একটি করে গম্বুজ স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত স্তম্ভদ্বয়ের ভিত্তি গোলাকার। তবে দেয়ালের সাথে সন্নিবিষ্ট স্তম্ভসমূহের ভিত্তাবর্গকার। অবশ্য এ সকল স্তম্ভের মধ্যাংশ অষ্টকোণাকৃতির। মসজিদের গম্বুজসমূহ পার্শ্ববর্তী খিলান উপেন্ডেনন্টিভ দ্বারা আলম্বিত। অভ্যন্তর ভাগের দু'টি আইল বারবার উত্তর দক্ষিণ দিকের দু'টি খিলান এবং তিনটি বারবার পূর্ব দেয়ালেল তিনটি খিলান দ্বার আইল ও বেদ্বারা সৃষ্ট ছয়টি অংশের উপর ছয়টি গম্বুজ সম্বলিত এই বিন্যাস বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব দেয়ালের তিনটি খিলানকৃত প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিমে দেয়ালে তিনটি মিহরাব বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি ৩'.৪" প্রশস্ত, ৭'.৩" উচু এবং গভীর। এটি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত এবং খোদাইকৃত ঝুলন্ত শিকল ও ফুলের নকশা দ্বারা অলংকৃত এর ইষ্টক নির্মিত ক্ষুদ্র স্তম্ভ। প্রিপত্রাকার খাঁজ খিলান এবং স্প্যান্ড্রিলে পদ্মফুলের নকশা মিহরাবটিকে অত্যন্ত জাঁকালো রূপদান করেছে। মিহরাবের স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশে একটি শিকলে ঝুলন্ত ঘন্টা আকৃতির নকশা পরিলক্ষিত হয়।

অপরদিকে পাশ্ববর্তী মিহরাবদ্বয় কেন্দ্রীয় মিহরাব হতে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রাকৃতির। এগুলি ২'.৯" প্রশস্ত, ৫'.৬" উচু এবং ২' গভীর। ইষ্টক নির্মিত এই মিহরাব দ্বয়, Stylized ঝুলন্ত নকশা দ্বারা অলংকৃত। তন্মধ্যে উত্তরদিকের মিহরাবটি বর্তমানে আলমিরা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মসজিদটিতে ব্যবহৃত ইটসমূহের পরিমাপ ৭"×৭"×১".৫"। মসজিদটি মোটেই তেমন আকর্ষণীয় নয়। তবে এর কোণের বুরুজ, পশ্চাৎ দেয়াল এবং মিহরাবসমূহের অলংকরণ এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

মসজিদ গাত্রে নির্মাণ তারিখ সম্বলিত একটি শিলালিপি ছিল যা বর্তমানে ভেঙ্গে চূর্ণ বিচুর্ণ হবার কারণে মসজিদের সঠিক নির্মাণ তারিখ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে শিলালিপির উৎকীর্ণ লিপি হতে তৎকালীন শাসক মসনদ শাহী আহমদশাহ ফিরোজ খান এবং সুলতান আলী মুসা এই তিনটি নাম পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়। শিলালিপিটির পাঠোদ্ধারকৃত অংশের অনুবাদ নিম্নরূপঃ

অনুবাদ: ফিরোজ খান কবীর, আল্লাহতা'লা বিচারেরদিন পর্যন্ত তার রাজ্যকে স্থায়ী করুন ....আহমদ শাহের রাজত্বকালে.........সুলতান আলী মুসা প্রত্যাশী.......।

Dhaka University Institutional Repository

এ থেকে সৈয়দ আওলাদ হাসানসহ বেশ কিছু ঐতিহ্যবাহিক মত প্রকাশ করেন যে, লিপিতে উল্লিখিত আহমদ শাহ বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মোহাম্মদ শাহের পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (শাসনকাল ১৪৩২-৩৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং তার রাজত্বকালেই জেনৈক ফিরোজ খান কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। কিন্তু তারা কেউই মসনদ শাহী শব্দটির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করেননি। আর করলেও তার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলার বার ভূইয়াদের নেতা ঈসা খানের উপাধি ছিল 'মসনদ-ই-আলা'। এ উপাধি তার কামানে উৎকীর্ণ রয়েছে। (জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত দেওয়ান বাগে প্রাপ্ত ঈসা খানের রুমা কামান) অতএব মসনদ শাহ আহমদ শাহ ঈসা খান বংশের কিন্ত অপরকোন আফগান শাসক হয়ে থাকবেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। কেননা সুলতান আমলে কোন 'মসনদ শাহী' উপাধির সন্ধান পাওয়া যায় না। আবার ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রাপ্ত জঙ্গল বাড়ির দেওয়ান ফিরোজ খান এবং মসজিদ শিলালিপিতে উৎকীর্ণ ফিরোজ খান একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে প্রর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

মহজমপুর গ্রামের এ ছয়গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটিকে কেন্দ্র করে Brakleman এই এলাকাটিকে সুলতান-ই-আমলের ইকলিম-মোয়াজ্জামাবাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তার মতে, এখানেই -মোয়াজ্জামাবাদ টাকশাল অবস্থিত ছিল। উল্লিখিত মন্তব্যটি সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা এই মহজমপুর বা মজমপুর গ্রাম কখনোই -মোয়াজ্জামাবাদ নামে পরিচিত ছিল না এবং আজও পরিচিত নয়। তাছাড়া সে সম্পর্কে উপযুক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ (যেমন শিলালিপি, দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি)ও পাওয়া যায়নি। তবে নৌঘাটি স্থাপনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে মহজমপুর বিবেচিত শাহ লঙ্গর পশ্চাদশ শতকে এস্থানে অবস্থান করেন। খুব সম্ভব তিনি এই নৌঘাটির গভর্নর ছিলেন এবং মহজমপুরেই মৃত্যুবরণ করেন। তার সম্পর্কে একটি প্রবল জনশ্রুতি হল, তিনি ছিলেন বাগদাদের এক শাহজাদা। সংসারের প্রতি অনাসক্তি হেতু তিনি দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত এখানে এসে মৃত্যুবরণ করেন। মসজিদটির সম্মুখে দক্ষিণ পূর্বঅংশে তার সমাধিটি অবস্থিত। সুতরাং একটু সুনিশ্চিত করে বলা যায় যে, মহজমপুর বা মহজমপুর এবং যে-মোয়াজ্জামাবাদ অভিন্ন নয়।

অবশ্য মহজমপুর যে ঐতিহাসিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন স্থান সে সম্পর্কে কোন মতদ্বৈততা নেই। রক্ষাপত্র নদের তীওে রণ কৌশলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত এই মহজমপুরে সিকদার অথবা উপশাসক এর ন্যায় আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ এবং বহু ফকির দরবেশের বসবাস ছিল। মসজিদের পার্শ্ববর্তী প্রাচীন কবরস্থান এবং শাহ লঙ্গরের সমাধির অস্তিত্ব এর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। উপরোক্ত গ্রামের সর্বত্র মাটির নীচে প্রাচীনকালের ইট পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে কোন এক মসনদ শাহী আহমদ শাহ লঙ্গরের সমাধির পাশে পশ্চিমদিকে মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটা স্থানীয় কারিগর দ্বারা অলংকৃত করা হয়। আহমদ হাসান দানী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ প্রদত্ত মসজিটির নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে বলেন, সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা মসজিদের টেরাকোটা অলংকরণ সমূহ ইলিয়াস শাহী বংশ কিম্বা হোসেন শাহী যুগের ন্যায় উৎকৃষ্ট মানের নয়। এখানে ব্যবহৃত অষ্ট কোণাকৃতির বুরুজ টেরাকোটা নকশা, অনুচ্চ খিলানকৃত প্রবেশ পথ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রস্তর স্বম্ভ মোঘল পূর্ব যুগের নিদর্শন বহন করলেও মসজিটির অলংকরণ ব্যবহার প্রণালী সুলতানী স্থাপত্যের ক্ষয়িষ্ণু যুগের প্রতি ইংগিত বহন করে। উপরোক্ত মসজিদটির অলংকারিক উপাদান এবং টেরাকোটা নকশার ব্যবহার প্রণালী ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দ নির্মিত অষ্ট্রগামের কুতুবশাহী মসজিদের সাথে সাদৃশ্য বিদ্যমান। এছাড়া নির্মাতাদের নামের সাদৃশ্য আছে। কুতুব মসজিদ নির্মাণ করেন মসনদ আলী ফতেহ খান এবং মহজমপুর মসজিটি নির্মাণ করেন মসনস শাহী আহমদ শাহ। উল্লিখিত নাম দু'টিরই উপাধি ঈসা খান মসনদ-ই-আলার ন্যায় স্থানীয় আফগান নেতৃবর্গের প্রতি ইংগিত বহন করে। অতএব উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মহজমপুর মসজিদ শামসুদ্দীন আহমদ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত নয়। এটা সম্ভবতঃ বার ভূইয়াদের শাসনামলে ষোড়শ শতকের শেষভাগে নির্মিত।[৪৫] বাংলায় ইসলামী কৃষ্টি কালচার উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে মসজিদ মহজমপুর।

ফিরোজপুর মসজিদ

হাজীগঞ্জ থানার দালতো ইউনিয়নের ফিরোজপুর গ্রামে ঈসা খানের রাজত্বের সময় ১৫৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দ দিকে মসজিদটি নির্মিত হয়। ফিরোজ শাহ লস্কর নামে একজন প্রশাসক এই অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। তারই নাম অনুসারে গ্রামের নামটি পরিচিত লাভ করে। মসজিদটি সম্ভবত তিনি নির্মাণ করে ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। ফিরোজ শাহ লস্কর এই মসজিদের পাশেই খনন করেছেন একটি দীঘি। দীঘিটি ফিরোজ শাহ লস্করের দীঘি নামে খ্যাত। বর্গাকার নির্মিত মসজিদের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ২২ ফুট। মসজিদটির ছাদ আচ্ছাদিত করা হয়েছে একটি বাক্স গম্বুজ দ্বারা। মসজিদের পূর্ব উত্তরে দক্ষিণে দেয়ালে রয়েছে ১টি করে প্রবেশ পথ। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে একটা মাত্র মিহরাব। ঈসা খানের সময় নির্মিত এ এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদসমূহের মধ্যে ফিরোজশাহ লস্করের মসজিদটিতে একটি স্থাপত্য কৌশল পরিলক্ষিত হয়।[৪৬]

[৪৫] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৭

[৪৬] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান আলোচনা করেছেন, হাজীগঞ্জ থানার ফালচো ইউনিয়নের অন্তর্গত ফিরোজপুর গ্রামে এ মসজিদটি অবস্থিত। ফিরোজ শাহ লস্করের দীঘি নামক একটা প্রাচীন জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে মসজিদটি অবস্থিত। বর্গাকারে নির্মিত মসজিদের প্রত্যেক বাহু ২২ ফুট দীর্ঘ। দেওয়ালগুলি ৪′.৬″ প্রশস্ত পূর্বউত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে আছে ১টি করে প্রবেশ পথ। ভিতরে পশ্চিম দেওয়ালে আছে একটি মাত্র মিহরাব। মসজিদের উপরে আছে একটি মাত্র গম্বুজ।

স্থানীয় জন প্রবাদ মতে জানা যায় যে, সম্রাট আকবরের দেওয়ান ফিরোজ শাহ লস্কর ১০০০ হিজরীতে (১৫৯১-৯২খ্রিস্টাব্দ) এ মসজিদ নির্মাণ করেন। দীঘিটিও একই সময়ে নির্মিত।[৪৭] কিন্তু উল্লেখিত সময়ে এ অঞ্চলে বার ভূইয়াদর অধীনে ছিল বলে এটিকে বার ভূইয়াদের মসজিদ হিসেবে অনুমান করা যেতে পারে।

মোঘড়া পারে যখন মুসলমান রাজধানী ছিল তখন ব্রহ্মপুত্র হতে মেঘনা পর্যন্ত যে খাল নির্মিত হয়েছে তার নাম মেনী খাল বা গাঙ্গিনা, যা উত্তবগঞ্জের দক্ষিণ পাশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে। ঈসা খান এ খালের উন্নয়ন সাধন করেন। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দ সুবাদার ইসলাম খান যখন জলে স্থলে সুনিয়ন্ত্রিত অভিযান শুরু করেন তখন মূসা খান ও তার মিত্রগণ যাত্রাপুর ও ডাক ছড়ার বাধা দান করেন। কিন্তু তারা পরাজিত হন।[৪৮]

উল্লেখ যে যাত্রাপুর ও ডাক ছড়ায় দূগর্দ্বয় মৃন্ময় নির্মিত ছিল। ঢাকার ৩০ মাইল পশ্চিমে ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত যাত্রাপুর দূর্গ ছিল চাঁদপ্রতাপ পরগনার অন্তর্গত এবং সেখানকার জমিদার ছিলেন বিনোদরায়। যাত্রাপুর দূর্গ রক্ষার দায়িত্ব অর্পন করা হয় মির্যা মুমিন, দরিয়া খান ও মাধব রায়ের উপর।[৪৯]

---

[৪৭] আ, ক, ম, জাকারিয়া বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, শিল্প কলা একাডেমী ১৯৮৪, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৫৫

[৪৮] বাহরিস্তান-ই-গায়েবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

[৪৯] অধ্যাপক হাবিবা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

জঙ্গলবাড়ি দূর্গ মসজিদ

তিন গম্বুজবিশিষ্ট জঙ্গলবাড়ি মসজিদ কিশোরগঞ্জ জেলার অভ্যন্তরভাগে গিয়ারাসুন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। বহি:দিকে এর পরিমাপ ৫০'×২১'। সাম্প্রতিককালে মসজিদটি বহুলাংশে সংস্কার করা হলেও মিহরাব সমূহের কুলঙ্গীতে এবং খিলান সমূহের স্প্যান্ডিলে আদি অলংকারের মোটিক এখন ও দৃষ্ট হয়। করবেলকৃত পেন্ডেন্টিভের উপর নির্মিত মসজিদের গম্বুজ তিনটিসম আকৃতির নয় এবং এই সকল গম্বুজের ভিত্তি প্যারোপেটের কারণে দৃষ্ট হয় না। উল্লেখ্য যে, এর ফাসাদের উপরোক্ত প্যারাপেট এবং কার্ণিশ সুলতানী আমলের ন্যায় বক্র না হয়ে সরল রেখার নির্মিত। পূর্বদিকে একটি বারান্দা সংযুক্ত হয়েছে। মসজিদের চারকোণে চারটি বুরুজ (Tower) এবং কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের ও পাশে দু'টি পশ্চাদ দেওয়ালের মধ্যভাগে কেন্দ্রীয় অভিক্ষিপ্ত অংশের দু'পাশে মিহরাবের দু'টি মোট ৪টি সরুটারেট নির্মিত হযেছে। ভাটিঅঞ্চলের বার ভূইয়াদের প্রধান ঈসা খানের সুরক্ষিত আবাসস্থল ছিল জঙ্গলবাড়ি।

বর্তমানে এ এলাকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যেভগ্ন দেয়াল দ্বারা একটি আবেষ্টনীকৃত এলাকার অভ্যর্ন্তরে কয়েকটি কক্ষ রয়েছে।। বাইরে দরবার কক্ষটিতে এখন ও আদি অলংকরণ ও সে যুগের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু বিদ্যমান। ইটের পরিমাপ ৭"×৬'.৫"×১'.৫"। দেয়াল চিত্রে নীল সোনালী ও সবুজ রং ব্যবহৃত হয়েছে। এই মসজিদের পূর্ব দিকে তিনটি প্রবেশ পথ এবং কিবলা দেয়ালে তির্নটি মিহরাব দেখা যায়। দক্ষিণ এবং কিবলা দেয়ালে একটি করে মোট দু'টি জানালা অথবা ক্ষুদ্র খিলানকৃত প্রবেশ পথ দেখা যায়। গম্বুজসমূহ আকৃতিগতভাবে অর্ধগোলাকার এবং পেন্ডেন্টিভের উপরে নির্মিত। পেন্ডেন্টিভ সম্পর্কে পার্সি ব্রাউন বলেন-এ সকল মসজিদ সত্যিকারের ভল্ট কিংবা প্রকৃত খিলান কোনটিই দেখা যায় না। এগুলি ঐতিহ্যগত ক্রমপুরণ পদ্ধতিতে নির্মিত। এ পদ্ধতি যদিও নির্মাণ কৌশলভাবে অবৈজ্ঞানিক তবুও এটি অন্যন্যভাবে কার্যকর এবং শৈল্পিক সমাধানের একটি উদাহরণ।

গম্বুজসমূহ কোন ড্রামের উপর স্থাপিত না হবার কারণে এদের ভিত্তি প্যারাপেট দ্বারা আচ্ছাদিত। পাশ্ববর্তী গম্বুজের তুলনায় কেন্দ্রীয় গম্বুজটি উচু। মোঘলগণ তাদের রীতি প্রচলিত করার বহু পূর্বেই এ সকল মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ষোড়শ শতকে স্বাধীন সুলতানগণ সোনারগাঁয়ে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট রীতি প্রচলন করেন। একই ধরনের মোঘল পূর্ব তিন গম্বুজ মসজিদ মালদা জেলার গৌড় এবং বগুড়া জেলার শেরপুরে দেখা যায়। মোঘল আমলে এই রীতি আরও উন্নতি লাভ করে। উদাহরণ সরূপ ঢাকার লালবাগ মসজিদের কথা বলা যেতে পারে। বৈশিষ্ট্যগত বিচারে অষ্টগ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

কুতুব শাহী মসজিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত কিন্তু এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত সংযোজন দেখা যায় [৫০]

এ প্রসঙ্গে আরো আলোচনা করেছেন মোশাররফ হোসেন শাহজাহান তার 'ঈসা খান' নামক গ্রন্থে ঈসা খানের ভাটিরাজ্যের রাজধানী জঙ্গলবাড়ি দূর্গের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি প্রথমে ঈসা খান নির্মিত হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করে থাকেন। পরবর্তী সময়ে কয়েকটি ভূমিকম্পে মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে-এর ভিত্তি দেয়াল থেকে পুনরায় নির্মিত এই মসজিদের পুরাতন কারুকার্যময় স্থাপত্য কর্মের কোন ধারনাই করা যায় না। এই দূর্গের অভ্যন্তরে আরো দু'টি ১গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ছিল বলে অনেকে অনুমান করে থাকেন। ধারণা করা যায় যে, পরবর্তী সময় যখন মসজিদটি পুন:নির্মাণ করা হয়েছিল তখন মসজিদটির কার্ণিশাটি সরল রেখায় নির্মিত হয়। তবে মসজিদটি ঈসা খান কর্তৃক নির্মাণের বিষয়টি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।[৫১] ঈসা খানের এই সব মসজিগুলি প্রমাণ কওে ইসরামী সংস্কৃতি ও উন্নয়ন করেছেন।

চাটমোহর সৈয়দ মাসুম খান কাবুলীর মসজিদ

সিরাজগঞ্জ ইশ্বরদী রেললাইনের উত্তর পার্শ্বে বড়াল নদীর তীরে অবস্থিত চাটমোহর নামক প্রাচীন স্থানে একটি বৃহৎ মসজিদ যা বর্তমানে ধবংসাবশেষ। চাটমোহর রেলস্টেশন থেকে প্রায় ১.৫ মাইল উত্তর পূর্বদিকে এবং চাটমোহর নতুন বাজার থেকে প্রায় আট-মাইল পূর্বদিকে একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এ মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের গম্বুজগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং প্রাচীরের সকল অংশও বর্তমানে টিকে নেই।

চতুর্দিকে অনুচ্চ দেয়াল ঘেরা প্রায় দুই বিঘা ভূমির পশ্চিম প্রান্তে মসজিদটি অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত মসজিদটির আয়তন ছিল বহির্দিকে প্রায় ৬৩×৩৬' এবং অভ্যন্তর দিকে প্রায় ৫১ ফুট×২২.৫ ফুট। দেয়াল মোঘল আমলের ন্যায় পাতলা ইটের তৈরী। দেয়ালগুলি ছিল প্রায় ৬ ফুট পুরু। উপরে ছিল তিনটি অতি মনোরম গম্বুজ। গম্বুজসমূহের উচ্চতা ছিল প্রায় ৪৫ ফুট। মসজিদের সম্মুখস্থ দেয়ালে অতিসুন্দর সুলতানী আমলের ন্যায় কারুকার্য ছিল। মসজিদ প্রাঙ্গনের মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে একটি পাকা কুপ। কুপের দেয়ালে প্রথিত একখন্ড কালো পাথরে 'কালিমা তৈয়্যাব' উৎকীর্ণ রয়েছে।

মসজিদে একটি শিলালিপি ছিল। বর্তমানে শিলালিপিটি রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। শিলালিপির পশ্চাৎ দিকে ব্রক্ষা, বিষ্ণু ও শিবের মুর্তি উৎকীর্ণ ছিল বলে জানা যায়।

---

[৫০] হাবিবা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

[৫১] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৬

Dhaka University Institutional Repository

শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, সুলতান-উল-আজম আবুল ফতেহ মোহাম্মদ মাসুম খানের রাজত্ব কালে তুর্কী মোহাম্মদ খান কাকশালের পুত্র খান মোহাম্মদ (কাকশাল) এর নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য যে মাসুম খান কাবুলী সুতলান-উল-আজম উপাধি গ্রহণ করলেও ঈসা খানের অনুগত্য মেনে চলতেন। মাসুম খান কাবুলী ছিলেন সম্রাট আকবরের সেনাপতি। তিনি বিদ্রোহীহয়ে পাবনা অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সেখানে কিছুকাল রাজত্ব করেন। পরে কাতরাবোতে তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। মসজিদের একটু দূরেই ছিল একটি দূর্গ। তবে সে দূর্গের বিশেষ কোন চিহ্ন টিকে নেই। কিছু দূরে কয়েকটি অতি ক্ষুদ্রাকারের পাহারা ঘর এখনও দৃষ্ট হয়। ঈসা খান ত্রিবেনী, হাজীগঞ্জ ও কালাগাছিয়া নামক স্থানে তিনটি দূর্গ নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। কালাগাছিয়া দূর্গের নিকটেই ছিল মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র ও ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদীর সংগম স্থান।

কথিত আছে যে, ঈসা খান বিক্রমপুর অধিপতি চাঁদরায়ের পরমা সুন্দরী বিধবা কন্যা সোনামণিকে বিবাহ করার মানসে তথায় দূত প্রেরণ করলে চাঁদরায় ও কেদাররায় যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রথম আক্রমনেই চাঁদরায় কলাগাছিয়া দূর্গ বিধ্বংস্ত করেন। অত:পর ঈসা খান ত্রিবেনী দূর্গে আত্মরক্ষা করলে চাঁদরায় ত্রিবেনী অবরোধ করে খিজিরপুরের বহুতল অনিষ্ট সাধন করতে শুরু করেন। উপরোক্ত জন প্রবাদটি প্রমাণ করে যে, কলাগাছিয়া ও ত্রিবেনী দূর্গ ঈসা খানের অধীনে ছিল। এ সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, ঈসা খান শক্তি বলে সোনা বিবিকে জয় করে মেঘনা ও লক্ষ্যার সংগম স্থলে কলাগাছিয়া দূর্গে নিয়ে আসেন। যে কারণে চাঁদরায় কর্তৃক কলাগাছিয়া দূর্গ আক্রান্ত হয়।

ঈসা খান ব্রহ্মপুত্রের উজান পথে রাঙ্গামাটি ও দশকাহনিয়াতে (বর্তমানে শেরপুর) আরো দু'টি দূর্গ নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। খিজিরপুরের ভূঞা রাজা ঈসা খান সমনদ-ই-আলার একটি দূর্গ নির্মাণ করেন বলে জানা যায়।[৫২]

এই প্রসঙ্গে মোশাররফ হোসেন ঈসা খান গ্রন্থে বলেন, পাবনা জেলার চাটমোহর থানা সদরে অবস্থিত এই বিখ্যাত মসজিদটি ঈসা খানের মিত্র এবং চাটমোহররে স্বাধীন সুলতান মাসুম খান কাবুলী রাজত্বের ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে এটি মোহাম্মদ খান কাকশালের পুত্র খান মোহাম্মদ এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

ঈসা খানের সময়ে যে সকল মসজিদ স্থাপত্য পুন:নির্মাণের ফলে এখনও অবিকল ঐ স্থাপত্য কৌশলে বিদ্যমান এগুলোর মধ্যে চাটমোহর এ মসজিদটি অন্যতম। সম্মুখে একটি কুপ যা এখন আর ব্যবহৃত হয়না।[৫৩] বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতি উন্নয়তিতে এ মসজিদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

---

[৫২] হাবিবা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯-৭১

Dhaka University Institutional Repository

কাতরাবো মসজিদ

কাতরাবো মসজিদ সম্পর্কে তেমন কিছু বলা যায়নি। কেননা এর কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি। বর্তমান মানুমাবাদ গ্রামে অবস্থিত ঈসা খানের সুরক্ষিত আবাসস্থল কাতরাবো এর অভ্যন্তরে বিদ্যমান একটি প্রাচীন টিবি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে সুপরিচিতি। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে, মসজিদটি তিনগম্বুজ বিশিষ্ট ছিল। বর্তমানে এ স্থানে মসজিদের কোন ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি। তবে উক্ত মসজিদটি সম্ভবত: ঈসা খানের যুগে নির্মিত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। মসজিদটি ইষ্টক নির্মিত খোদাইকৃত ফুলের নকশা দ্বারা অলংকৃত ছিল। এটি মিঠাপানির পুস্পরনী জলাশয়টির উত্তর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল।[৫৪] কাতরাবো মসজিদ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হল নয়। কাতরাবো মসজিদ বাংলার ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়নে আজও ঐতিহাসিক স্মৃতি বহণ করে যাচ্ছে।

বালিগাঁও মসজিদ

লক্ষ্যানদীর তীরে বালিরাগাঁও নামক গ্রামে (ভাওয়ালে অবস্থিত) একটা সুন্দর মসজিদ দন্ডায়মান ছিল বলে জেমস ওয়াইজ উল্লেখ করেছেন। তার মতে, এটি বাহাদুর গাজী কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে এর আপষ্ট লিপিযুক্ত একটি ফলক বর্তমানে টিকে রয়েছে। কিন্তু লিপিটি কোথায় রক্ষিত এ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ কোন তথ্য উপস্থাপন করেননি।[৫৫] ঈসা খানের ইসলামী চেতনার অন্যতম ভূমিকা ছিল মসজিদ নির্মাণ তারই সাক্ষী এই সব মসজিদ স্থাপত্যেও ইতিহাস।

দেওয়ানবাগ মসজিদ

মুসা খানের পুত্র মনোয়ার খান সোনারগাঁয়ের মদন পুরে বসবাস করতেন। স্থানটি দেওয়ানবাগ নামে পরিচিত। দেওয়ানবাগ মসজিদ হাজিগঞ্জের মসজিদের মত একগম্বুজ বিশিষ্ট। এক সময়ে মসজিদের বারান্দায় তিনটি গম্বুজ ছিল বলে জানা যায়। তিনদিকে তিনটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে। গম্বুজটি স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে নির্মিত। দেওয়ানবাগ মসজিদ মোঘল পূর্ব যুগে নির্মিত বলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মত প্রকাশ করেন। এখানে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। নিকটেই একটি

---

[৫৩] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

[৫৪] হাবিবা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[৫৫] হাবিবা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

উচু টিবি রয়েছে। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অংশে নির্মিত এ মসজিদ সংলগ্ন উচু স্থানে ঈসা খানের কামান পাওয়া গেছে। কামান বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে রাখা হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত স্থাপত্য কীর্তি ছাড়াও ভূইয়াদের শাসন আমলে সেতুও নির্মিত হয়েছিল। সুলতানী আমলে ব্যবহৃত সেতু যেমন, পানাম সেতু পানামের সুত্র সেতু ছাড়াও এসময়ের সেতুগুলোর মধ্যে চাপাতলিল সেতু উৎঘাযোগ্য।[৫৬] ঈসা খান যে শক্তিশালী মুসলিম বীরপুরুষ ছিলেন তার একটি প্রমাণ দেওয়ানবাগ মসজিদ যে মসজিদের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে ইসলামী সংস্কৃতির উন্নতি লাভ করে।

রাজাবাড়ি মঠ স্থাপত্য

শ্রীপুরের জমিদার চাঁদরায় ও কেদাররায়ের একটি উল্লেখযোগ্য র্কীতি রাজা বাড়ির মঠ। এটি গঙ্গার বাঁ তীরে এবং তৎকালীন শ্রীপুর শহর হতে সামান্য দূরে অবস্থিত। রাজাবাড়ির মঠ একটি চর্তুকোনী টাওয়ার। এর বর্গাকার ভিত্তির প্রতিটি বাহুর পরিমাপ ২৯′.০″। ভূমি হতে ৩০′.০″ উচ্চতা পর্যন্ত দেয়াল বিভিন্ন ধরনের ইটের মাধ্যমে সৃষ্ট ফুলের অলংকরণ দ্বারা শোভিত। আর প্রতিদিকের মধ্য ভাগ প্রক্ষিপ্ত এবং পাজবাকৃতির। দেয়ালের পুরুত্ব ১১′.০″। এখানে ব্যবহৃত ইটসমূহের পরিমাপ ৫″×৮″×১″.৫″ যা সমকালীন মুসলিম ইমারতের ব্যবহৃত ইট হতে বৃহদাকৃতির। মঠটির চূড়ায় একটি বৃহদাকৃতির গোলক স্থাপন করা হয়েছে।

শিরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই মঠটি যেহেতু গভীর জঙ্গল ও জলাভূমিতে অবস্থিত যেহেতু বর্তমানে লোকজনের যাতায়াত নেই। রাজা বাড়ির মঠের উত্তর কেশব মাকা দীঘি নামে একটি বৃহৎ জলাশয় রয়েছে। চাঁদরায়ের কোন এক ক্রীতদাসির নামানুসারেই দীঘির নামকরণ হয়েছিল বলে জানা যায়। পদ্মনদীর দক্ষিণে আড়া পূলবাড়িয়ায় ভূইয়াদের আবাসস্থলে একখন্ড ভূমি জমি তখন পর্যন্ত কেদার বাড়ি নামে পরিচিত। তবে চাঁদরায় কেদাররায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ অট্টালিকাই পদ্মায় বিলীন হয়েছিল।[৫৭] এ সময় নির্মিত সব স্থাপত্যগুলি স্থপত্যশিল্পের অন্যতম। মুসলিমরা যে শুধু মসজিদ এর মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করে তা নয় সকল ধর্মে প্রতি শ্রদ্ধাশীল এর মাধ্যমেও ইসলামী সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করে থাকে তারই একটি প্রমাণ।

---

[৫৬] হাবিবা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

[৫৭] হাবিবা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন স্থাপত্যে বৈশিষ্ট্যাবলী

ঈসা খানের দীর্ঘ সাইত্রিশ বছর রাজত্বকালীন পুরো সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। বিভিন্ন কারণে মোঘল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকার পরও ঈসা খান বেশ কিছু ইমারত নির্মাণ করেন। তার নির্মাণ করা গ্রামে তার আমলে বেশির ভাগ মসজিদ স্থাপত্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তথাপি ধ্বংসাবশেষ থেকে বেশকিছু মসজিদ স্থাপত্য সম্পর্কে জানা যায়।[৫৮]

সুলতানী স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বাংলা স্থাপত্যকলার এক উৎকৃষ্ট নির্দশনের স্বাক্ষর বহন করে। সুলতানী আমলের পরে বার ভূইয়াদের সংগ্রামী সময়কালে যে সকল স্থাপত্য তৈরী হয়েছে সেগুলোতে স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে মোঘল বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকলেও মোঘল সৌন্দর্য সেগুলোতে পাওয়া যায় নি।

এ সকল স্থাপত্যের প্রধান লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইমারতের অভ্যন্তর অংশে ইট নির্মিত খিলান ও খিলান রূপ। কিন্তু বাহিরের দিকে টিম্পেনাম অংশ উপর দিকে থেকে ভরাট করা ও কাঠের দরজা লাগানোর লিনটেল বা চৌকাঠ রাগানোর মত করে রাখা। অবশ্য এখানে 'লুনেট' ডিজাইনের মত একটা রূপ থাকে। যেমন আছে, জহলবাড়ি প্রাসাদ গৃহে। মুসা খানের মসজিদে ও জঙ্গলবাড়ি মসজিদের সরু মিনার এগুলো সম্ভবত পরে লাগানো জঙ্গলবাড়ি সমজিদের এই গুলি একেবারেই ভিন্ন হয়ে খুলে গেছে। মোঘল প্যারাপো ডিজাইন ও পরবর্তীকালে লাগানো হতে পারে। তবে মোঘল রাজকীয় স্থাপত্যের কুলুঙ্গী ডিজাইন এখানে থাকলেও এগুলো মোঘলরূপী নয়। মিহরাব অলংকার খুবই সামান্য।

দেওয়ানবাগের শাহী মসজিদে, মুসা খানের মসজিদ, অষ্টগ্রাম কুতুবশাহী মসজিদ ও মহজমপুর মসজিদে একই রকম অলংকরণ মিহরাবে দেখা যায়। এসব মেরামতের অলংকরণ বৈশিষ্ট্য নিম্নমানের। মসজিদ অলংকরণে মৃৎফলক ও চিত্রকলা ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৯] ঈসা খান প্রায় বেশীভাগ সময় বাংলাকে স্বাধীন রাখার চেষ্টা মোঘলদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, আর যখনি সময় পেয়েছেন তখনি মসজিদ স্থাপত্য নির্মাণ করেন। যার মাধ্যমে বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন হয়েছে।

---

[৫৮] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

[৫৯] হাবিবা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের সাতটি কামান

বাংলার সামরিক বাহিনীতে গোলন্দাজ বাহিনী প্রথমে কোন সময়ে গঠিত হয়েছিল এ সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, বাংলার সৈন্যরা সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দির শেষদিকে কামান ব্যবহার করতে শিখে।[৬০] ষোড়শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার সামরিক বাহিনীতে গোলন্দাজ বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী রূপে গড়ে ওঠে। বাংলার বার ভুঞাদের মধ্যে ঈসা খান এই ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ঐ সময় ঈসা খানের উৎসাহে তার রাজধানীর আশপাশে সর্বত্র নানা ধরনের কামান তৈরী কার্য দিয়েও তারা বড় বড় কামান তৈরী করত।[৬১] মোঘলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের যুদ্ধের সময় বিশেষ করে এগারসিন্দুরের দূর্গের প্রাচীর থেকে কামান দাগানোর কথা জানা যায়।

ঈসা খানের সাথে মোঘলদের প্রথম যুদ্ধটি হয়েছিল কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার সদরের কাছে কাস্তল নামক স্থানে। কাস্তলের যুদ্ধ মোঘল বাহিনী যে প্রচন্ড কামানের গোলা নিক্ষেপ করেছিল তাতে ঈসা খানের বাহিনীর বিপর্যয়ের কথা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সম্ভবত এর পরেই ঈসা খান একটি শক্তিশালী গোলান্দাজ বাহিনী গঠন করেন এবং বাংলার অভিজ্ঞ কর্মকারদের দিয়ে কামান তৈরীর পদক্ষেপ নেন।

ঈসা খান গোলান্দাজ বাহিনীতে যে সকল কামান ছিল তার কয়েকটির সন্ধান পাওয়া যায় তার পৌত্র মনোওয়ার খানের হাভেলী নারায়ণগঞ্জের দেওয়ানবাগে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ ১২ই ফেব্রুয়ারী দেওয়ানবাগে বসবাসকারী মাওলানা মোজাফফর হোসেনের বাড়ী একটি উচু ভিটায় মাটি কাটার সময় মোট ৭টি কামান পাওয়া যায়। কামানগুলোর মধ্যে দু'টি কামান ঈসা খানের কর্তৃক নির্মিত। অন্য চারটি পিতলের সাহায্যে সম্রাট শেরশাহের আমলের তার কোন রাজকীয় কর্মকর্তার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল বলে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়।

---

[৬০] শ্রীপ্রিয় দর্শন কাঁয, বাংলার সামজিক ইতিহাসের গোড়ার কথা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৮৮, পৃ.২০

[৬১] শ্রীপ্রিয় দর্শন কাঁয, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে ঢাকার ইতিহাস গ্রন্থে যতীন্দ্র মোহনরায় বলেছেন, যেদিন এই কামান অবিস্কৃত হয় এরপর দিন সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত স্বরূপ চন্দ্ররায় মহাশয়। এ বিষয়ে গর্ভনমেন্টকে গোচরীভূত করলে কামানগুলো ঢাকা নগরীতে স্থানান্তরিত হয়।[৬২]

এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, ঢাকার তদানিন্তন ম্যাজিষ্টেট এস এ স্টিনটন এই কামানগুলোর বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য এইচ এই স্পেনেন্টনকে দায়িত্ব প্রদান করেন।[৬৩]

কামানগুলো ছিল বিভিন্ন আকারের ৩′.১০′ থেকে ৫′-০′ লম্বা বিশিষ্ট এবং এগুলোর ওজনের তারতম্য রয়েছে। যা এক থেকে দু মণের মধ্যে পরিমাপ নির্দিষ্ট করা যায়।

স্পেপেলটনের মতে, সম্ভবত কামানগুলো নৌবহরের সাথে ব্যবহার করা হতো। ঈসা খান নামাস্কিত কামানটি গজ (হাতি) বহরের সাথে ব্যবহার করার মতো ছিল বলে ধারণা করা যায়। ঈসা খান বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য যে সব যুদ্ধ করেছেন এবং অস্ত্রহিসেবে কামান ব্যবহার করেন তাই ঈসা খানের কামান।

১ম নম্বর কামান-

কামানের গাত্রে খোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে, কামানটি সম্রাট শেরশাহের রাজত্বকালে সাইয়েত আহমদ রুমি কর্তৃক নির্মিত হয়। কামানটি নির্মাণ তারিখ (৯৪৯ হিজরী) ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ।

কামানটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এইচ,ই স্টেপেলটন বলেন, কামানটিতে উৎকীর্ণ তারিখ দেখে মনে হয় শেরশাহ যে বছর বাংলার প্রশাসক খিজির খান মুরুককে ক্ষমতাচ্যুত করেন। পরের বছর এ কামানটি নির্মিত হয়েছিল। তারিখ-ই-শেরশাহীতে বলা হয়েছে শেরশাহ এ সময় কয়েকজন গর্ভনরের অধীনে বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা অর্পণ করেন।[৬৪] আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে ঐ সময় বাংলাকে ১৬টি সরকারে বিভক্ত করা হয়েছিল।[৬৫] এমতাবস্থায় ধারণা করা যায় যে, সাহীয়েদ আহমেদ রুমি সম্ভবত বাংলার ১৬টি প্রদেশের (জেলার) মধ্যে কোন প্রদেশের (জেলার) শাসনকর্তা অথবা গভর্নর ছিলেন। কামানে ফারসি ভাষায় লিখিত রয়েছে যে, "বাদশাহ শেরশাহের

---

[৬২] যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, শৈগ প্রকাশনা বিভাগ কলকাতা ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৪১

[৬৩] দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, দ্বিতীয়-খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৩, পৃ. ৫৫

[৬৪] এইচ ই স্টেপলটন নোট অন সেভেন মিক্সটিস্থ সেঞ্চুরী ক্যানন্স, রিসেন্টলী ভিসকভড়ি ইনদি ঢাকা ডিষ্ট্রিক, জানাল এন্ড প্রসেভি, অব দি এশিয়ায়িক সোসাইটি অব বেঙ্গল নিউ সিরিজ ভল্যাম-৫, কলকাতা- পৃ. ৩৬৯

[৬৫] আবাস খান,শেরওয়ানী, তারিখ-ই-শেরশাহী, ভল্যাম-২, এস.এস ইমাম উদ্দীন কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনুদিত, ৩ ঢাবি ১৯৬৪, পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

রাজত্বকালীন সময়ে (৯৪৯ হিজরীতে) ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে সাইয়েদ আহমেদ রুমি কর্তৃক এই কামান নির্মিত। পৃথিবীর বুকে শেরশাহ এখনও বিদ্যমান রাজত্ব তার কায়েম থাকুক বর্ধিত হোক সম্মান।[৬৬]

কামানটির পিছনে দিকে চঙ্গির শেষভাগে '×' এই চিহ্নটি পরিলক্ষিত হয়। কামানটি নিচের দিকে তিনটি খোদিত লিপি রয়েছে। লিপিতে ফারসি সিকিস্তা পদ্ধতিতে রিফাত গাজী নাম রয়েছে। স্টেপলটন এ প্রসঙ্গে বলেন, রিফাত গাজী নামক সম্ভবত কামানটির পরিচালক অথবা পরবর্তীকালে এই কামানের সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। আমাদের মতে রিফাত গাজী সিলেটের আনোয়ার গাজীর উর্ধ্বতন বংশের কেউ হবেন। কারণ কামানটির কটিদেশে নিম্নে তরফরাজ্য কথাটি খোদিতই আছে।

উল্লেখ্য যে কামানটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা ইতোপূর্বে আলোচনায় দেখা গেছে, ঈসা খান তরফ অভিযান করেছিলেন এবং তরফ রাজ্য ফতেহ খানকে তিনি পরাজিত করেছিলেন। এই কামানটি যেহেতু ঈসা খানের বসতবাড়ির মাটি খননকালে আবিষ্কার হয়েছে সেহেতু স্পষ্টভাবে অনুমাণ করা যায় যে, এই কামানটি ঈসা খান তরফ রাজাকে পরাজিত করে অধিকার করেছিলেন।

২ নম্বর কামান-

দ্বিতীয় কামানটির শীর্ষ দেশে লেখা রয়েছে 'সরকার মাবুখান' কামানটির আদেশে বাংলায় ১ লিখা আছে। অনুমান করা যায় যে এই সংখ্যাটি কামান বহরের নম্বর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কামানটি ডান পার্শে বাংলায় ২/৬ (দু'মন ষোল সের) ওজনের কামনটি লেখা রয়েছে।

৩ নম্বর কামান-

প্রাপ্ত কামানগুলোর মধ্যে এই কামানটি ঐতিহাসিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কামানটিতে খোদিত লিপিতে ঈসা খানের নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। সেই সাথে কামানটি নির্মাণ তারিখ উল্লেখ আছে। কামানটির দৈর্ঘ ৩'.১১'। ঈসা খান এ কামানটি ১০০২ হিজরী অর্থাৎ ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ নির্মাণ করেন। অনুমান করা যায় যে বৎসর সম্রাট আকবর ময়মনসিংকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন এর আগের বৎসর ঈসা খান এই কামানটি নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই কামানটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, ঈসা খানের বাংলা ভাষার প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল এ কামান গাত্রে খোদিত লিপি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কামানটিতে বাংলা ভাষায় খোদিত লেখা নিম্নরূপঃ সরকার শ্রীযুক্ত ঈসা খান মসনদ আলী সন হিজরী ১০০২।

---

[৬৬] আবুলফজল আইন-ই-আকবরী, ভল্যুাম-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

৪ নং কামান-

৩নং কামানের প্রায় অনুরূপ ওই কামানটির দৈর্ঘ্য ৩'.১১'। ওজন ১মণ ৭ সের (এক মন সাত সের) কামানটিতে বাংলা ৪+১২৬ ও ১। ৩ লিখিত আছে। ফারসি ভাষায় যে কথাগুলো খোদিত আছে তা এখন আর বোঝা যায় না।

৫নং কামান-

কামানটি অগ্রভাগ বাঘের মুখের আদলে তৈরী। এই কামানটি সম্ভবত শেরশাহের রাজত্বকালে তৈরী হয়েছিল। কামান বাংলায় নি৩৯১২।। ৮"।। উৎকীর্ণ রয়েছে। ৩৯১ সংখ্যাটিতে কামানের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। +২।।'৮"।। সংখ্যার দ্বারা সম্ভবত কামানটির ওজন বোঝানো হয়েছে। কিন্তু কামানটির প্রকৃত ওজন এক মণ পোনে ২১ সের।

উদ্ধারপ্রাপ্ত ৭টি কামানের মধ্যে এই পাঁচটি কামান ছাড়া আর বাকি দু'টি কামানের কোন বর্ণনা লিখিত নেই। ফলে ধারণা করা যায় বাকি দু'টি কামান ঈসা খানের তরফ রাজ্য ফতেহ খানের সাথে যুদ্ধ করে অধিকার করেন। উল্লেখিত বিবরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে ঈসা খান তরফ রাজ্য থেকে পাঁচটি কামান অধিকার করেন, প্রাপ্ত কামান থেকে যে ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যাচ্ছে তা হলো ঈসা খানের তরফ অভিযানে গ্রহণ করেন এবং তরফের শাসনকর্তা ফতেহ খানকে পরাজিত করে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করে কামানগুলো অধিকার করেন।[৬৭]

---

[৬৭] মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

পৃ.২৪৯-৩০৩

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ক) ঈসা খানের বংশধরগণ
দ্বিতয়ি পরিচ্ছেদ ঃ খ) দেওয়ান বংশের প্রভাব

উপসংহার

ঈসা খানের বংশ লতিকা

পারিশিষ্ট

ঈসা খানের ছবি ও অন্যন্যা মানচিত্র

গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের বংশধরগণ

ঈসা খান মৃত্যুরবণ করেন ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে। ঈসা খানের মৃত্যুর নির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায়নি। আবুল ফজলের একটি বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় মাত্র। আবুল জফল আকবরনামায় বলেন যে, ঐ সময়ের একটি ঘটনা বাংলার একজন ভুস্বামী ছিলেন ঈসা খান। তিনি কিঞ্চিত বিজ্ঞতার পরিচয়দেন কিন্তু ভাগ্যের নিদ্রুলতা বশত দরবারে আসেন নি। তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন।[১] এই বিবরণটি আবুল ফজল লিপিবদ্ধ করেছেন ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ সেপ্তম্বও মাসে। এই বিবরণ অনুযায়ী ঈসা খান সেপ্টেম্বর মাসের কত তারিখ মৃত্যুবরণ করেন, তার কোন স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় নি। ঈসা খানের বংশধরগণের মতে, ঈসা খানের মৃত্যু তারিখটি সব সময়ের জন্যই রসহ্যাবৃত। কারণ ঐ সময় সম্রাট আকবরের পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল ঈসা খানকে মৃত্যু অথবা জীবিত যে কোন প্রকারেই হোক তাকে সম্রাট আকবরের কাছে হাজির করতে হবে। ফলে ঈসা খানের স্বাভাবিক মৃত্যুর পর তার মৃত্যুর তারিখ এবং ঈসা খানের খবর এই তথ্য দু'টি সতর্কতার সাথে গোপন রাখা হয়।[২]

যে সকল তথ্যে ঈসা খানের পুত্র সন্স্থানদের নাম পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হয়বত নগর ও জঙ্গলবাড়িতে ঈসা খানের বংশধরদের নিকট রক্ষিত বংশ লতিকায়, সমসাময়িককালে ইতিহাস গ্রন্থ বাহারিস্থান-ই-গায়েবী স্বপ্রচন্দ্র রায়ের 'সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস' এবং 'দেওয়ান আদম খান' নামক পুস্তক।

১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ ঈসা খানের স্বাভাবিক মৃত্যুর পর ভাটিরাজ্যের অধিপতি হিসেবে সোনারগাঁয়ের সিংহাসনারোহন করেন ঈসা খানের জ্যেষ্ট পুত্র মুসা খান। তিনি পিতার মত মসনদ-ই-আলা উপাধি ধারণ করেছিলেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপ্রতি সুবেদার ইসলাম খাঁ চিশতী ক্রমাগত আক্রমণ পরিচালনা করে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ রাজ্যে অধিকার করেন। ফলে মুসা খান ও তার মৈত্রীজোটে অংশগ্রহণকারী মুসলমান জমিদারগণ ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এ প্রসেঙ্গ সমসাময়িক ঐতিহাসিক মির্জা নাথান তার 'বাহারিস্থান-ই-গায়েবী' গ্রন্থে বলেছেন যে, মুসা খান শাহীবাহিনীর অসংখ্য বিজয় দেখে যুদ্ধের সমস্ত আশা ত্যাগ

---

[১] আল্লামা আবুল ফজল আকবরনামা, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪০

[২] এই তথ্যটি জানিয়েছেন ঈসা খানের ১৪তম জঙ্গলবাড়ির দেওয়ান আমিন দাদ খান ও মোশাররফ হোসেন শাহজান-ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

করেন। শাহী কর্মচারীরা তাকে আত্মসমর্পন করা ভিন্ন নিজের নিরাপত্তার আর কোন পথ দেখতে পাননি। ইসলাম খানের অনুমোদনক্রমে তিনি তার জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকল ভ্রাতা এবং মিত্র জমিদারদের নিয়ে ইসলাম খানের নিকট আত্মসর্মপন করেন।[৩]

আত্মসমর্পন করার পর মুসা খান ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ইসলাম খানের দির্দেশ বাগে মুসা খান[৪] নজর বন্দি করে রাখা হয়। বাহারিস্থানের বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, এরপর সুবেদার ইসলাম খান, মুসা খানের সাথে সুস্পর্ক গড়ে তোলেন। ফলে মুসা খান ও তার মিত্র জমিদারগণ কুচবিহার কামরূপ আসাম ও ত্রিপুরায় মোঘল অভিযানে ইসলাম খানকে তার পরাগনা সমূহ জায়গীর হিসেবে প্রদান করেন। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দ দিকে মুসা খান মৃত্যু বরণ করেন, তাকে বাগে মুস খান দাফন করা হয়। মুসা খানের সমাধিটি এখন দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মুসা খান ছিলেন একজন প্রজাদরদী শাসক। তিনি একটি সংগঠিত প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুসা খানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হাজী শামসুদ্দীন বাগদাদী, খাজা চাঁদ নামে একজন মন্ত্রীর কথাও জানা যায়। মুসা খানের সেনাপতি ছিলেন আব্দাল খান। নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন রামাই লস্কর ও জানকী বল্লক বলহাম।[৫]

এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মতিউর রহমান তার 'দেওয়ান ঈসা খাঁ' গ্রন্থে বলেন, সোনাকান্দার যুদ্ধে রায়নন্দিনী সোনামনির (আলী নেয়ামৎ খানমের) শোচনীয় মৃত্যু ও ফতেহ জঙ্গপুরের যুদ্ধের পর কতিপয় বৎসর শক্তিতে অতিবাহিত হল। মোঘল সম্রাট আকবরের অন্তিমকালে রাজকুমার সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণা করত সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এদিকে তার ভ্রাতা খসরু পাঞ্জাব প্রদেশে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীয়ন করেন। এই দৃশ্য বিশৃঙ্খলার সংবাদ প্রচারে এ দেশেও চাঞ্চ্যলের সৃষ্টি হয়। সুযোগ বুঝে ঈসা খানের পুত্র দেওয়ান মুসা খান ও মুহাম্মদ খান মস্তক উত্তোলন করলেন। কিন্তু অচিরেই বাদশাহী সেনাদলের হস্তে পরভূত হয়ে বর্শতা স্বীকারে বাধ্য হলেন। ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দ হুগলী বন্দরে পর্তুগীজ বণিকগণের সুবৃহৎ বাণিজ্যকুঠি বিদ্যমান ছিল। তারা সুযোগ পেলেই স্থানীয় অধিবাসিগণের সর্বস্বলুণ্ঠন ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেযে অধিবাসিগণকে অপহরণ পূর্বক অন্যত্র দাসরুপে

---

[৩] মীর্জা নাথান, 'বাহারিস্থান ই-গায়েবী' প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

[৪] বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে যে স্থানটিতে অবস্থিত সেই স্থানটিতে বাগে মুসা খান নামে খ্যাত। এই স্থানটিতে মুসা খানের প্রাসাদ বাড়ি অসংখ্য দালানকোটা ছিল। কাজর্নহল তৈরীর সময় দালান কোটাগুলো ধ্বংস করা হয়। শুধুমাত্র মসজিদটি টিকে থাকে।

[৫] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, ঈসা খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩,

বিক্রি করত। এই সমস্ত অত্যাচার কাহিনী সম্রাট শাহজাহানের কর্ণগোচর হলে তার আদেশে বঙ্গের সুবেদার কাসেম আলী খাঁর পুত্র এনায়েৎ উল্লা খাঁ ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দ স্থল ও জলপথে হুগলী বন্দর অবরোধ ও পর্তুগীজ কুঠি অধিকার করত:৪০০০ পর্তুগীজ নর-নারীকে বন্দীঅবস্থায় আগ্রায় প্রেরণ করেন। অবশিষ্ট পর্তুগীজরা পলায়ন পূর্বক প্রাণরক্ষা করল। এই অভিযানে দেওয়ান মুসা খানের পুত্র মাসুম খান মোঘল নৌবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন।[৬]

১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ আসামরাজ কর্তৃক এগারসিন্দুর লুণ্ঠনের সংবাদ পেয়ে মাসুম খা স্বীয় ২৫টি রণতরীসহ মোঘল নৌবাহিনীর সঙ্গে এগারসিন্দুরে উপনীত হন। যুদ্ধে আসামরাজ পরাভূত হয়ে স্বরাজ্যে পলায়ন করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ প্রবল ঝটিকা প্রভাবে বঙ্গপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা প্রবিষ্ট হয়ে নিম্নবঙ্গের প্রায় দুই লক্ষ্য লোকের প্রণানাশ করল।[৭]

শিক্ষা ক্ষেত্রে ঈসা খানের ন্যায় মুসা খান পিতার পথ অনুসরণ করেন। বাংলা ভাষার মর্যাদার সাথে সংগতি রক্ষা করে সাহিত্য রচনায় বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে তিনি উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শব্দরত্মকরী নামে একটি সংস্কৃত অভিযান প্রণয়নে তৎকালীন পন্ডিত নাথুরেশকে মুসা খান পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।[৮] নাথুরেশ ছিলেন মুসা খানের দরবারের একজন পন্ডিত ব্যক্তি।

মুসা খানের মৃত্যুর পর তার ১৯ বছর বয়স্ক মাসুম খান পিতার জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। এ সময় বাংলার সুবেদার ছিলেন ইারাহীম খান ফতেহ জং। মির্জা নাথান বলেন যে, সুবেদার ইব্রারহীম খান ফতেহ জং বালক জমিদারের প্রতি খুবই স্নেহ পরায়ণ ছিলেন। বাংলার এই সুবেদার ছিলেন সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ভাই। কথিত আছে মাসুম খাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সুবেদার ইব্রাহীম খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে বাদশাহী সনদ এনে দেন।[৯]

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দ দিকে মাসুম খান তৎকালীন বাংলার সুবেদার কাসিম আলী খান জুইনী ও তার পুত্র এনায়েত উল্লাহ খানের সাথে হুগলী বন্দরে অবস্থিত পর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠি আক্রমণ করে পর্তুগীজ জলদস্যু এবং অত্যাচারী পুর্তগীজ ব্যবসায়ীদেরকে বন্দী করেন। এই অভিযানে মাসুম খান মোঘল নৌবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন।

১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ বাংলার সুবেদার ইসলাম খান মাশহাদী এর শাসনামলে আসামের অহম রাজ্যের সঙ্গে কামরূপ অধিকার নিয়ে সংঘাত বাঁধে। অহম রাজ প্রায় ৫০টি রণতরী নিয়ে বাংলার

[৬] মোহাম্মদ মাতিউর রহমান, 'দেওয়ান ঈসা খাঁ', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৭] ঐদুনাথ সরকার 'হিস্টরী অব আওরঙ্গজেব' খন্ড ১১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

[৮] এম এ রহিম বাংলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

[৯] মোহাম্মদ মাতিউর রহমান, 'দেওয়ান ঈসা খাঁ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

বিখ্যাত দূর্গ এগারসিন্দুর আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ঐ সময় আহমরাজকে প্রতিহত করার জন্য মাসুম খান মোঘল বাহিনীর সাথে প্রায় পচিশটি রণতরী নিয়ে এগারসিন্দুরে উপণীত হন এবং আহমরাজকে পরাজিত করে আহমাদের দিকে বিতাড়িত করেন। সামসউদ্দীন আহমেদ তার 'ইন্সক্রিপশান অব বেঙ্গল' গ্রন্থের বলেন, এগারসিন্দুরে অবস্থিত শেখ সাদী মসজিদটি মাসুম খানের সময় নির্মাণ করা হয়েছিল।[১০]

মাসুম খান কত সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এর কোন তথ্য এখন আর জানা যায় না। তবে সম্ভবত তিনি সুবেদার মীর জুমলার শাসনামলে মৃত্যুবরণ করেন। এম এ রহিম বাংলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, মাসুম খানের পুত্র মুনাওয়ার খান ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে আরাকানীদের নিকট থেকে চট্টগ্রাম দখলকারী মোঘল বাহিনী দ্বিতীয় সেনাপতি ছিলেন। উল্লিখিত তথ্য থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, মাসুম খান ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। [১১]

আরোও পরিষ্কার করে বলতে হলে, মাসুম খান সম্ভবত কাতরাবো দূর্গেই বসবাস করেন। কারণ কাতরাবো দূর্গ যে স্থানটিতে অবস্থিত ঐ স্থানটি এখনও মাসুমাবাদ নামে পরিচিত। যদিও অনেকে বলেন, মাসুম খান প্রথম থেকেই জঙ্গলবাড়ি দূর্গে বসবাস করেন কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। কাতরাবো দূর্গে তিনি যে বসবাস করতেন তার বহু প্রমাণ রয়েছে। তবে এমনও হতে পারে জঙ্গলবাড়ি ও কাতরাবো উভয় দূর্গে তিনি বসবাস করতেন। মাসুম খানের পুত্র মুনাওয়ার খান সম্ভবত ১৬৬৬ সনের পূর্বে পিতা মাসুম খানের জমিদারীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। ইতোপূর্বে একটি বিবরণে আমরা মুনাওয়ার খান সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ঈসা খানের বংশের দেওয়ান উপাধি সম্ভবত মুনাওয়ার খানের সময়ই শুরু হয়। কথিত আছে মীর জুমলার প্রচেষ্টায় ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেব মুনাওয়ার খানকে দেওয়ানী সনদ প্রদান করেছিলেন। মুনাওয়ার খান কাতরাবো দূর্গ থেকে তার বসতবাটি দেওয়ানবাগে স্থানান্তর করেছিলেন বলে জানা যায়।

স্বরূপচন্দ্র রায়ের সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ঈসা খানের আমলে সোনারগাঁয়ের আশে পাশে যে সকল খাল খনন করা হয়েছিল তন্মধ্যে আকালের খাল ছিল প্রসিদ্ধ। খালটি মৈকুলীর নিকট হাফানীয়ার বিল থেকে শুরু করে নন্দীপুর বিহারের, দেওয়ানবাগ, মদনপুর, ছাদপুর, কাশীপুর, চাপাতলী গ্রামের পাশ দিয়ে কুড়িগাড়ায় পাওয়া শীতলক্ষায় পতিত হয়েছে।

---

[১০] সামস উদ্দিন আহমেদ ইসন ক্রিপসান অব বেঙ্গল ভেল্যুম-৪, বরেন্দ্র রিসার্স মিউজিয়াম, রাজশাহী, ১৯৬০

[১১] এম এ রহিম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, মুহাম্মদ অযাদুজামান ও ফজলে বারি অনূদিত, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

মুনাওয়ার খানের প্রধান রাজস্ব কর্মচারী লালা রাজমল চাপাতলীতে ঐ খানের উপর ইট ও পাথর দ্বারা একটি সেতু নির্মাণ করেন। ঐ সেতুতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বলা হয়েছে।

'মাদনুল আফজাল লালা বাজমল ছাখতারাতে খোদ'

বাহারের নাজাৎ ওয়াযছেরো সেসগোফত তারিখাশ

বগো পুল ছেরাতে চশমায়ে আবে হায়াত।'[১২]

অর্থাৎ মহত্বের খালি বাজমল আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজাতের জন্য এই পুল নির্মাণ করার ১১০২ হিজরী সালে (১৬৯১ খ্রিস্টাব্দ)

মুনাওয়ার খান সম্পর্কে একটি ঘটনার বিবরণ উপস্থাপিত করেছেন মুন্সী রহমান আলী তায়েশ "তাওরীখ-ই-ঢাকা গ্রন্থে"। তিনি বলেন, দেওয়ান বাকী সরকারি রাজস্ব আদায় করার জন্য ঢাকায় ডেকে পাঠান। আদেশ পালন করার জন্য তিনি ময়মনসিংহ জেলার তার বাড়ি থেকে ঢাকার দিকে রওয়ানা হন। বর্তমান নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত সেখানে কদম রসুলের দরগাহ ওখানে পৌছলে তার নৌকায় আগুনের অভাব দেখা দেয়। তিনি মাঝিদেরকে আগুন নিয়ে আসার জন্য বলেন। একজন মাঝি নৌকায় মাস্তুলের উপর উঠে দেখতে পায় যে, নদীর পূর্ব পাড়ের কাছের জঙ্গল থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সেখানে পৌছে সে দেখতে পায় যে, এক বৃদ্ধ ও তার স্ত্রী অত্যন্ত আদরের সাথে একটি পাথরের তক্তার পাশে বসে লোবান পোড়াচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে যে, এই পাথরটি রাসুল করীম (সা.)-এর কদম মুবারকের ছাপযুক্ত পাথর। গত রাত্রে স্বপ্নে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এই পাথরকে যেন এ জঙ্গলে এনে রেখে দেই। দেওয়ানের ঐ ভৃত্য নৌকায় অবস্থানরত মুনাওয়ার খানের নিকট উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করে। মুনাওয়ার খান সেখানে গমন করেন এবং বৃদ্ধকে বলেন, এই পাথরে যে রাসুল্লাহর (সাঃ) আসল কদমের চিহ্ন আছে এর প্রমাণ কি? বৃদ্ধ লোকটি উত্তরে বলেন, আপনি কোন একটি মানত করে দেখুন যদি পুরণ হয় তবে আসল মনে করবেন। দেওয়ান মানত করলেন যদি নাজিমের পক্ষ থেকে ঢাকার সাথে কোন দুর্ব্যবহার বা আমাকে অপমান না করা হয় এবং খাজনা আদায়ের আনুমতি দেওয়া হয়। আর এই শুকনা ডালটি এখানে আবার ফিরে আসার পর তাও সবুজ হয়ে এক পাতা গজিয়ে উটে তাহলেই এই পাথরকে আসল মনে করব এবং যেখানে একটি ঘর নির্মাণ করে পাথরটি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করব। ঢাকায় পৌছে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান যে, নাজিমের পক্ষ থেকে তার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করা হয়নি। বরং তার পদ মর্যাদানুসারে তাকে অতিথেয়তা করা হয় এবং খাজনা আদায়ের জন্য সময় দেওয়া হয়।

---

[১২] স্বরূপচন্দ্র রায়, সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৬

এরপর তিনি পাথরটি স্থানে ফিরে এসে ঐ ডালটি বের করে দেখেন ডালটিও সতেজ হয়ে পাতা গজিয়েছে। মুন্সী রহমান আলী তায়েশ বলেন, এরপর মুনাওয়ার খান একটি দালান নির্মাণ করে পাথরটি সংরক্ষণ করেন। তারপর থেকে এই দরগাহ কদম রসুল নামে প্রসিদ্ধ হয়।[১৩] মুন্সী রহমান আলী তায়েশের উল্লিখিত তথ্য দুটি কয়েকটি কারণে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। প্রথমত: পাথর এবং ডালে পাতা গজানোর সংক্রান্ত ঘটনাটি অলৌকিক যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করা কষ্টসাধ্য। তাছাড়া কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে তিনি এটি উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত: দরগাহ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তার বর্ণনা ও সঠিক নয়। মির্জা নাথান 'বাহারিস্থান-ই-গায়েবী' গ্রন্থে কদমরসুল দরগাহ এবং কদমরসুল দূর্গের কথা উল্লেখ করেছেন। বাহারিস্তানের রচনাকাল ১৬০৮ থেকে ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আর মুনাওয়ার খানের দেওয়ানী আমল ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এছাড়া ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দ বাংলার সুবেদার শাহাজাদা সুজা কদমরসুল দরগার জন্য ৮০ বিঘা জমি জায়গীর হিসেবে প্রদান করেন। এমতাবস্থায় মুন্সী রহমান আলী তায়েশের কথা সর্বাংশে সঠিক নয় বলে ধারণা করা যেতে পারে।

কদমরসুল দরগাহ সম্পর্কে একটি নতুন তথ্য দিয়েছেন 'Antquities of Dacca' গ্রন্থে আওলাদ হোসেন। তিনি বলেন, যে এক সওদাগর কর্তৃক আরব দেশ থেকে পাথরটি আনীত হয় এবং পদ চিহ্নটি মাসুম কাবুলী খরিদ করে কদমরসুল দূর্গে স্থাপন করেন।[১৪]

মুন্সী রহমান আলী তায়েশ এর আরো একটি ভুল তথ্য তিনি বলেছেন, মুনাওয়ার খান হয়বত নগর থেকে আসছিলেন এটি সাঠিক নয়। কারণ হয়বত নগর পত্তন করেন হয়বত খান। তিনি ছিলেন ঈসা খানের ষষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ। অন্যদিকে মুনাওয়ার খান ছিলেন ঈসা খানের ৫ম অধঃস্তন পুরুষ। সুতরাং ধারণা করা যেতে পারে তিনি জঙ্গলবাড়ি বা দেওয়ানবাগ থেকে আসছিলেন। মুনাওয়ার খান মোঘল সামরিক বাহিনীর সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে যদুনাথ সরকার 'হিষ্টি অব আওরঙ্গজেব' গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ নওয়াব শায়েস্তা খান মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের দ্বারা ঢাকার কাছাকাছি এলাকায় আক্রান্ত হন। এই সময় দেওয়ান মুনাওয়ার খান বাগদিয়া নামক স্থানে জলদস্যুদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।[১৫]

১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ নওয়াব শায়েস্তা খান বঙ্গের সুবাদাররূপে ঢাকায় আগমন করে এ সকল দস্যুকে শায়েস্তা করার জন্য কৃত সংকল্প করেন। তার বালেশ্বরে রণতরীসহ নির্মিত হতে লাগল।

---

[১৩] মুন্সী রহমান আলী তায়ফ, 'তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা' ড. আ.ন.ম. শরফুদ্দিন অনূদিত, ইফা, ১৯৮১

[১৪] আওলাদ হোসেন, এন্টি কুহজ অব ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯ বাহারিস্তান, পৃ. ২৮৮

[১৫] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শহজাহান, "ঈসা খাঁন" প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ মগ ফিরিঙ্গী দস্যুগণ জলপথে ঢাকার নিকটবর্তী হলে দেওয়ান মাসুম খানের পুত্র দেওয়ান মুনাওয়ার খান বাগদিয়া নামক স্থানে লক্ষ্যানদীবক্ষে দস্যুগণের সম্মুখীন হলেন। কিন্তু দস্যুদের হস্তে পরাভূত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। পরের বৎসর নভেম্বর মাসে মোঘল নৌ সেনাপতি আবুল হোসেন ৩০০ রণতরীসহ সন্দ্বিপ অধিকার করেন। অতপর সুবেদারের পুত্র বুজুর্গ ওমেদ খাঁর নেতৃত্বে স্থল সৈন্য ও নৌ সেনাপতি আবুল হুসেনের পরিচালনাধীন ২৮৮টি রণতরী মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের প্রধান আশ্রয়স্থল চট্টগ্রাম বন্দর আক্রমণ ও অধিকার করে (জানুয়ারী ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ) এ সকল যুদ্ধে দেওয়ান মুনাওয়ার খানের স্বীয় নৌ বাহিনীসহ মোঘল পক্ষে বীর-বীক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন।[১৬]

দেওয়ান মুনাওয়ার[১৭] মৃত্যুর পর তার পাঁচ পুত্র ও ঈসা খানের দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ খানের বংশধরগণের মধ্যে ঈসা খানের অধিকারভূক্ত পরগনা কয়েকভাবে বিভক্ত হয়ে যায়।[১৮] এবং তারা স্থলে স্থলে নতুন বাসস্থান নির্মাণ করেন। দেওয়ান মুনাওয়ার খান বর্তমান নারায়ণগঞ্জ টাউনের ৭ মাইল পূর্বোত্তর দিকে অবস্থিত দেওয়ানবাগ[১৯] অবস্থান করেন। তার প্রথম পুত্র আদম খান বাজিতপুর টাউনের ভাগলপুরে চতুর্থ পুত্র লতিফ খান জঙ্গলবাড়িতে এবং ঈসা খানের দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ খানের প্রধানত হয়বত খান কিশোরগঞ্জ টাউনের অন্তর্গত হয়বতনগরের বাসস্থান নির্মাণ করেন। অন্যান্য ভ্রাতাগণকে কোথায় বাস করতেন জানা যায় না। তাদের কোন বংশধর এখন বর্তমান নেই।[২০]

মোশাররফ হোসেন শাহজাহান ঈসা খান গ্রন্থের আলোচনা মতে, মুনাওয়ার খানের জঙ্গলবাড়িতে বসবাস করেন। মুনাওয়ার খানের দ্বিতীয় পুত্র আদম খানের প্রাপ্য অংশ নিয়ে জঙ্গলবাড়ি থেকে বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর থানা সদরের কাছে ভাগলপুর এসে বসতি স্থাপন কারেন। অপরদিকে ঈসা খানের চতুর্থ পুত্র আবদুল্লাহ খান বসবাস করেন সোনারগাঁওয়ের নিকট

---

[১৬] মোহাম্মদ মাতিউর রহমান, 'দেওয়ান ঈসা খাঁ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[১৭] মুনাওয়ার খানের পর থেকে ঈসা খানের বংশের যে ইতিহাস এখানে বিবৃত হয়েছে তার জন্য আমি সম্পূর্ণরূপে তাদের পারিবারিক সূত্রের উপর নির্ভর করেছি। অন্য কোন ঐতিহাতিক সূত্রে এক ঘণ্টার বিবরণ পাওয়া যায় না। পারিবারিক সূত্রের আরেকটি দুর্বলতা হচ্ছে সময়কাল অর্থাৎ কখন এ ঘটনাগুলো ঘটেছে যে, সম্পর্কেও সাম্যক ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়েছে

[১৮] বিগত ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ ১২ই ফেব্রুয়ারী এই দেওয়ান ঈসা খান ৭টি কামান আবিষ্কার হয়েছে। ঐ কামানগুলি বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে

[১৯] তিনি ১৮৫৪ খ্রিস্টব্দ বাঙ্গালার প্রথম লেফটেনান্ট গর্ভণর পদ নিযুক্ত হন

[২০] মোহাম্মদ মাতিউর রহমান, 'দেওয়ান ঈসা খাঁ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

দেওয়ানবাগে। ঈসা খানের পারিবারিক এই ধারা বিভক্তিটি সম্ভবত সম্রাট আওরঙ্গজেবে রাজত্বকালে হয়েছিল। ঈসা খানের পারিবারিক ইতিহাসে একটি দুর্যোগ নেমে আসে নবাব মুরশিদ কুলিখানের সময়। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দ নবাব মুরশীদ কুলি খান মোঘল রাজত্ব তালিকা তৃতীয় বারের মত সংস্কার ও পুন:গঠন করেন। এ রাজত্ব বন্দোবস্তের কারণে অনেক জায়গীর ভূমি ও বাদশাহী এমদাদ ওয়াগোজাস্ত (বাদশাহী লাখেগজ ভূমি) খাস হয়ে যায়। অনেক পুরাতন জমিদার এই রাজত্ব বন্দোবস্তের কারণে উৎখাত হয়ে যায়। ফলে ঈসা খানের বংশধরদের দ্বারা পরিচালিত আলেপশাহীর, মোমেনশাহী, জাফরশাহী, জৈনশাহী, নূসরতশাহী প্রভৃতি পরগনাসমূহ ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে দিকে ঈসা খানের বংশধরদের হাতে ছাড়া হয়ে যায়। বড় দুটি পরগনার মধ্যে মোমেনশাহী ইজারাদার নিযুক্ত হন, মুরশীদ কুলি খানের কর্মচারী শ্রীকৃষ্ণ নামে একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। আর জাফরশাহী পরগনার জমিদারি লাভ করেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র চাঁদরায়। পরবর্তীকালে মুক্তাগাছায় মহারাজা হিসেবে পরিচিত, শ্রীকৃষ্ণ আচার্য আলেপশাহী পরগনার রাজত্বের জমিদার নিয়োগ হন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুনাওয়ার খানের পাঁচ পুত্রের মধ্যে মাসুম খান, লতিফ খান, মহব্বত খান এবং শরীফ খান জঙ্গলবাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। মুনাওয়ার খানের পুত্র শরীফ খানের পঞ্চম অধঃস্তন এলাহীদাদ খানের জমিদারী গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেস্টিংয়ের আমলে রেভিনিউ বোর্ড কর্তৃক বাজেয়াপ্ত আইনের বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই সংবাদ পাবার সাথে সাথে এলাহীদাদ খান মৃত্যবরণ করেন। তার পুত্র রহিমদাদ খান তৎকালীন রেভিনিড বোর্ডের মেম্বার স্যার ফ্রেডারিক হলিডের নিকট গমন করে বক্তব্য পেশ করেন। ফলে তাদেরকে বার্ষিক ৭০০০ টাকা বৃদ্ধি এবং লাখেরাজ জায়গীরের অর্ধেক অংশ ফিরিয়ে দেয়া হয়। এই ফেরত প্রাপ্ত ভূমি মোমেনশাহী কালেক্টরীতে ২২,২৩ ও ২৪ নম্বর বাদশাহী এমদাদ ওয়াগোজাস্তব লাখোরাজ মহল নামে পরিচিত।

পরবর্তীকালে ঐ মহলটি এলাহিদাদ খানের দুই পুত্র করিমদাদ খান এবং রহিমদাদ খানের মধ্যে হিস্যা অনুযায়ী কন্টন করা হয়। দেওয়ান রহিমদাদ খান একজন বিজ্ঞপন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেওয়ান পরিবারের ইতিহাস বর্ণনার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বেশ কয়েকজন পন্ডিত ব্যক্তিকে জঙ্গলবাড়িতে নিয়োগদান করেন। তিনি একজন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি স্বহস্তে সুন্দর হস্তিদন্তের মূর্তি নির্মাণ করতে পারতেন। সেতার এস্রাজ, বাণী এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হস্ত লিখন বিদ্যায়ও তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। রহিমদাদ খানের মৃত্যুর পর তার কোন সন্তান না থাকায় ঐ জায়গার ভূমি করিমদাদ খানের দুই পুত্র আজিমদাদ খান এবং ছোবহানদাদ খানের মধ্যে বণ্টিত হয়। সোবাহানদাদ খানের ঋণের দায়ে ঐ লাখেরাজ সম্পত্তির অর্ধাংশ বিক্রি করে দেন। বাকি অংশ তখনও তার ভাই আজিমদাদ খানের

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। আজিমদাদ খান একজন সৎচরিত্র ও প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তার একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন ধনবাড়ির বিখ্যাত জমিদার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী।

ঈসা খানের দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ খান ও জঙ্গলবাড়িতেই বসবাস করতেন। আর তার দুই পুত্র দেওয়ান আহম্মদ খান এবং দেওয়ান ছিলেন নি:সন্তান। এওয়াজ মোহাম্মদ খানের পৌত্র হয়বতদাদ খান তার প্রাপ্য অংশ নিয়ে কিশোরগঞ্জ শহরের পশ্চিম পার্শ্বে এসে বসতি স্থাপন করেন। স্থানটি তার নিজ নামেই নামকরণ করেন হয়বতনগর।

হয়বতদাদ খানের সপ্তম বংশধর দেওয়ান জিলকদর খান জমিদার হলেও তিনি ছিলেন একজন কামেল দরবেশ। তার হুজরা ও শাজার শরীপে আজও মানুষের শ্রদ্ধা অর্পিত হয়। কিশোরগঞ্জ শহরে পাগলা মসজিদ নামে বিখ্যাত স্থানটিতে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা করতেন বলে জানা যায়। হয়বতনগরের মীর পরিবারে লোকজন পাগলা মসজিদের খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তবে বর্তমানে কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে পাগলা মসজিদ পরিচালিত হচ্ছে।

জিলকদর খানের একমাত্র পুত্র ছিলেন শাহ নেওয়াজ খান। শাহ নেওয়াজ খানের দুই পুত্রের নাম ছিল খোদা নেওয়াজ খান ও নবী নেওয়াজ খান। খোদা নেওয়াজ খানের একমাত্র পুত্র ছিলেন রহিম নেওয়াজ খান। আর নবী নেওয়াজ খানের দুই পুত্রের নাম ছিল খালেক নেওয়াজ খান এবং এলাহি নেওয়াজ খান। খালেক নেওয়াজ খান নি:সন্তান ছিলেন। অপর দিকে রহিম নেওয়াজ খান এবং এলাহি নেওয়াজ খানের ঘরেও কোন পুত্র সন্তান ছিল না। এলাহি নেওয়াজ খানের কনিষ্ঠ কন্যার নাম ছিল আয়শা আক্তার খাতুন। ঐ সময় ঈসা খানের পরিবারের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল জঙ্গলবাড়ির নেওয়াজ রহমানদাদ খানের পুত্র আলীমদাদ খানের সাথে আয়শা আক্তার খাতুনের বৈবাহিক সম্পর্ক। প্রায় দু'শত বছর পর একই পরিবারের দু'টি ধারা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আবারও মিলিত হয়।

দেওয়ান এলাহি নেওয়াজ খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা জামিলা আক্তার খাতুনকে বিয়ে করছিলেন তরফের সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালাহর (রহ.) চৌদ্দতম অধঃস্তন সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। তিনি হয়বতনগর ষ্টেটের আটআনি হিস্যার মালিক হন। পরবর্তী সময় জামিলা আক্তার নি:সন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার হিস্যা থেকে চার আনি হিস্যা কণিষ্ঠ বোন আয়শা আক্তার খাতুনের অনুকূলে চলে যায়। সৈয়দ আবদুল্লাহ পরবর্তী সময় অন্যত্র বিয়ে করেন। এ বংশের সৈয়দ আতিকুল্লাহ ছিলেন একজন কৃতিয়ান পুরুষ। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য। তার কন্যা সৈয়দা ফাতিমাকে বিয়ে করেছিলেন এক সময় পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমান। তার পুত্রদের মধ্যে সালমান এফ রহমান বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত শিল্পপতি।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, জঙ্গলবাড়ী ছোবহানদাদ খানের কন্যা রয়জেস্তা খাতুনকে এবং পরবর্তীকালে হয়বতনগর খোদা নেওয়াজ খানের কন্যা রওশন আরার কন্যা তাবিন্দা খাতুন জ্যেষ্ঠ কন্যা ফরফুন্দা খাতুনকে সৈয়দ ফরফুন্দা খাতুনের পুত্র রবী উল্লাহ ও আতিকুল্লাহ।

পূর্বেই বলা হয়েছে মুনোওয়ার খানের পুত্র দেওয়ান শরীফ খান তার প্রাপ্ত হিস্যা অনুযায়ী মহেশ্বরদী পরগনায় জমিদারী পরিচালনা করছিলেন। এই পরগনাটি সমগ্র নরসিংদী জেলা এবং গাজীপুর জেলার কিছু অংশে বিস্তৃত ছিল। জমিদারী পরিচালনার স্বার্থে এই পরগনার অর্থাৎ নরসিংদীর পারুলীয়াতে এবং নগর মহেশ্বর গ্রামে দু'টি কাচারী বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল।

এক সময় দেওয়ান শরীফ খান আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন। কথিত আছে, এর সন্তানদের হাতে জমিদারীর দায়িত্ব অর্পন করে তিনি পুরুলীয়াতে চলে যান এবং সেখানে আধ্যাত্মিক সাধণায় বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।

পুরুলীয়ার কাচারী বাড়িতে (বর্তমানে দেওয়ান বাড়ি বলে পরিচিত) অবস্থিত একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে একজন নায়েকের কন্যা এর দেওয়ান শরীফ খানের স্ত্রী জয়নব বিবি নীল রং এর তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি নির্মাণ করেন।

দেওয়ান শরীফ খানের স্ত্রী সম্ভবত পুরুলীয়তেই বসবাস করতেন। কারণ মসজিদের পাশেই দেওয়ান শরীফ খানের স্ত্রী জয়নব বিবির সমাধি সৌধ সুন্দর একটি স্থাপত্যকলার নিদর্শন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুনাওয়ার খানের দ্বিতীয় পুত্র আদম খান কুড়িখাই পরগনার জমিদারি পরিচালনার জন্য ভাগলপুরে বসতি স্থাপন করেন। ঐ বংশের দেওয়ান ইব্রাহিম খানের সময় পরগনাটি রাজত্ব অনাদায়ে নিলাম হয়ে যায়। দেওয়ান ইব্রাহীম খান একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি শিক্ষা অনুরাগী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। উপযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা সমগ্র মহাভারতের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করেছিলেন বলে জানা যায়। এই কাজের জন্য তিনি পাঁচ হাজার মুদ্রা ব্যয় করেছিলেন বলে দীনেশচন্দ্র সেন তার ময়মনসিংহ গীতিকা গ্রন্থে ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

দেওয়ান ইব্রাহীম খানের বংশধর দেওয়ান গাউছ খান ভাগলপুরে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মনোরম মসজিদটি নির্মাণ করেন বলে মসজিদে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়। দেওয়ান ইব্রাহীম খানের দৌহিত্র দেওয়ান আহম্মদ রেজা খান একজন কামিল দরবেশ ছিলেন। বর্তমানে ভাগলপুরের দেওয়ানগণ দেওয়ান আহম্মদ রেজা খানের কন্যা অভিকুন্নেছার বংশধর।

পূর্বেই বলা হয়েছে ঈসা খান প্রথম বিবাহ করেছিলেন তৎকালীন তরফের অধিকর্তা সৈয়দ ইব্রাহীম মালেকুল উলামা (র.) কন্যা সৈয়দা ফাতেমা খাতুনকে। তার মৃত্যুর পর ঈসা খান বিক্রমপুরের রাজা চাঁদরায়ের কন্যা স্বর্ণবিবিকে বিবাহ করেন। উল্লেখ্য যে, ঈসা খানের স্ত্রী স্বর্ণাবিবি

ইসলাম গ্রহণের পর অলিনেয়ামত খানম নাম ধারণ করেছিলেন। আদম খান ও বিবাহিম খান নামে তার গর্ভজাত দুই সন্তান প্রথম জীবনে সোনারগাঁয়ে বসাবাস করলেও পরবর্তী সময় সুবেদার ইসলাম শাহের সময় আদম খান সিলেটের ভানুগাছ পরগনায় জমিদারী লাভ করে সেখানে চলে যান। আদম খানের একমাত্র পুত্র ছিল দেওয়ান ফিরোজ খান। বীরাঙ্গনা সখিনা ছিলেন তার স্ত্রী ফিরোজ খানের তিন সন্তান দাউদ খান, করিম খানের তিন সন্তান তাদের হিস্যা অনুযায়ী সম্পত্তি লাভ করে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেন।

জঙ্গলবাড়ি ও হয়বতনগর বসবাসরত ঈসা খানের বংশধরগণ আজও তাদের ঐতিহ্য রক্ষার চেষ্টা করেন। তবে ১৯৫১ সালে জমিদার জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ হয়ে গেলে ভূমি রাজত্বের উপর নির্ভরশীল ঈসা খানের বংশধরদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। তবে পরিবারের অনেকেই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারী অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। যারা শিক্ষিত হতে পারেননি তারা দুদর্শার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে চলেছেন। অনেকের আবার ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন। সাধারণ মানুষ এখনও ঈসা খানের বর্তমান বংশধরদেরকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করেন।[২১]

[২১] মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, 'ঈসা খান' প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৫১

দেওয়ান বংশের প্রভাব

ঈসা খানের বংশধরদের প্রভাব এতদঞ্চলের হিন্দু মুসলমান সমাজে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করে "বল্লালী কৌলিন্য" পুর্বাঞ্চলে প্রবেশ করে নি। দেখায়ানদিগের অধীনে যারা প্রধান কার্য কারকের পদে কার্য করতেন তারা রায় ও যারা নায়েবের কার্য করতেন, তারা চৌধুরী উপাধি পেতেন। এইরূপ নিভিন্ন কার্যের জন্য মজুমদার খাসনাবিশ, কারকুন, শিকদার ৩২ শিলদার, খা, (মহলান বিশ পত্নবিশ চাকলাদার) প্রভৃতি উপাধি প্রদত্ত হত। সমাজে এ উপাধির প্রচুর সম্মান ছিল এবং বংশধরগণকে বর্তিত উপাধি অনুসারে এ সম্মানিত ব্যক্তিগণই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন।[২২]

দেওয়ান বংশের পূর্ব ক্ষমতা ও প্রতিপক্ষ বিলুপ্ত প্রায় হলেও তাদের প্রদত্ত উপাধিসমূহ অদ্যাপি গৌরবের পরিচিত বলে বিবেচিত এবং এতদঞ্চলের হিন্দু ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছিল। কিশোরগঞ্জ টাউনের প্রসিদ্ধ 'শ্যাম সুন্দরের' আখড়ার সেবাইতের গদীনসীনের সময় নবীন মোহান্তের ললাটে দেওয়ান সাহেবের বাম হস্তের কণিষ্ঠাঙ্গুলী টিপচিহ্ন প্রদান করার চিরাচরিত প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত রয়েছে।

কিছুদিন পূর্বেও দেওয়ানের ময়মনসিংহের হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। এমনকি তাদের বিনা অনুমতিতে হিন্দুগৃহে ও দোল দুর্গোৎলব প্রভৃতি পূজা অনুষ্ঠান হত না। কোন আলদ্রকার এবং পরিচ্ছদ ধারণ করতে হলে তাদের অনুমতি নিতে হত। এখনও স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা গৃহবিশেষ নির্মাণ করার জন্য দেওয়ানদের অনুমতি নিয়ে থাকে।[২৩]

---

[২২] মোহাম্মদ মাতিউর রহমান, 'দেওয়ান ঈসা খাঁ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

[২৩] হয়বতনগরের বর্তমান মসজিদ ১২৬২ হিজরীতে (১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত হয়েছে।

উপসংহার

বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে মসনদ-ই-আলা ঈসা খানের অবদান শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটির আলোচনার শেষে, ঈসা খান যদি সেদিন জন্ম গ্রহণ না করতেন এবং মোঘলদের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতেন, তবে আজকের বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি ও স্বাধীন বাংলাদেশ হয়তবা আরও পরে হত। কেননা, ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে তৎকালীন বঙ্গের পূর্বাঞ্চল থেকে ঈসা খান মোঘল সম্রাট আকবরের ক্রমঅগ্রসরমান সামরিক অগ্রাভিযান রুখে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। এই প্রতিরোধ সংগ্রামে ঈসা খানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন তৎকালীন বঙ্গ দেশের এই পূর্বাঞ্চলের আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ভূস্বামীগণ। ঈসা খান ছিলেন তাদের নেতা। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিট্রেনের রাণী রালফ ফীচ নামে একজন দূতকে সম্রাট আকবরের দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি পূর্বে সফর করেছিলেন এবং ঈসা খানের রাজধানী সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন। রালফ ফীচ বর্ণনা থেকে ঈসা খান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসহ এই সত্যটি পাওয়া যায়। ঈসা খানের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল পৈত্রিক সূত্রে সরাইল পরগনার জারগীর পরিচালনার মাধ্যমে। তার পিতা ছিলেন কালিদাস গজদানী নামান্তর সোলায়মান খান।

সোলায়মান খানের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিও ঐতিহাসিক দিক থেকে কম চমকপ্রদ নয়। তিনি শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি বরং তৎকালে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার নিমজ্জিত বাংলার পূর্বাঞ্চলের নিম্নভূমি এলাকায় ইসলামী শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও তাহযিব তামুদ্দিন অনুযায়ী একটি বংশধারারও সূচনা করেছিলেন। দু'টি রাজকীয় রক্তধারা এই বংশটিকে এমনভাবে মহিমান্বিত করেছে, যে রক্তধারা মিলিত হয়েছে সিলেট বিজয়ী হযরত শাহজালাল (র.)-এর সিপাহসারার হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন (র.)-এর পবিত্র রক্ত ধারার সাথে। বৃহত্তর মোমেনশাহীর কিশোরগঞ্জ, বৃহত্তর সিলেট, বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বংশপরম্পরায় আগত এই বংশ ধারার পূরুষগণ অদ্যাবধি বর্তমান। শুধু তাই নয় বিভিন্ন স্থাপত্যকীর্তি যেমন হাভেলী, মসজিদ, দূর্গ, পরিখা, খানকা, আখড়া, বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো ইত্যাদিও মাধ্যমে অদ্যাবধি জাগরুক রয়েছে। এই বংশধারারই প্রধান পুরুষ ঈসা খান মসনদ-ই-আলা যিনি স্বকীয় কৃতিত্বে কেবলমাত্র বাংলার ইতিহাসেই নয় অখন্ড ভারতের মধ্যযুগীয় মোঘল ইতিহাসের একটি অধ্যায়েও স্থান লাভ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বই উল্লেখ করা হয়েছে, ঈসা খানের রাজনৈতিক উত্থান সরাইল পরগনার জায়গীরদার হিসেবে। কিন্তু সাহসিকতা, নেতৃত্বের যোগ্যতা, সাংগঠনিক দক্ষতাসহ অপরাপর বহুবিধ গুণের মাধ্যমে তিনি অচিরেই নিজেকে অঞ্চলের অসংখ্য ক্ষুদ্র জায়গীরদার, পরগনাদার, সামন্ত রাজা ও ভূস্বামীদের সংগঠিত করে তাদের সর্বসম্মত নেতা হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। ঈসা খানের উত্থান ছিল এমনি তাৎপর্যপূর্ণ যে, তাকে মোকাবেলার জন্য মোঘল বাহিনীকে বিপুল শক্তিতে উপর্যুপরি আক্রমণ রচনা করতে হয়েছিল। প্রায় প্রতিটি আক্রমণ অসারধারণ রণকৌশল প্রতিহত করে ঈসা খান অপরাজেয় অবস্থানকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সর্বগ্রাসী মোঘল শক্তির কাছে যখন তাবৎ ভারতেবর্ষেও সুবিশাল ভূ-খন্ড একের পর এক পদানত হচ্ছিল, তখনও সুদূর বাংলার প্রত্যন্ত ভাটি অঞ্চলে নিজেদের স্বাধীন অস্থিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে ঈসা খান যে গৌরবদীপ্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন ইতিহাসে তার মূল্য অপরিসীম। বিশেষ করে শাশ্বত বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ঈসা খান একটি অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার।

তাই জাতীয় জীবনে জাতির উ॥সেসর সন্ধান ও সে সম্পর্কে সচেতনতা জাতীয় উন্নতি অগ্রগতির জন্য পরিহার্য । আমাদের আত্মপরিচিতি ও জাতি সত্তার বিকাশে আমাদের দেশ ও জাতির ইতিহাসে গোড়ার কথা জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। মুসলিম সংখ্যগরিষ্ঠ বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও পরিচিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তা তুলে ধরা খুবই জরুরী বিষয়।

ঈসা খানের জীবন এবং তার সংগ্রামের ইতিহাস আজও বাংলার মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এ অকুতভয় বীর সেনানী মোঘল সম্রাট আকবরের ক্রম অগ্রসরমান সামরিক অভিযানকে প্রতিহত করে বাংলার স্বাধীন সত্তা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হন। আজীবন আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পাশাপাশি তিনি অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত বঙ্গের পূর্বাঞ্চলীয় নিম্নভূমি এলাকায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন করেন যার প্রমাণ তান নির্মিত অসংখ্য মসজিদ। বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলামী সমাজ।

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের বংশ লতিকা

ঈসা খান

Dhaka University Institutional Repository

বংশ লতিকা
ঈসা খানের বংশ ক্রমধারা

বংশ লতিকা-১

রাজা ধনপৎ সিংহ

রাজা বৃপি সিংহ

রাজা অমর সিংহ

রাজা সূর্যদাস সিংহ

রাজা কুবের সিংহ

রাজা বিশ্বনাথ সিংহ

রাজা ঈশ্বর সিংহ

রাজা শ্রীধর সিংহ

ভগীরথ সিংহ | রামদাস সিংহ | কুতুব খান | (১)কালিদাস গজদানী সিংহ[১] নামান্তর সোলেমান খান

(২)ঈসা খান মসনদ-ই-আলা | ইসমাইল খান | কন্যা শাহানশাহ বিবি[২]

১ম স্ত্রী (সৈয়দা ফাতেমা খাতুন)[৩] | ২য় স্ত্রী (অলিনেয়ামত খানম বা স্বর্ণময়ী)[৪]

(৩)মুসা খান | মুহাম্মদ খান | ইলিয়াস খান | আলাআওয়াল খান | আবদুল্লাহ খান | দাউদ খান | আদম খান | বিরহিম খান

---

[১] ঈসা খানের পিতা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাম ছিল কালিদাস সিংহ গজদানী, ইসলাম গ্রহণের পর নাম রাখা হয় সোলেমান খান, দুই ছেলে (১) ঈসা খান, ইসমাইল খান এবং একন্যা শাহানশাহ বিবি।

[২] বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদের বংশধর তাজউদ্দিন গদার সাথে বিবাহ হয়।

[৩] ঈসা খানের ১ম স্ত্রী সৈয়দা ফাতেমা খাতুন যাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ হয় ৫ পুত্র সন্তান,

[৪] ঈসা খানের ২ম স্ত্রী অলিনেয়ামত খানম যাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ হয় ২ পুত্র সন্তান,

Dhaka University Institutional Repository

বংশ লতিকা-১

(৩) মুসা খান

↓

(৪) মাসুম খান

↓

(৫) মুনাওয়ার খান (নারায়ণগঞ্জের দেওয়ান বাগে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন)

↓

(৬) মাসুম খান[৫] | আদম খান[৬] | মোহব্বত খান[৭] | লতিফ খান[৮] | শরীফ খান[৯]

---

[৫] জঙ্গলবাড়ির একটি হিস্যার বংশধরদের পূর্বপুরুষ

[৬] বাজিতপুর থানার ভাগলপুর বংশের পুর্বপুরুষ

[৭] গাজীপুর জেলার মহেশ্বরদী পরগনায় বসবাসকারী বংশের পুর্বপুরুষ

[৮] জঙ্গলবাড়ির অন্য একটি হিস্যার বংশধরদের পুর্বপুরুষ

[৯] জঙ্গলবাড়ির অন্য একটি হিস্যার বংশধরদের পুর্বপুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

জঙ্গলবাড়ি বংশ-১

(৭) দেওয়ান আছালত খান

(৮) দেওয়ান আহছান খান — দেওয়ান এওয়াজ খান — দেওয়ান এনায়েত খান

দেওয়ান এনায়েত খান → দেওয়ান নেওয়াজি খান → দেওয়ান আলী নেওয়াজ খান

(৮) দেওয়ান আহছান খান → (৯) দেওয়ান মনসুর খান — দেওয়ান মাজহার খান

(৯) দেওয়ান মনসুর খান → (১০) দেওয়ান খোদা নেওয়াজ খান

দেওয়ান মাজহার খান → দেওয়ান আলি নেওয়াজ খান

(১১)দেওয়ান ইমান নেওয়াজ খান

(১২) দেওয়ান রহমান দাদ খান — দেওয়ান হেলিম দাদ খান

(১৩) দেওয়ান আলীম দাদ খান[১০] — দেওয়ান কাইয়ুম দাদ খান

(১৪) দেওয়ান মোহাম্মদমান্নান দাদ খান[১১] — দেওয়ান আমিন দাদ খান (জঙ্গলবাড়ি)

(১৫) দেওয়ান মনুয়ার দাদ খান (১)	দেওয়ান মাকসুদা খাতুন (২)	দেওয়ান হালিমা আক্তার খাতুন (৩)	দেওয়ান হান্নান দাদ খান (৪)
দেওয়ান আকলিমা আক্তার (৫)	দেওয়ান ছালেমা আক্তার খাতুন (৬)	দেওয়ান গাইয়ান দাদ খান (৭)	দেওয়ান বারিরা আক্তার (৮)
দেওয়ান ছাত্তার দাদ খান (৯)	দেওয়ান উম্মে ছালেম আক্তার (১০)	দেওয়ান খদা দাদ খান (১১)	দেওয়ান এলাহ দাদ খান (১২)
দেওয়ান জাহের দাদ খান (১৩)	দেওয়ান শুকুর দাদ খান (১৪)	দেওয়ান মরিয়ম খাতুন (১৫)	দেওয়ান সাওদা খাতুন (১৬)
দেওয়ান হাফেছা খাতুন (১৭)	দেওয়ান হুছনা (১৮)	দেওয়ান হাছনা (১৯)	দেওয়ান ছবুর দাদ খান (২০)
দেওয়ান খালেদ দাদ খান (২১)	দেওয়ান ওয়াদুদ দাদ খান (২২)		

(১৫/৯) দেওয়ান ছাত্তার দাদ খান

(১৬) দেওয়ান মুর্শিদা আক্তার খানম চৌধুরানী [১২] (১)	দেওয়ান মোঃ ফাত্তাহ দাদ খান (২)	দেওয়ান মোঃ রউফ দাদ খান (৩)	
দেওয়ান মোঃ রহমান দাদ খান (৪)	দেওয়ান মোঃ জলিল দাদ খান (৫)	দেওয়ান মোঃ আজিম দাদ খান (৬)	দেওয়ান মোঃ জুলফার নাইন দাদ খান (৭)
দেওয়ান জমিলা আক্তার খানম(বর্তমান) (৮)			

---

[১০] জঙ্গলবাড়ির জমিদার আলীমদাদ খান হয়বত নগরের ১৩তম অধঃস্তন আয়শা আক্তার খাতুনকে বিবাহ করে বার আনা হিস্যার জমিদারি অধিকার করেন এবং হয়বতনগরে আরও একটি বংশেরধারার সূচনা করেন।

[১১] দেওয়ান মান্নান দাদ খান সাহেবের সন্তান সংখ্যা ২২ জন।

[১২] জাওয়ার স্টেটের জমিদার ফজলুল করিম খান চৌধুরী বিবাহ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

জঙ্গলবাড়ি বংশ-২

- (৬) শরীফ খান
  - (৭) জাললা খান
  - সুলতান খান
    - (৮) বাহাদুর খান
      - (৯) খোদা দাদ খান
        - (১০) এলাহ দাদ খান
          - (১১) করিম দাদ খান
            - (১২) আজিম দাদ খান
              - (১৩) আজিজ দাদ খান
            - ছোবহান দাদ খান
              - বয়জেন্তা আক্তার খাতুন-স্বামী সৈয়দ আব্দুল্লাহ(সুলতান)
                - উবেদ উল্লাহ
                - আজিজ উল্লাহ
                - মোহাম্মদ উল্লাহ
          - রহিম দাদ খান

জঙ্গলবাড়ি বংশ-৩

- (৬) মহব্বত খান
  - (৭) মুলতিফ খান
    - (৮) আজগর খান
      - (৯) ইমাম বক্স খান
  - মোলায়েম খান

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জঙ্গলবাড়ি বংশ-৪

(১২) হেলিম দাদ খান

(১৩)দেওয়ান গফফার দাদ খান দেওয়ান হাফিজ দাদ খান দেওয়ান কাইয়ুম দাদ খান

(১৪) দেওয়ান হবিব দাদ খান দেওয়ান হাসিব দাদ খান দেওয়ান লালেক্র দাদ খান দেওয়ান জামান দাদ খান দেওয়ান জামাল দাদ খান দেওয়ান সাবির দাদ খান

(১৪) দেওয়ান ছারি দাদ খান দেওয়ান জব্বার দাদ খান দেওয়ান খবির দাদ খান

(১৫) দেওয়ান মোশাররফ দাদ খান

হয়বতনগরের বংশ-১

- (৩)দেওয়ান মোহাম্মদ খান
  - (৪)দেওয়ান আহম্মদ খান
  - দেওয়ান এরয়াজ মোহাম্মদ খান
    - (৫)দেওয়ান হায়াৎ খান
      - (৬) দেওয়ান হয়বত খান[13]
        - (৭) দেওয়ান আবদুল্লাহ খান
          - (৮) দেওয়ান মাসুম খান
            - (৯) দেওয়ান জোলকরণ খান
            - দেওয়ান জেলকদর খান
              - (১০) দেওয়ান শাহনেওয়াজ খান
                - (১১) দেওয়ান খোদা নেওয়াজ খান
                  - (১২) দেওয়ান রওশন আরা, স্বামীঃ সৈয়দ আহসান উল্লাহ
                - দেওয়ান নবী নেওয়াজ খান
                  - দেওয়ান খালেক নেওয়াজ খান
                  - দেওয়ান এলাহী নেওয়াজ খান
                    - জমিলা খাতুন, স্বামী-আঃ বারী
                    - আয়শা আক্তার খাতুন[14]

[13] কিশোরগঞ্জ হয়বতনগরে দেওয়ান সাহেবের পুর্বপুরুষ ঈসা খানের ৩য় অধঃস্তন

[14] জঙ্গলবাড়ির ১৩তম অধঃস্তন দেওয়ান আলমিদাদ খান আয়শা আক্তার কাতুনকে বিবাহ করে হয়বতনগরের বার আনি হিস্যার জমিদারি প্রাপ্ত হন।

হয়বতনগরের বর্তমান বংশ-১

(১৫) দেওয়ান খালেক দাদ খান

- দেওয়ান মান্না আক্তার
- দেওয়ান তানিয়া আক্তার
- দেওয়ান ছামিয়া আক্তার
- দেওয়ান ছালুয়া আক্তার

হয়বতনগরের বর্তমান বংশ-২

(১৬) দেওয়ান ফাত্তাহ দাদ খান
দেওয়ান কামরুন্নেছা স্ত্রী

- দেওয়ান ছবুরুন্নেছা আক্তার খাতুন

হয়বতনগরের বর্তমান বংশ-৩

(১৬) দেওয়ান রউফ দাদ খান
সৈয়দা জাহানারা আক্তার স্ত্রী[১৫]

- দেওয়ান জয়নব আক্তার
- দেওয়ান ফরহাদ দাদ খান
- দেওয়ান মোজোজা আক্তার

[১৫] সিপাহসালার হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন (র.)-এর অধঃস্তন।

Dhaka University Institutional Repository

হয়বতনগরের চার আনি হিস্যার বংশ লতিকা-১

সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ

- সৈয়দ মোহাম্মদ উবেদ উল্লাহ
- সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ
- সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজ উল্লাহ
- সৈয়দ মোহাম্মদ রাজি উল্লাহ
- সৈয়দ মোহাম্মদ আতিক উল্লাহ

সৈয়দ মোহাম্মদ রাজি উল্লাহ:

- সৈয়দ মোহাম্মদ রফিক উল্লাহ
- সৈয়দ মোহাম্মদ খলিল উল্লাহ
- সৈয়দ মোহাম্মদ শফিউ উল্লাহ

সৈয়দ মোহাম্মদ আতিক উল্লাহ:

সৈয়দ মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ ওয়াসিকুল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ ওয়াফিকুল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ সাদিকুল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ খালিকুল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ লাইকুল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ তরিকুল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ শরিকুল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ বাবিকুল্লাহ
সৈয়দ ফাতিমা বানু (নাসিমী)
সৈয়দ হাসিনা আক্তার বানু (নাইমী)
সৈয়দ রাজিনা আক্তার বানু (ফাইমী)

সৈয়দ মোহাম্মদ রফিক উল্লাহ:

সৈয়দ মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল্লাহ (কামার)
সৈয়দ মোহাম্মদ রেজওয়ান উল্লাহ (বাশার)
সৈয়দ মোহাম্মদ রিয়াজত উল্লাহ(জাফর)
সৈয়দ গোলশানারা আক্তার খাতুন
সৈয়দ সাহেদা আক্তার খাতুন
সৈয়দ মাজেদা আক্তার খাতুন
সৈয়দ জুবেদা আক্তার খাতুন

সৈয়দ মোহাম্মদ খলিল উল্লাহ:

সৈয়দ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ (সাগের)
সৈয়দ মোহাম্মদ জাবি উল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ ইকরাম উল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ এনাম উল্লাহ (আজিম)
সৈয়দ মোহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ ইরফান উল্লাহ
সৈয়দ মোহাম্মদ এজবার উল্লাহ
সৈয়দ জাবেদা আক্তার খাতুন
সৈয়দ মনিরা আক্তার খাতুন
সৈয়দ সাকেরা আক্তার খাতুন
সৈয়দ মুমেনা আক্তার খাতুন
সৈয়দ সামছিরা আক্তার খাতুন

হয়বতনগরের চারি আনি হিস্যার বংশের লতিকা-১/১

সৈয়দ মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ

- সৈয়দ মোহাম্মদ সাইফ উল্লাহ(ফয়সাল)
- আবেদ আতাউল্লাহ (ওয়াতেব)

হয়বতনগরের চারি আনি হিস্যার বংশের লতিকা-১/২

সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা উল্লাহ

- সৈয়দ মোহাম্মদ রাফাত উল্লাহ (বাহার)
- সৈয়দ মোহাম্মদ সাকিব উল্লাহ(সাকিব)

হয়বতনগরের চারি আনি হিস্যার বংশের লতিকা-১/৩

সৈয়দ মোহাম্মদ রেজওয়ান উল্লাহ(বাসার)

- সৈয়দ মোহাম্মদ রাজিব উল্লাহ (সজার)
- সৈয়দ মোহাম্মদ রাফিদ উল্লাহ(সামিন)

হয়বতনগরের চারি আনি হিস্যার বংশের লতিকা-১/৪

সৈয়দ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ

- সৈয়দ মোহাম্মদ এনায়েতুল করিম

হয়বতনগরের চারি আনি হিস্যার বংশের লতিকা-১/৫

সৈয়দ মোহাম্মদ জাবি উল্লাহ

- সৈয়দ মোহাম্মদ রাজাব উল্লাহ
- সৈয়দ মোহাম্মদ সাহিদ উল্লাহ

হয়বতনগরের চারি আনি হিস্যার বংশের লতিকা-১/৬

সৈয়দ মোহাম্মদ ইকরাম উল্লাহ

- সৈয়দ মোহাম্মদ সাব্বির উল্লাহ
- সৈয়দ মোহাম্মদ হাসিব উল্লাহ

হয়বতনগরের চারি আনি হিস্যার বংশের লতিকা-১/৭

সৈয়দ মোহাম্মদ এনাম উল্লাহ

- সৈয়দা মারিয়া তারানুম

হয়বতনগরের চারি আনি হিস্যার বংশের লতিকা-১/৮

সৈয়দ মোহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ

- সৈয়দ মোহাম্মদ তানজু উল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ানবাগের বংশ লতিকা-১

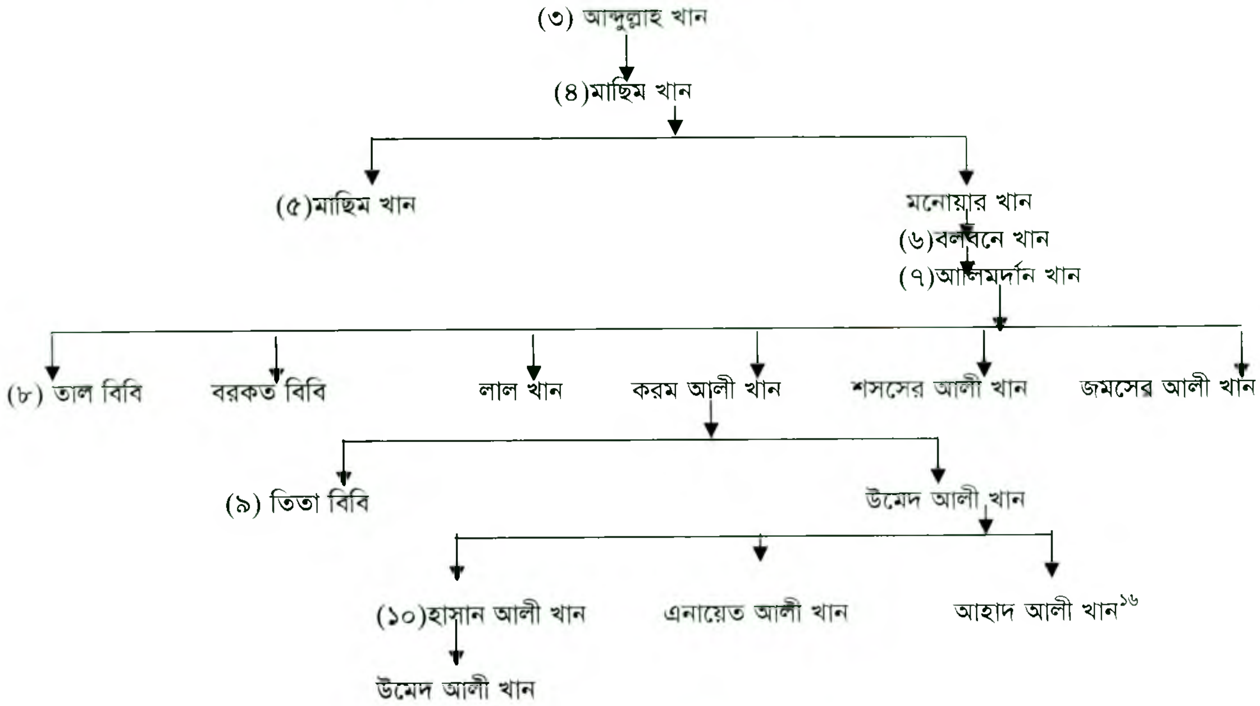

[১৬] স্বরপচজন্দ্র রায় ঃ সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে।

সিলেট বংশ-১

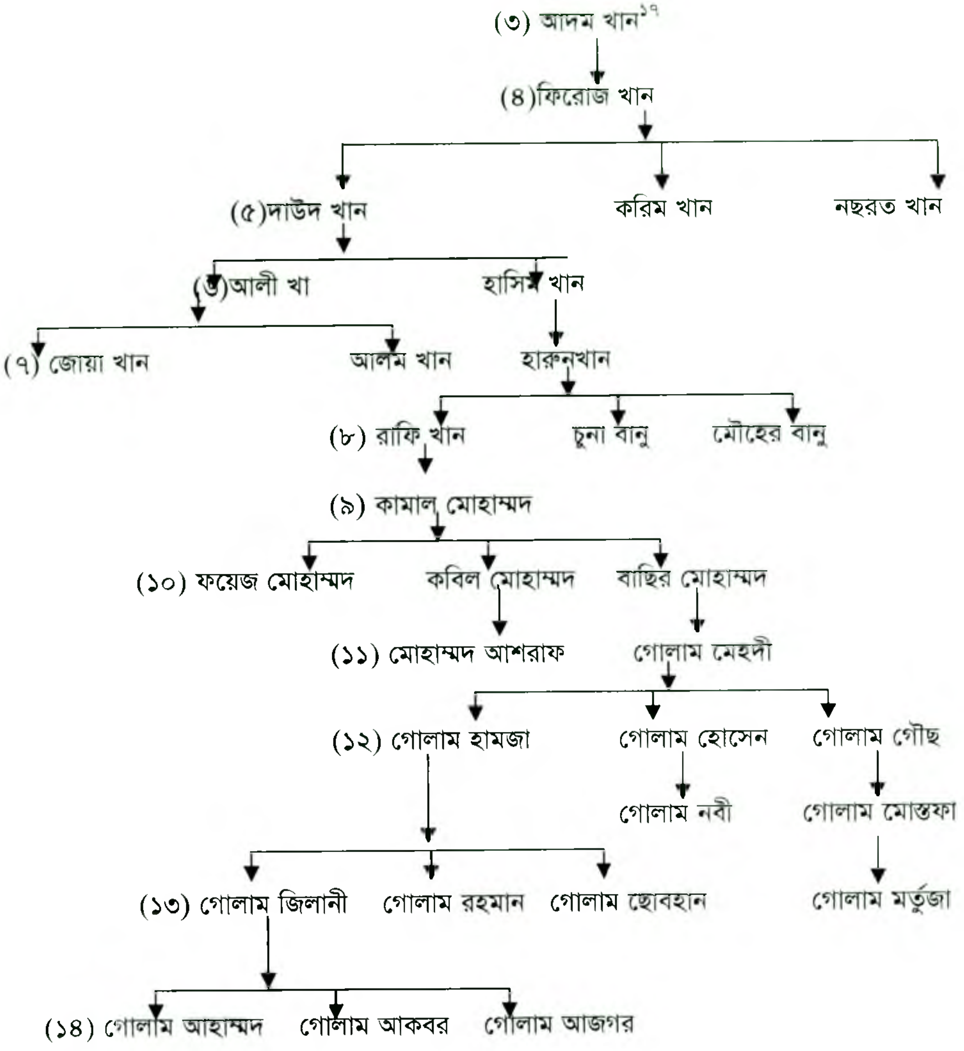

[১৭] ঈসা খানের দ্বিতীয় স্ত্রী আলিনেয়ামত খান(স্বর্ণময়ী) গর্ভজাত সন্তানদের বংশ

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট বংশ-১

(৫) করিম খান

↓

(৬) নাম অজ্ঞাত

↓

(৭) নাম অজ্ঞাত

↓

(৮) নাম অজ্ঞাত

↓

(৯) আলম খান চৌধুরী

↓

(১০) আবিদ রাজা চৌধুরী

↓

- (১১) বাহাদুর রাজা রাজা চৌধুরী
  - ↓ (১২) ৮ জন কন্যা
- সাইস্তা রাজা চৌধুরী
  - ↓ ছানাওয়ার রাজা চৌধুরী
    - ↓ (১৩) তৈমুছ রাজা চৌধুরী
      - ↓ (১৪) ছইফা খানম রাণী
- কারিনা বানু
- ফাহমিদা বানু

Dhaka University Institutional Repository

বাজিতপুর থানার ভগলপুরের বংশ-১

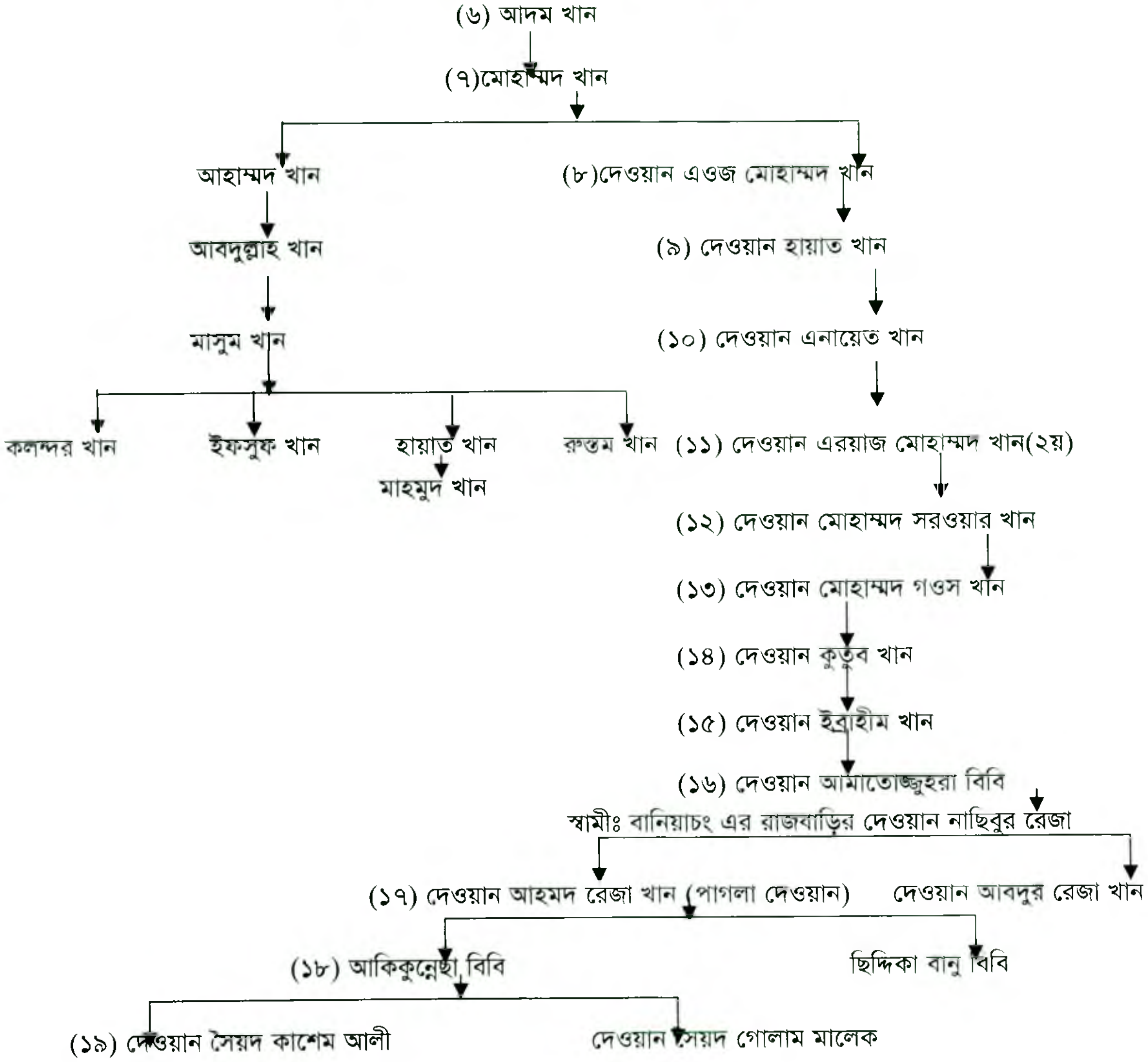

Dhaka University Institutional Repository

ভগলপুরের বংশ-২

(১৯) দেওয়ান সৈয়দ কাশেম আলী

- দেওয়ান সৈয়দ মোহসিন আলী
  - দেওয়ান সৈয়দ আলী সাজ্জাদ
  - আলী আবু নাহার ইবনে আলী
- দেওয়ান সৈয়দ মোস্তফা আলী
  - আলী সাজ্জাদ কায়সার আলী
  - আলী সাজ্জাদ কাওসার আলী
- দেওয়ান সৈয়দ মোহাম্মদ আলী
- দেওয়ান সৈয়দ মাসুদ আলী
  - দেওয়ান সৈয়দ আহামেদ আলী
  - দেওয়ান সৈয়দ মাহবুব আলী

ভগলপুরের বংশ-২/ক

(১৯) দেওয়ান সৈয়দ গোলাম মালেক

- (২০) দেওয়ান সৈয়দ গোলাম হায়দার
  - (২১) দেওয়ান সৈয়দ ওসমান হায়দার
  - দেওয়ান সৈয়দ ইউসুফ হায়দার
  - দেওয়ান সৈয়দ ইসমাইল হায়দার
- দেওয়ান সৈয়দ নূর হায়দার

ভগলপুরের বংশ-২/খ

দেওয়ান সৈয়দ আবু সাজ্জাদ ইবনে আলী

- দেওয়ান সৈয়দ আলী আজাদ
- পাশা দেওয়ান সৈয়দ আলী

ভগলপুরের বংশ-২/গ

দেওয়ান সৈয়দ কায়সার আলী

- সৈয়দ সায়মা আফিয়া
- সৈয়দা সাদিয়া আসিয়া

ভগলপুরের বংশ-২/ঘ

(২১) দেওয়ান সৈয়দ মসনদ আলী

- দেওয়ান সৈয়দ ফাতেহ আলী
- সৈয়দা রাইছা তাছনিম
- দেওয়ান সৈয়দ ফারহান আলী

ভগলপুরের বংশ-২/ঙ

(২১)দেওয়ান সৈয়দ ওসমান হায়দার

- দেওয়ান সৈয়দ জুলফিকার হায়দার সারওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

ভগলপুরের বংশ-২/চ

(২১) দেওয়ান সৈয়দ ইউসুফ হায়দার

↓

- দেওয়ান সৈয়দ ফারুক হায়দার
- দেওয়ান সৈয়দ ফয়সাল হায়দার
- দেওয়ান সৈয়দ ফাহিম হায়দার
- দেওয়ান সৈয়দ ফাহমিদ হায়দার
- দেওয়ান সৈয়দ রবীন হায়দার
- দেওয়ান সৈয়দ আলী হায়দার
- দেওয়ান সৈয়দ ফরহাদ হায়দার

ভগলপুরের বংশ-২/ছ

(২১) দেওয়ান সৈয়দ ইসমাইল হায়দার

↓

দেওয়ান সৈয়দ রুমী হায়দার

ভগলপুরের বংশ-২/জ

(২১)দেওয়ান সৈয়দ আহমেদ আলী

↓

- সৈয়দা মেহনাজ আলী
- সৈয়দা ফারনাজ আলী
  - ↓ সৈয়দা তাহরিম আলী
- দেওয়ান সৈয়দ তানজিন আলী

Dhaka University Institutional Repository

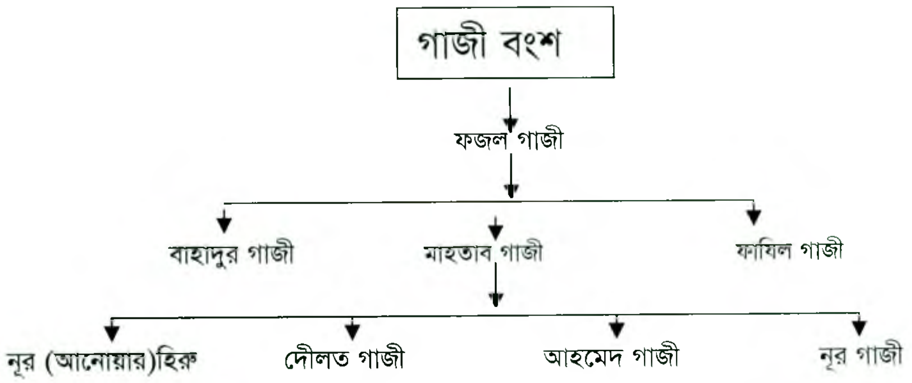

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

মসনদ-ই-আলা বীরে ঈসা খান

Dhaka University Institutional Repository

গিয়াস উদ্দিন আজম শাহর মাজার

Dhaka University Institutional Repository

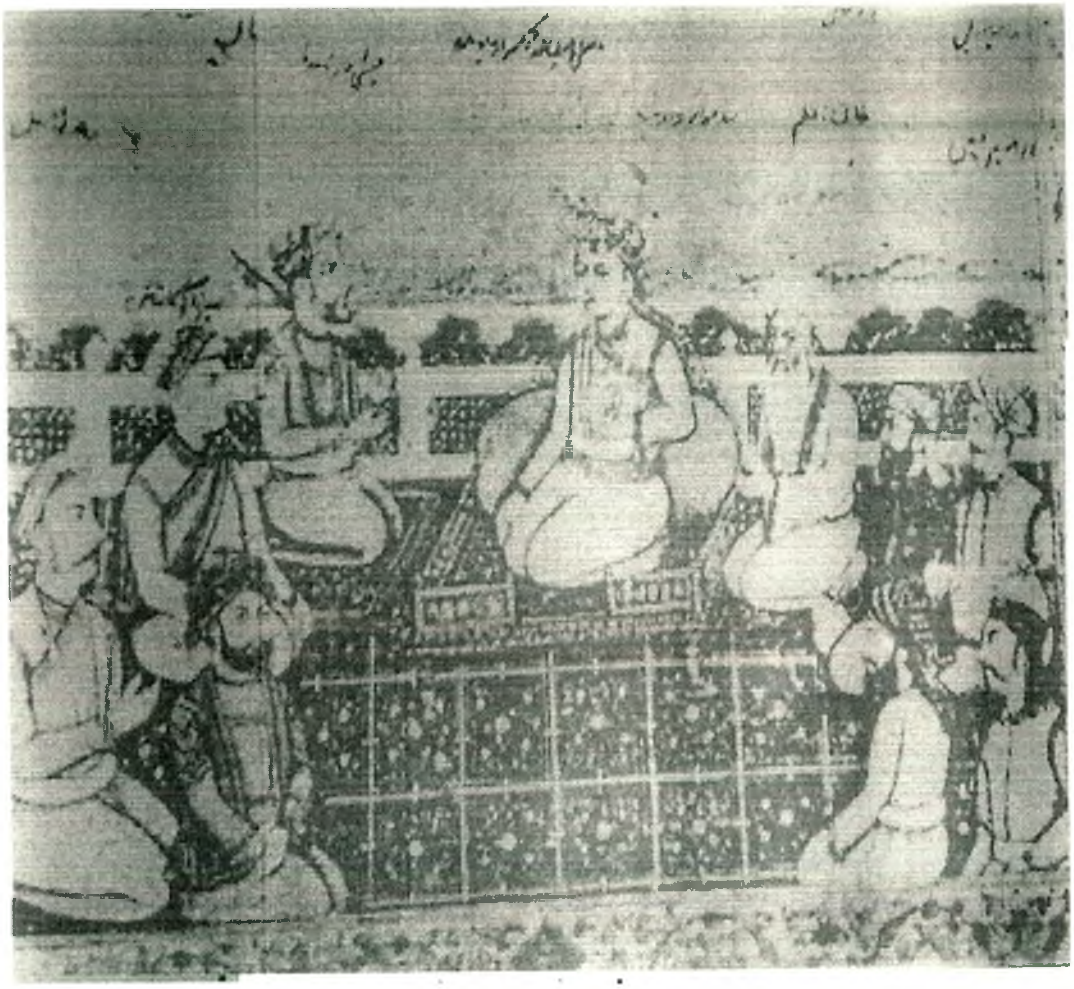

সম্রাট আকবরের দরবারে দেওয়ানে ঈসা খান
সম্রাট আকবরের দক্ষিণ পার্শ্বে দেওয়ান ঈসা খান

Dhaka University Institutional Repository

ইটনা সাহেববাড়ি মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

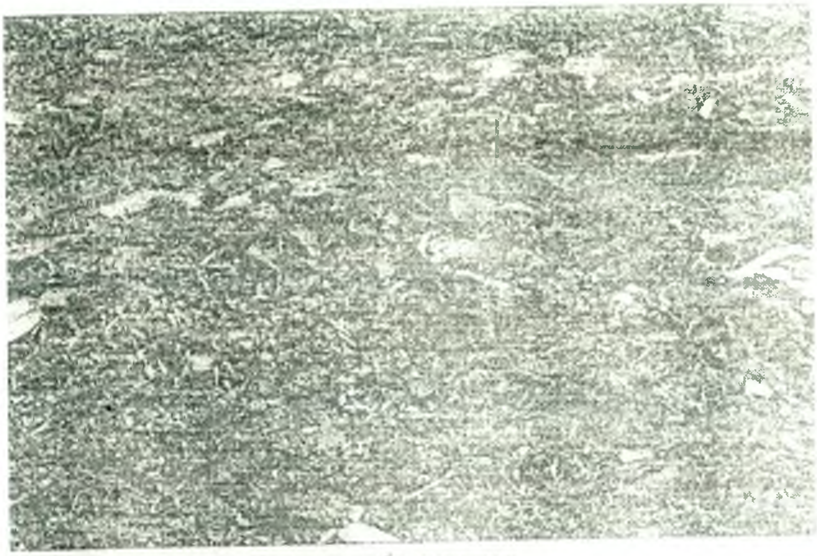

ভূষণা দূর্গের ধ্বংসাবশেষ

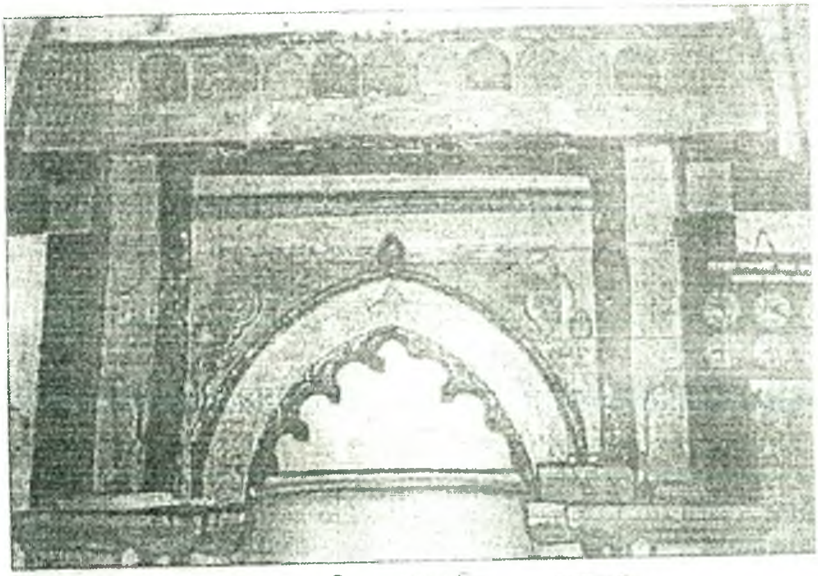

দেওয়ানবাগ মসজিদের প্রধান মিহরাবের অলঙ্করণ

Dhaka University Institutional Repository

মহজনপুর মসজিদের কেন্দ্রীয় মেহরাবের পশ্চৎ অংশের অলঙ্করণ

Dhaka University Institutional Repository

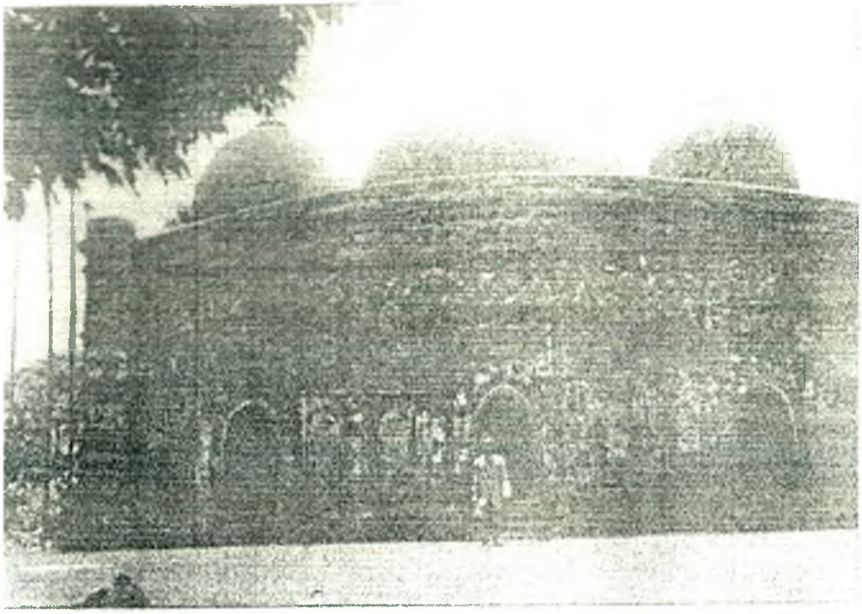

কুতুব শাহী মসজিদ

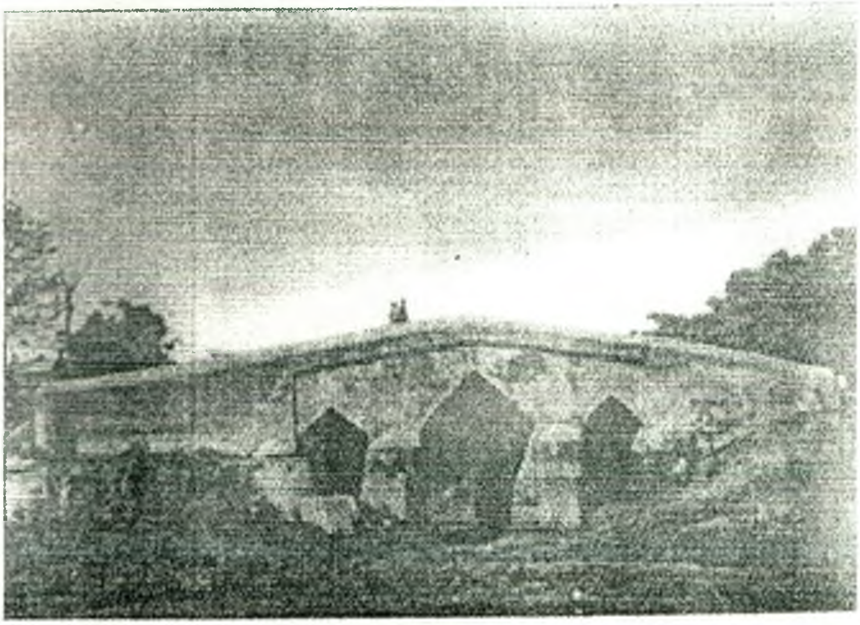

পানামপুল, সোনারগাও

Dhaka University Institutional Repository

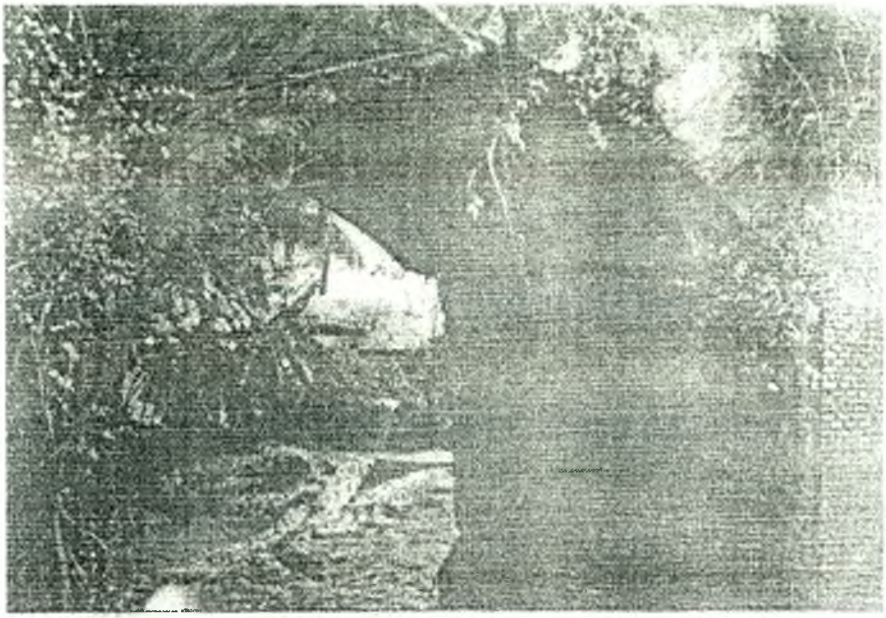
চাঁপাতলীর পুল, মদনপুর, নারায়ণগঞ্জ

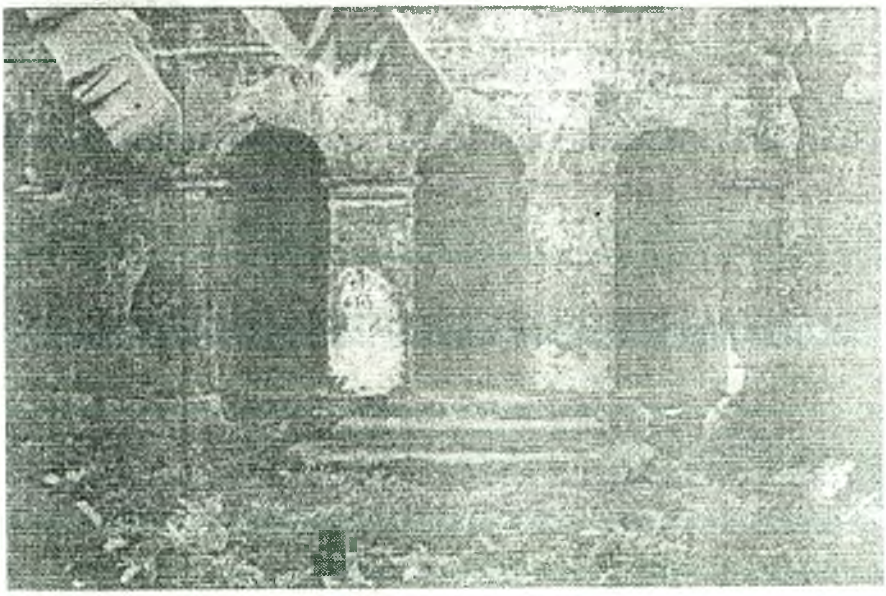
জঙ্গলবাড়ী দর্গের খিলান

Dhaka University Institutional Repository

স্কেচ ম্যাপ—১

গ্রাম—মাসুমাবাদ, থানা—রূপগঞ্জ, জেলা—নারায়ণগঞ্জ

উঃ

ঈসা খানের কাতরাবো দূর্গ

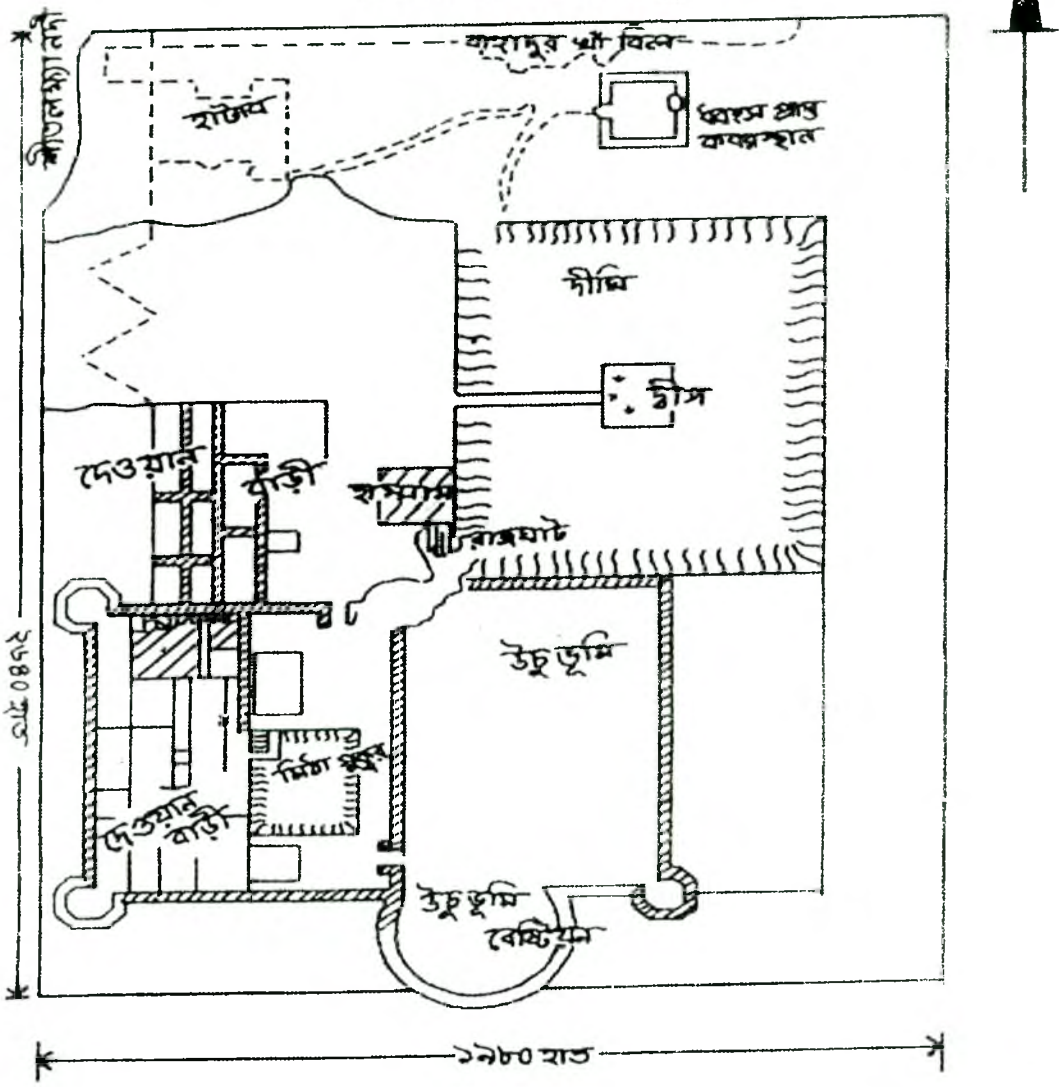

Dhaka University Institutional Repository

স্কেচ ম্যাপ-২
জেমস ওয়াইজ এর মানচিত্রে ঈসা খানের সোনারগাঁও

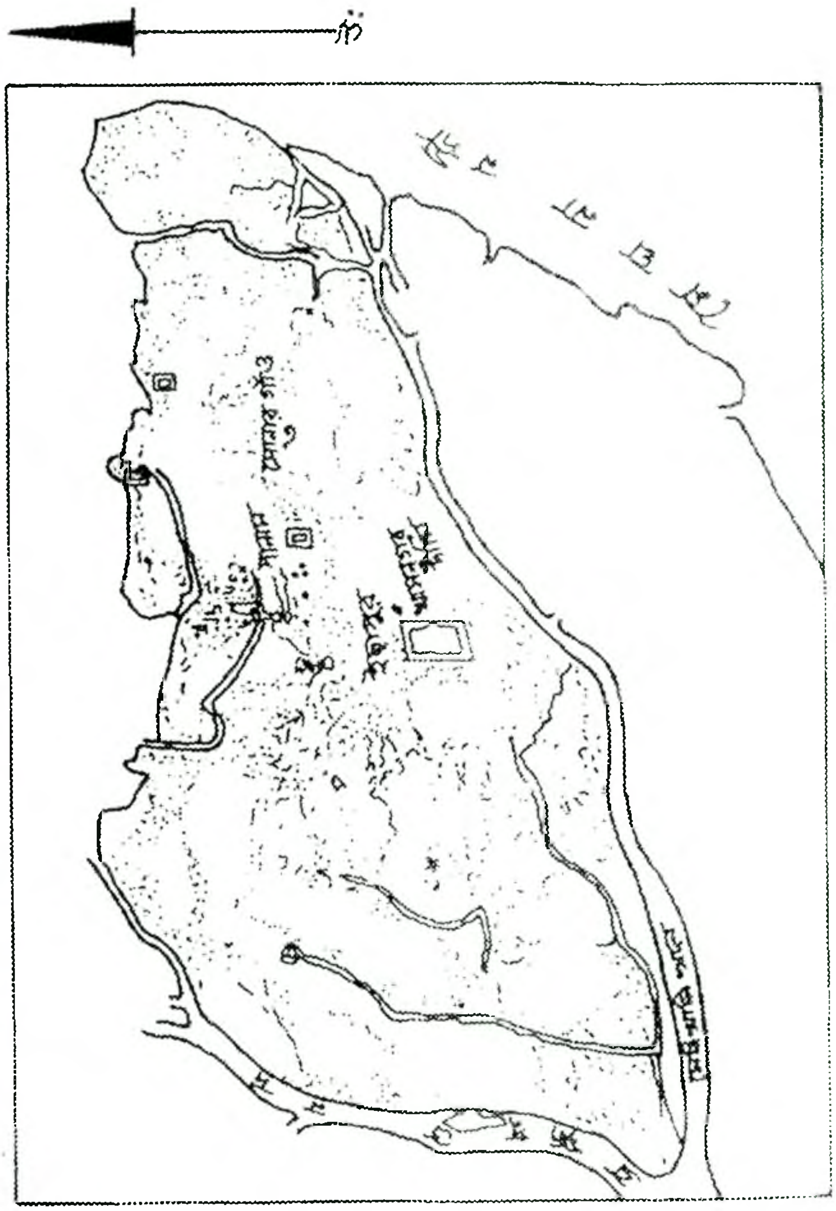

Dhaka University Institutional Repository

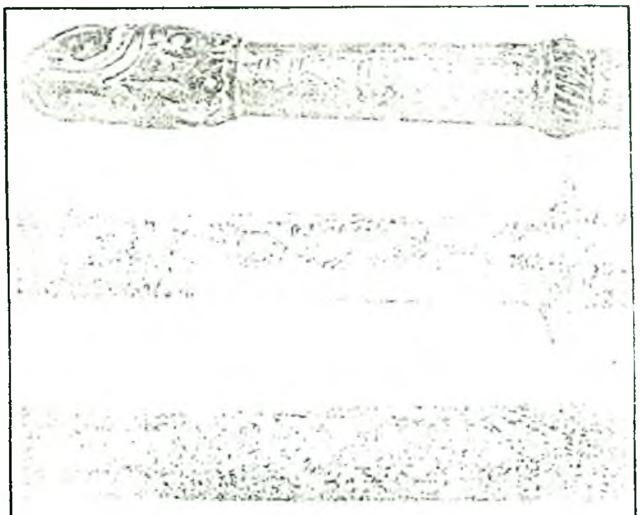

দেওয়ানবাগে প্রাপ্ত ঈসা খানের ৭টি কামানের
মধ্যে একটি কামানে ফরাসী ভাষায় খোদিত লিপি ।

দেওয়ান বাগে প্রাপ্ত
বাংলা ভাষায় ঈসা খানের নাম খোদিত কামান

Dhaka University Institutional Repository

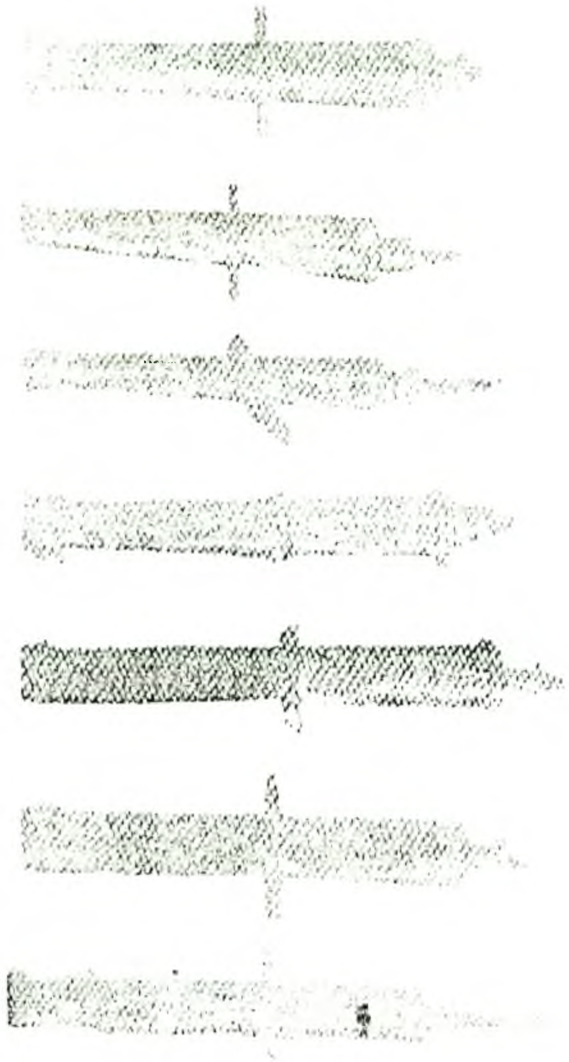

দেওয়ানবাগে প্রাপ্ত ঈসাখানের ৭টি কামান

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আকবরের সাথে ভিন্ন মসনদে বসা ঈসা খান।

ঈসা খানের অধঃস্তন পুরুষ, বিখ্যাত সাধক দরবেশ জিলকদর খার হুজরা ও মসজিদ (পাগলা মসজিদ) কিশোরগঞ্জ।

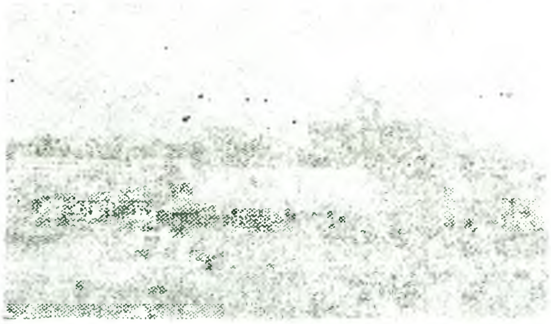

ঈসা খানের বংশধরদের বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর আখড়া, কিশোরগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের ১২তম অধঃস্তন পুরুষ
আজিম দাদ খান

ঈসা খানের সমসাময়িক প্রখ্যাত
ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল ফজল

সম্রাট আকবরের সেনাপতি
রাজা মানসিংহ

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের ৭তম অধঃস্তন পুরুষ হয়বত খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত
হয়বতনগর হাবেলীর দরবারগৃহ, কিশোরগঞ্জ

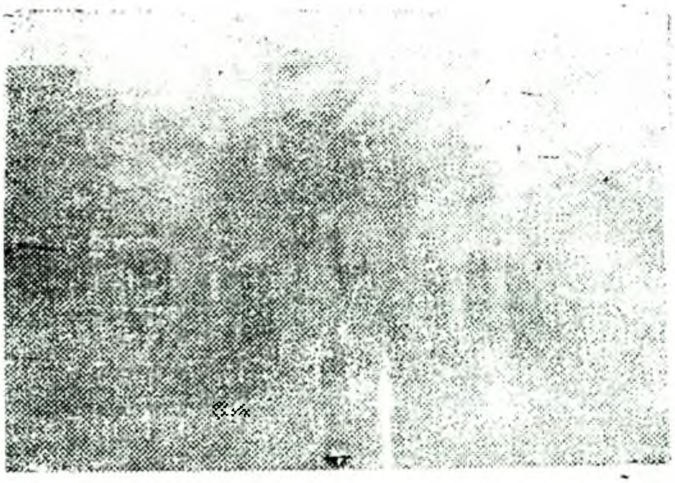

জঙ্গলবাড়ী হাবেলী দরবারগৃহ।

Dhaka University Institutional Repository

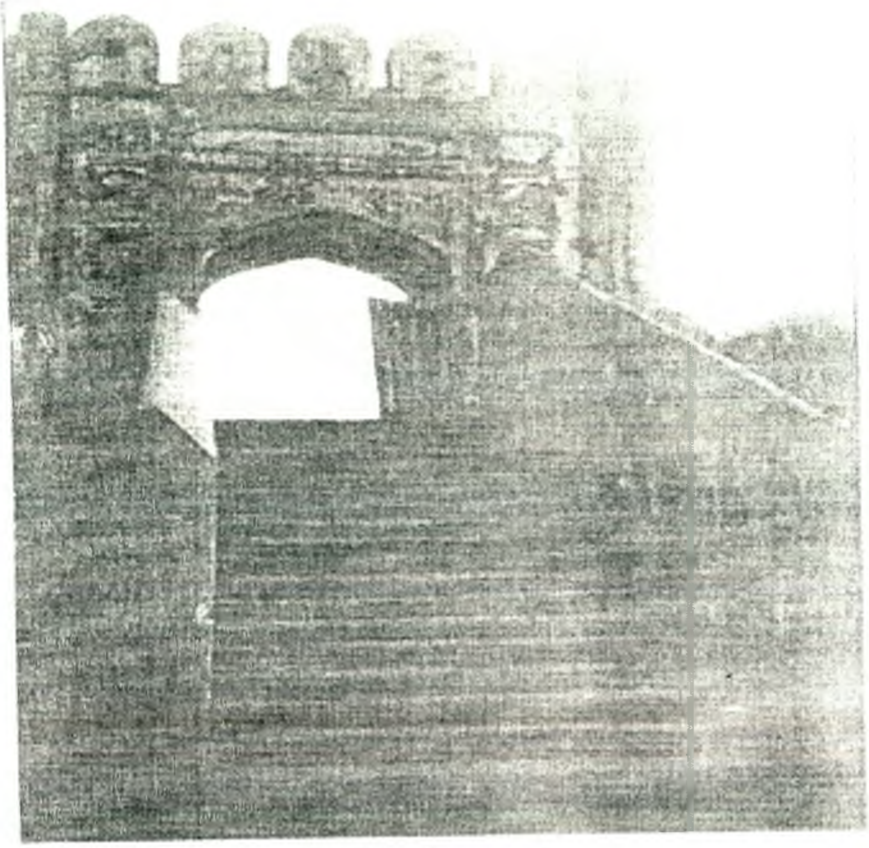

হাজিগঞ্জ দুর্গ

Dhaka University Institutional Repository

কুতুবশাহী মসজিদের কেন্দ্রীয় খিলানের পার্শ্ববর্তী অলঙ্করণ

Dhaka University Institutional Repository

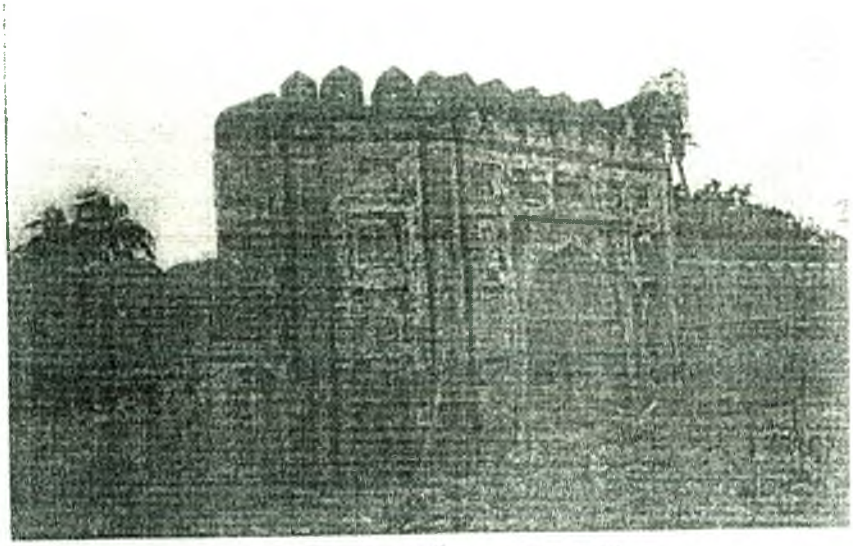

সোনাকান্দা দূর্গের প্রধান প্রবেশ পথ

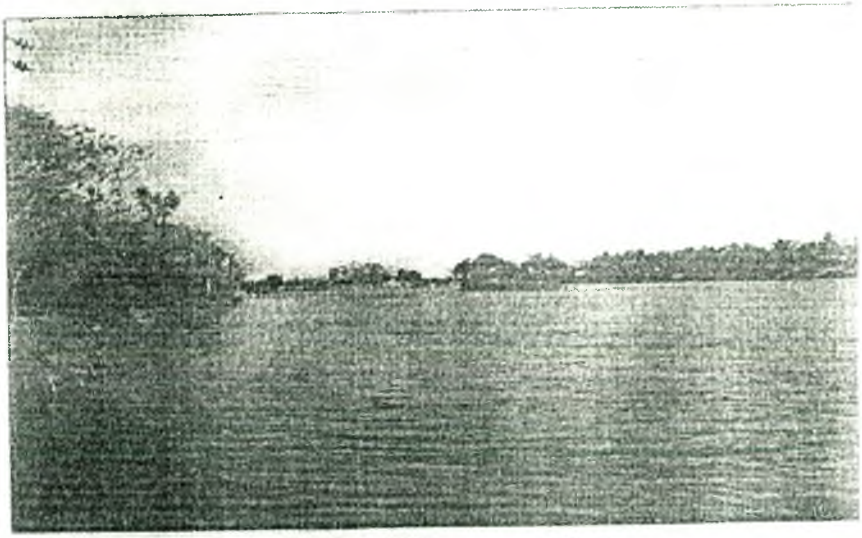

দেওয়ানদিঘি মাসুমাবাদ কাট্রাবো

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খান

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১। নাথান, মির্জা ঃবাহারীস্তান-ই-গাইবী, ১ম খন্ড, খালেক দাদ চৌধুরী অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮

২। খাতুন, হাবিবা ও জাহান, শাহনাজ হুসনে ঃ ঈসা খান সমকালীন ইতিহাস, বংশাই কাঁটাবন, ঢাকা, ২০০০

৩। খলীল, ইব্রাহীম ঃ বার ভূইয়ার কাহিনী, আহম্মদ পাবলিশিং হাউজ, জিন্দা বাহার লেন, ঢাকা, ১৯৬৭

৪। রায়, স্বরূপচন্দ্র ঃ সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৮৯১

৫। রহিম, মুন্সী আবদুল ঃ দেওয়ান ঈসা খান সমনদ অলিপুথি গলাচিপা, কিশোরগঞ্জ

৬। রহমান, মোহাম্মদ মতিউর ঃ দেওয়ান ঈসা খাঁ, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা,মে ১৯৮০

৭। ফজল, আল্লামা আবুল ঃ আকবরনামা (জারেট অনুদিত ৩য় খন্ড)আইন-ই-আকবরী(৩য় খন্ড)

৮। বন্দোপাধ্যায়, সুপ্রসন্ন ঃ ত্রিপুরার ইতিহাস,ফার্মা কে এল, এম, প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮২

৯। আগফ, সৈয়দ আবদুল ঃ তরফের ইতিহাস, সিলেট, ১২৯২ বাংলা

১০। মজুমদার, কেদারনাথ ঃ ময়মনসিংহের ইতহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, ১৯৭৮

১১। করিম, মোঃ রেজাউল ও আসগর, সৈকত ঃ সোনারগাঁওয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান, রহমান গ্রুপ অব ইন্ডাষ্টিজ, ঢাকা, ১লা জুলাই, ১৯৯৩

১২। তায়েশনুন্সী রহমান আলী ঃ তাওয়ারিখে ঢাকা, আ. ম. ম. শরফুদ্দিন অনুদিত, ইসলামীক ফান্ডেশন বাংলাদেশ , ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

১৩। শাহজাহান, মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ঃ (ক)ঈসা খান, ইসলামীক ফাউন্ডেশন বংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, ঢাকা, জুন ২০০৪

(খ)ঈসা খান মসনদ-ই-আলা” ইতিহাস ঐতিহ্য গবেষণা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ, ৩৪/২ বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৬ডি ডিসেম্বর, ১৯৯৪,

১৪। আকবর, হারুন ঃ দেওয়ান আদম খা, জালালাবাদের লোক সাহিত্য পরিষদ, সিলেট, ১৯৮৯

১৫। সলীম, গোলাম হোসাইন ঃ বাংলার ইতিহাস, রিয়াজউস সালাতীনের বঙ্গানুবাদ, আকবর উদ্দীন, বাংলা অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৪

১৬। শেরওয়ানী, আব্বাস খান ঃ তারিখ-ই-শেরশাহী, মোহাম্মদ আলী চেন্ধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬

১৭। মজুমদার, রমেশচন্দ্র ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, জেলারেল প্রিন্টার্সয়্যান্ড পাবলিশার্শ প্রাঃ লিঃ কলিকাতা, ১৯৮৭

১৮। সেন, কালীপ্রসন্ন ঃ শ্রী শ্রী রাজামালা, ২য় ৪র্থ খন্ড, আগরতলা , ত্রিপুরা, ভারত, ১৯২৭

১৯। রহিম, এ. এম ঃ(ক) বাংলা সামাজিক ও সাংস্তৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২

(খ) বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

২০। করিম, আ্দুল ঃ(ক) ঈসা খান, পুস্তিকা, ইসলমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সিলেট, ঢাকা
(খ) বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭
(গ) ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪
(ঘ) বাংলার ইতিহাস, মোগল আ্মল ১ম খন্ড, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, জানুয়ারী, ১৯৯২

২১। আলীম, একে. এম আবদুল ঃ ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস, মাওলা ব্রার্দাস, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯১

২২। গুহ, প্রদ্যোৎ ঃ বাদশাহী আমলে বিদেশী পর্যটক, চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৩

২৩। আহমদ, ওয়াকিল ঃ বাংলায় বিদেশী পর্যটক, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৯০

২৪। আবদুল্লাহ, সৈয়দ ঃ গবেষণার আলোকে তরফ বিজয়, মহাকবি সৈয়দ সুলতানা সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ, সুলতানশী হাভেলী, হবিগঞ্জ, ১৯৯১

২৫। বার্ট এফ. ডব ব্রাডলী ঃ প্রাচ্যের রহস্য নগরী)রোমেন্স অফ এন ইষ্টর্ন ক্যাপিটাল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ) রহীম উদ্দীন সিদ্দিকী অনদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

২৬। মজুমদার, কেদারনাথ ঃ (ক) ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, ১৯৮৭
(খ) ময়মনসিংহের ইতিহাস, সান্যাল এন্ড কোং, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬

২৭। হুসাইন, ওয়াহিদ ঃ ভারথে মুসলমান শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা , কে আলী অনূদিত, আল পাবলিকেশান্স, ঢাকা , ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

২৮। রায়,যতীন্দ্রমোহন ঃ ঢাকার ইতিহাস, শৈব্য প্রকাশন বিভাগ, কলিকাতা, ৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০

২৯। গুপ্ত, যোগান্দ্রনাথ ঃ বিক্রমপুরের ইতিহাস, ঘাস ফুল নদী, ঢাকা, ২০০১

৩০। চেরধরী, আব্দুল হক ঃ চটগ্রামের ইতিহাস, প্রসঙ্গ, নোয়াজিশপুর, চট্রগ্রাম, ১৯৭৬

৩১। আশরাফ, মোহাম্মদ ও আসগর, সৈকত ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার লোক সাহিত্য, ফোকলোর ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯১

৩২। সেন, দীনেশচন্দ্র ঃ পূর্ববঙ্গ গীতিকার, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬

৩৩। আবদুল্লাহ, খান সাহেব এম ঃ মোমেনশাহীর নতুন ইতিহাস, মোমেনশাহী, ১৯৭৬

৩৪। রায়, পূর্ণচন্দ্র ঃ উচ্চাস, জঙ্গলবাড়ি, ময়মনসিংহ, ১৩৩৪ বাংলা

৩৫। রায়, মিহিরকুমার ঃ ভারতের ইতিহাস, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯২

৩৬। চক্রবর্তী, রজনীকান্ত ঃ গৌড়ের ইতিহাস , ১ম ও ২য় খন্ড, দেজ পাবলিশিং কলিকাতা, ১৯৯৯

৩৭। শর্মা, শ্রী প্রিয়দর্শন ঃ বাংলার সামরিক ইতিহাসের গোড়ার কথা, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৮

৩৮। খান, আবদুর রহমান ঃ বাংলা সাহিত্যের কালক্রমিক পরিচয়, ঢাকা, ১৯৮৪

৩৯। রায়, শ্রী শৌরীন্দ্র কিশোর ঃ ময়মনসিংহের বারেন্দ্র বাক্ষণ, ২য় খন্ড

৪০। সিরাজুল, ইসলাম ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৩

৪১। করিম, আবদুল(সম্পাদিত) ঃ শিবাজী রচনাবলী, উপন্যাস খন্ড, ঢাকা, ১৯৬১

৪২। গৌতম ভদ্র ঃ মোগলযুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, কলিকাতা, ১৯৯১

৪৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, ভৈরব ঃ ঈসা খাঁ (ঐতিহাসিক নাটক), সম্পাদনায় ফরিদ উদ্দিন খান

৪৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল দাস ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খন্ড, প্রথম দেজ সংস্করণঃ জানুয়ারী, ১৯৮৮, কলিকাতা

৪৫। মিছের, কাজী মোহাম্মদ ঃ বগুড়ার ইতিকাহিনী (অ্তীত ও বর্তমান) , অনুসন্ধান অফিস, বগুড়া, পূর্ব পাকিস্তান, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৫৭

৪৬। রহিম, মুহাম্মদ আবদুর ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫

৪৭। কবিরাজ, কৃষ্ণদাস ঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

৪৮। সিংহ, কালী প্রসন্ন ঃ রাজমালা

৪৯।সরকার, স্যার যদুনাথ ঃ দি হিষ্টী অব বেঙ্গল ভল্যুম, ভল্যুম-২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় মুদ্রন, ১৯৭৬,

৫০। ভট্রাশালী, ডঃ নলিনীকান্ত ঃ কয়েন্স এন্ড ক্রনলজি অব দি আর্লি ইন্ডিপে-ন্ডেড সুলতানস অব বেঙ্গল, বেঙ্গল পাষ্ট এন্ড প্রেমেন্ট ভল্যুম-৩৬. ৩৮

৫১। রায়, আনন্দ নাথ ঃ বারভূঞা

৫২। টেনলার, জেমস ঃ কোম্পানী আমলে ঢাকা

৫৩। ভট্রাচার্য, উপেন্দ্র ঃ বঙ্গের বীর সন্তান

৫৪। মূখপাধ্যায়, শ্রীসুখময় ঃ বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর

৫৫। রাব্বি, খন্দকার ফজলে ঃ বাংলার মুসলমান

৫৬। হোসাইন, মোহাম্মদ ঃ দরবার-ই-আকবরী

৫৭। বদায়ূনী, আঃ কাদির ঃ মুনতাখাব উত তাওয়ারিখ

৫৮। সম্রাট জাহাঙ্গীর-তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী

৫৯। মূখপধ্যায়, শ্রী-সুখময় ঃ বাংলার ইতহাসের দু'শ বছর, ভারতীয় কুকস্টল কলিকাতা, ৬ষ্ট সংস্করণ ১৯৯৮,

৬০। ডঃ নলিনী কান্ত ভট্রশালী বেঙ্গল পাষ্ট প্রেজেন্ট ভল্যুম-৩৬

সাময়িকী

খাতুন, হাবিবা ঃঈসা খান, রজত জয়ন্তী সংখ্যা ১৯৯৩, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯৬, ঢাকা

আহাম্মদ, শফিউদ্দিন ঃ মোগল, বার ভূঞা দ্বন্দ্বঃ প্রসঙ্গ মানিকগঞ্জ জেলা' ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা

চেম্ধুরী, শ্রী উমেশচন্দ্র সিংহ ঃ জঙ্গলবাড়ি (প্রবন্ধ), মাসিক বসুমতি, ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, ১৩বর্ষ, বৈশাখ ১৩৪১ বাংলা, পৃঃ ৬৪-৬৭

কাদির, আবদুল এম. ঃ খিযরপুরের ঈস খান (প্রবন্ধ) সোনারগাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান, মোঃ রেজাউল করিম, গম্পাদিত

ইসলাম, মোহাম্মদ আশরাফুল ঃ বাংলা ভাষা সাহিত্য ঈসা খান কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতিক পরিষদ পত্রিকা, ১৯৯৫

শাহজাহান, মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, ঃ প্রাচীন ভাটিরাজ্যের রাজধানী জঙ্গলবাড়ি, সাহিত্য সাময়িকী সৃষ্টি, নব পর্যায়ে বর্ষ-১, সংখ্যা১, বৈশাখ-আষাঢ়-১৪০৯ পৃঃ ৪১-৫০

খান, মোহাম্মদ আলী ঃ পাকুন্দিয়া উপজেলার কথা, পাকুন্দিয়া উপজেলা পরিষদ ১৯৭৮

এয়মনসিংহ জীবন ও জীবিকা ঃ ময়মনসিংহ জেলা দ্বিশত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, জেলা প্রশাসন, ময়মনসিংহ, ১৯৮৭

চৌধুরী, উমেশ চন্দ্র সিংহ ঃ জঙ্গলবাড়ি" প্রবন্ধ মাসিক সুমতি পত্রিকা ১৩৪১ বাংলা সন

পত্র, পত্রিকা, জার্ণাল, সাময়িকী

বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণাল

জার্ণাল অব দি ন্যুমেজমেটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া

বেঙ্গলী ওয়রিয়র, করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ২য় খন্ড

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকা

ময়মনসিংহ সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বাংলা একাডেমী পত্রিকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা পত্রিকা